

# ফররুখ আহমদ

(সংকলন)



ফররুখ আহমদ  
(সংকলন)



Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ  
ঢাকা-চট্টগ্রাম

# ফররুখ আহমদ

(সংকলন)

## প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

## চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬৩৭৫২৩

## ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থ স্বত্বঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী-২০০৯

## মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪, ৯৫৬৯২০১

## প্রচ্ছদ অলংকরণ

মুবাশ্বির মজুমদার

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

## প্রাতিষ্ঠান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

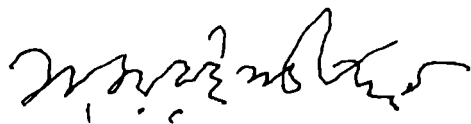
- নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
- ১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
- ১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
- ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

---

**FARRUQ AHMAD** Published by: SM Raisuddin Director (Publication),  
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd 125 Motijheel C/A, Dhaka-  
1000. Price : Tk. 200.00, US\$ 8/-, **ISBN.-984-70241-0006-1**

## প্রকাশকের কথা

ফররুখ আহমদ সৌন্দর্যের পুলকিত নাম এবং লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষের কল্যানকামী নাম। তিনি ইসলামী রেনেসাঁ কবি। কবি এমন শিল্পী; তার কাব্যের ভাবনা বৈশিষ্ট্য ও শিল্পোৎকর্ষ অন্যতম। শ্রেষ্ঠ কবিতা ও রচনাবলী যেমন -“কাফেলা” এবং “হাবেদা মরুর কাহিনী”। মুসলিম রেনেসাঁর নকীব, সাত সাগরের স্বাপ্নিক সিন্দাবাদ কবি দুঃসহ দারিদ্র ও কৃচ্ছতার জীবন মৃত্যুকালীন সময় ও আচ্ছন্ন ছিলেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, লেখক, গবেষকদের লেখায় কবি ফররুখ আহমদ এর জীবনালেখ্য নিয়ে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এই সংকলন প্রকাশ করলো। এই সংকলনটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দ বোধ করছি।



এসএম রইসউদ্দিন  
পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

## সূচীপত্র

কবি ফররুখ আহমদের কবিতা : আবু জাফর শামসুদ্দীন	০৯
কবি ফররুখ আহমদ : সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়	১৫
ফররুখ আহমদের প্রভাব : মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	১৯
মানবতার কবি ফররুখ : শাহাবুদ্দীন আহমদ	৩৩
কবি ফররুখ আহমদ : মুজীবুর রহমান খাঁ	৩৮
ফররুখ আহমদের কাব্য-নাটিকা ও সনেট-কাব্য : আব্দুল কাদির	৪১
ফররুখের ষোপার্জিত ভূবন 'হাবেদা মরুর কাহিনী' : আফজাল চৌধুরী	৪৯
ফররুখ আহমদের কবিতায় কিংবদন্তী : হাতেম তা'য়ী প্রসঙ্গ : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	৫৮
ফররুখ আহমদের কবিতায় বাক্‌প্রতিমা : বিপ্রদাস বড়ুয়া	৭৫

## স্মৃতিচারণ

আমার বন্ধু ফররুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৮৫
ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি মানুষ : আশরাফ ফারুকী	৮৮
আমার ফররুখ ভাই : ফারুক মাহমুদ	৯৩
ফররুখ আহমদ : কবি : মহাদেব সাহা	৯৮
রাত পোহাবার কত দেবী পাঞ্জেরী : আলী রিয়াজ	১০২
ফররুখ আহমদ কবির প্রতিকৃতি : আতা সরকার	১০৬
কোলাহলের বাইরে দাঁড়াতে বলি : আবদুল হাই শিকদার	১১১
সংবর্ধনা	১১৬

## শেষ অভিবাদন

পরলোকে ফররুখ আহমদ : দৈনিক আজাদ	১২৩
কাব্য লোকে তিনি মৃত্যুহীন : দৈনিক বাংলা	১২৬
লোকান্তরে ফররুখ আহমদ : দৈনিক সংবাদ	১২৯
ফররুখ আহমদ : দৈনিক পূর্বদেশ	১৩০
কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুতে : দৈনিক জনপদ	১৩২
একজন কবির মৃত্যু : দৈনিক গণকণ্ঠ	১৩৩
Poet Farrukh Ahmed : The Bangladesh Observer	১৩৫
জীবন সাগরে সিন্দাবাদ : সাপ্তাহিক চিত্রালী	১৩৬
আমাদের কথা : ঢাকা ডাইজেস্ট	১৩৮
আমাদের কথা : মাসিক মদিনা	১৩৯
স্থান-কাল -পাত্র : লুপ্তক	১৪১
সাক্ষাৎকার	১৪৪

## কবির লেখা

শেষ কথা-----	১৫৯
উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী -----	১৫৩
ব্যঙ্গ কবিতা -----	১৬২
আনারকলি (গীতিনাট্য) -----	১৬৪

## নিবেদিত কবিতা

আমার গর্ব : আবুল হাশেম -----	১৭৭
বাতিঘর : তালিম হোসেন -----	১৭৮
ফররুখ স্মরণে : সৈয়দ আলী আহসান -----	১৭৯
ফররুখ-স্মৃতি: মুকাব্বারুল ইসলাম -----	১৮১
ফররুখ আহমদ স্মরণে: আবদুল হাই মশরেকী -----	১৮৩
কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুতে: আবদুর রশীদ খান -----	১৮৫
একজন কবি: তার মৃত্যু : শামসুর রাহমান -----	১৮৭
প্রহরের গান: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী -----	১৯০
ফররুখ ভাই: আবদুস সাত্তার -----	১৯৩
ইশারা: মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ -----	১৯৪
ভিন্ন শিবির থেকে: আতাউর রহমান -----	১৯৫
অসীম সাহস: আল মামুদ -----	১৯৬
একটি চতুর্দশপদী: হেমায়েত হোসেন -----	১৯৭
কবি ফররুখ আহমদকে মনে করে: দিলওয়ার -----	১৯৮
ফররুখ আহমদ: আফজাল চৌধুরী -----	১৯৯
ফররুখ আহমদ: আবদুল মান্নান সৈয়দ -----	২০০
বন্য স্বপ্নের কবিকে: সিকদার আমিনুল হক -----	২০১
প্রসন্ন চেতনা: নূরুল আলম রইস -----	২০২
অনন্তর ফররুখ আহমদ: মুহম্মদ নূরুল হুদা -----	২০৪
বৃক্ষ: আল মুজাহিদী -----	২০৫
চাষীর পুত্রের বিশ্বাস: শাহাদাত বুলবুল -----	২০৬
ফররুখ আহমদ: কাজী সালাহ উদ্দীন -----	২০৭
দুর্ভিক্ষ: ফজল মাহমুদ -----	২০৮
পায়ের ছাপ দেখে: মাহবুব বারী -----	২০৯
উত্তরণ: নিজাম উদ্দীন সালেহ -----	২১০
একজন কবি: ইকবাল আজিজ -----	২১১
হবে কি কখনো ফেরা সিন্দাবাদের: রেজাউদ্দিন স্টালিন -----	২১১
অস্পষ্ট বন্দর: মুকুল চৌধুরী -----	২১৩

## পরিশিষ্ট

জীবনপঞ্জী -----	২১৬
-----------------	-----

# আলোচনা-মূল্যায়ন





# কবি ফররুখ আহমদের কবিতা

আবু জাফর শামসুদ্দীন

কাজী নজরুল ইসলামের পরে সম্ভবতঃ ফররুখ আহমদই প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ “সাত সাগরের মাঝি” সামগ্রিক বিচারে একটি উত্তম শিল্পকর্ম। আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদকে তিনি অপরায়ে উচ্ছল জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহার করে যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন, নিঃসন্দেহে তরুণ সমাজের জন্যে তা নতুন সমাজ-জীবন নির্মাণের আহ্বান। সবল আশাবাদ কাব্যটির মূল কথা। কাব্যটির আরম্ভ চমৎকার :

“কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,  
গুন্ছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,  
ভাসে জোওয়ার মণ্ডলের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,  
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;”

এবং “আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কতদিন পরে ফিরে  
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে,  
ডেকেছে আমাকে জিন্দগী আর মণ্ডলের মাঝখানে।  
এবার সফর টানবে আমাকে কোন স্রোতে কেবা জানে!  
ঘন সন্দল, কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুশ।  
হাতীর দাঁতের সাজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,  
পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে :  
নামে নির্ভীক সিঙ্কু ঈগল দরিয়ায় চোখে হাম্মামে।”

কাজেই অনিশ্চয়তার ভয় তাকে নিরস্ত করতে পারে না ; কেননা “দরিয়া ডেকেছে নীল !/ খুলি জাহাজের হালে উদ্দাম দিগন্ত ঝিলমিল।”

হয়তো “তুফান ঝড়িতে” “কিশ্তিরি পাটাতন তোলপাড়” করবে, কিন্তু “নির্ভীক সমুদ্র স্রোতে দাঁড় ফোঁলে বারো মাস” “দরিয়ার পানি চাষ” করবেই, কেননা :

“হারামি মওত ঢাকে সারা মন, দেহ  
গলিজ শহরতলীতে আবার জেগে ওঠে সন্দেহ;  
বিষ নিঃশ্বাসে জিন্দগী ফের কেঁদে ওঠে বিশ্বাদ”

সুতরাং “পার হয়ে যাও আয়েশী রাতের ফাঁদ”  
তা হলে পাবে:  
যেখানে “বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরান জিন্দগী”  
“আবলুস ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিখী”  
এবং “পাথর জমানো দরিয়ার তীরে মওতের বুকে আহা,  
কাফুরের মত নতুন জীবন ডাকছে সিন্দাবাদ।”  
সুতরাং “ভেঙে ফেলো আজ থাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ  
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালির বাঁধ  
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,  
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ !”

কলুষ কালিমাযুক্ত পুতিগন্ধময় পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে দুঃসাহসের সাথে  
অতিক্রম করে কাফুরের সুগন্ধবহ নতুন সুস্থ সমাজজীবন গড়ে তোলার এরূপ সবল  
স্বচ্ছন্দ আহ্বান বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। সরস রূপকল্প, সৌসাদৃশ্যময়  
উপমা উপমেয় এবং ত্রুটিহীন ছন্দের মিশ্রণে নির্মিত এ-কবিতাটি সুইনবার্গের  
Atalanta in calydon -এর কোরাস অংশটির সবল প্রকাশভঙ্গী স্মরণ করিয়ে  
দেয়, যার আরম্ভঃ

When the hounds of spring are on winter's traces  
The mother of months in meadow or plain  
Fills She shadows and window places  
With lisp of leaves and ripple of rain .....

যাত্রাপথের মঞ্জিলে মঞ্জিলে পর্বতপ্রমাণ বাধা থাকতে পারে, ঝড়-ঝঞ্ঝার ছাপটায়  
‘আকাশ নাবিক’ বিহঙ্গের ডানায় ক্লাস্তি আসতে পারে, এমন কি “অকাল মৃত্যু  
ঝড়কার কাছে এসে” “কোন ক্ষুধিত ভয়ঙ্কর” “হিংস্র চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ-শর” এবং  
“নিরাশা ধূসর কালো পটে মৃত্যুর বন্দর” দেখে সন্ত্রাসে ক্ষণিকের জন্য “নিজীব

নিশ্চাপণ হয়ে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব; কিন্তু আবার তাকে যাত্রা করতেই হবে,  
কেমনা :

“কথা ছিল তুমি, হে পাখি ! কখনো মানবে না পরাজয়,  
তোমার গানের মুক্ত-নিশান উড়েছে আকাশময়,”  
এবং “যদিও সূর্য বন্দী এখন আঁধারের ঝরোকাতে  
পূর্বদিগন্তে জেগেছে আলোর গান :  
সাত আকাশের যৌবন অগ্নান ।”

(আকাশ-নাবিক)

এমনি আশাবাদী এবং সবল জীবনের পরিচয় পাই আমরা সমুদ্র উপকূলবাসী  
মৎস্যজীবীদের মধ্যে । ঝড়-বাদল, উত্তাল সমুদ্রের সফেদ উর্মি প্রভৃতি কোন কিছু  
জুটুকিই তারা গ্রাহ্য করে না । ক্ষুদ্রকায় সাম্পানে পাল তুলে প্রতিদিন নিয়মিত  
সমুদ্র অভিযানে তারা যাবেই । ফররুখ আহমদের ‘সাত সাগরের মাঝি’র প্রায় সর্বত্র  
আমরা একরূপ সবল ও মুক্ত জীবনের জয়গান লক্ষ্য করি । ডাহককে লক্ষ্য করে কবি  
বলছেন :

“চাঁদের দুয়ারে  
যে সুরার তীব্র দাহে ভেসে চলো উত্তাল পাথারে,  
প্রান্তরে তারার ঝড়ে  
সেই সুরে ঝরে পড়ে  
বিবর্ণ পালক,

নিমিষে রাঙায়ে যায় তোমাদের নিশ্চিন্ত তনু বিদ্যুৎ ঝলক, তীব্র-তীব্র গতি নিয়ে  
ছুটে যায় পাশ দিয়ে উল্কার ইশারা, মৃত অরণ্যের শিরে সমুদ্রের নীল ঝড় তুলে যায়  
সাড়া উদ্দাম চঞ্চল ;

তবু অচপল  
গভীর সিঙ্কুর  
সুদূর্গম মূল হতে তোলা তুমি রাত্রিভরা সুর ।

ডাহকের ডাক .....  
সকল বেদনা যেন, সব অভিযোগ যেন  
হয়ে আসে নীরব নির্বাক ।  
রাত্রির অরণ্যতটে হে অশ্রান্ত পাখি !

যাও ডাকি ডাকি

অবাধ মুক্তির মত ।

ভারানত

আমরা শিকলে,

গুনিয়া তোমার সুর, নিজেদেরি বিবাক্ত ছোবলে

তনুমন করি যে আহত ।

এই স্নান কদর্যের দলে তুমি নও,

তুমি বও

তোমার শৃঙ্খল-মুক্ত পূর্ণ চিন্তে জীবনমৃত্যুর

পরিপূর্ণ সুর ।”

তাঁর এ কবিতাটি শেলীর Skylark কে স্মরণ করিয়ে দেয় । শুধু তাঁর ‘স্বর্ণ ঈগল’-এ পরাজয়ের সুর লক্ষ্য করি ।

“আল্-বোরজের চূড়া পার হল যে স্বর্ণ ঈগল  
গতির বিদ্যুৎ নিয়ে, উদ্দাম ঝড়ের পাখা মেলে,  
ডানা-ভাঙা আজ সে ধূলায় । যায় তারে পায়ে ঠেলে  
কঠিন হেলায় কোটি গর্বোদ্ধত পিশাচের দল ।”

সুতরাং

“এখন বহেনা হাওয়া এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ধারে,  
এই অজগর রাত্রি গ্রাসিয়াছে সকল আলোক,  
সোহরাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রক্তম ।”

কিন্তু এই ক্লাস্তির সুর নিতান্তই সাময়িক । তেরো শ’ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাংলায়-

“যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়,  
কালো পিচ-ঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়,  
সেখানে পথের পাশে মুখ ঝুঁজে পড়ে আছে জমিনের ‘পর;

যে শতসহস্র লাশ, “সন্ধার জনতা” যাদের খবর রাখেনা এবং যাদের

“পাশ দিয়ে চলে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর

- পাথরের ঘর,

মৃত্যু কারাগার,  
সজ্জিতা নিপুণা নটী খুলিয়াছে বারান্দা দ্বার  
মধুর ভাষণে,  
পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে  
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের ‘পর  
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।”

তাদের দেখে কবি আবার নিজের সত্ত্বার সন্ধান পেয়েছেন। যে জড় সভ্যতার  
আক্রমণে “আকাশ অদৃশ্য হল দাঙ্জিকের খিলানে” তার ধ্বংস কামনা করছেন কবি  
অতি স্পষ্ট ভাষায় :

“হে জড় সভ্যতা !

মৃত-সভ্যতার দাস স্কীতমেদ শোষণক সমাজ !

মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ ;

তারপর আসিলে সময়

বিশ্বময়

তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি’

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি’ ;

আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বন্তঃ

ধ্বংস হও

তুমি ধ্বংস হও।।”

পচনশীল সমাজের অনাচার-অবিচারে ক্ষুব্ধ চিন্তিত কবি ‘সাত সাগরের মাঝি’তে  
যে অভিযান আরম্ভ করেছিলেন মনে হয় অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা ‘সিরাজাম  
মুনিরায়’ তাঁর লক্ষ্যস্থলের সন্ধান পেয়েছেন।

এখানে তাঁর আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি “অচেতন প্রাচীন তনুতে নতুন  
মন” “পুনর্গঠন” এবং “রাত্রির ঊষর মরুতে, মুক্ত ভোরের বীজ-বপন” করতে  
সরাসরি আহ্বান জানাচ্ছেন এবং কামনা করছেন:

“ প্রতি পাপড়ির পূর্ণ বিকাশে জাগুক মুক্ত গুঁনে আনার,  
প্রতি পাথরের সম্মেলনের প্রকাশে দাঁড়াক ত্বর পাহাড়,  
নামুক সেখানে তওরাত ধারা, নামুক নূরানী আল্ কোরান,

পূর্ণ মুমিন জমায়েত হেথা আসুক আবার নূতন বান  
হেরার সূর্য বলকে আবার আসুক মুক্তি চির নূতন ;  
মুজাহিদ সেনা করুক আবার নয়া জামানার উদ্বোধন ।”

এবং

‘ব্যক্তির মাঝে- মুক্ত জনতা  
খুঁজুক প্রাণের উজ্জীবন !”

কিন্তু কবি তাঁর পরবর্তী রচনা “নৌফেল ও হাতেম” এবং “হাতেম তায়ী” -এ পুনরায় রূপকের শরণাপন্ন হয়েছেন। বহুল প্রচলিত হাতেম তায়ী পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর এ-দুটি কাব্যে তিনি রক্তপাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ বর্জন করেও মহৎ মানবতা যে জয়ী হতে পারে তাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। টলস্টয়ী মানবতাবোধ থেকে এ মানবতাবোধ পৃথক বলে হয় না। স্মরণযোগ্য যে, টলস্টয়ও তাঁর আদর্শ এবং খৃষ্টধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ খুঁজে পাননি। টলস্টয়ের মতো এ কালের টি এস্ এলিয়টও ভালো খৃস্টান হয়েও ভালো কবি।

# কবি ফররুখ আহমদ

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

ছাপ্পানোর কোঠায় পা দিয়ে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত সৈনিক ফররুখ আহমদ বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে। হয়তো আজকের পৃথিবীর আত্মীয় পরিবেশের প্রতি অভিমানাহত চিন্তে ধিক্কার বর্ষণ করতে করতেই বিদায় নিয়েছেন। বড় ব্যথা ছিল তাঁর বুকে। যে নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে জীবন ও জগতকে দেখতে পারলে এই পীড়া থেকে তিনি মুক্ত হতে পারতেন, তা অর্জনের কোন আশ্রয় তাঁর ছিল না। আসলে তিনি ঐ সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন না। এক স্বপ্নাচ্ছন্নতায় তিনি তাঁর ছাপ্পানো বছরের জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবের রুঢ় আঘাতে তাঁর স্বপ্নেরা বিচলিত হয়েছে তবুও তিনি কোন দিন বড়বেশী গরজ বোধ করেননি তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনের রুঢ় বাস্তবের মোকাবিলায়।

ফল হয়েছে জীবতকালে আপনার কল্পনার রাজ্যে তিনি যথেষ্ট আধিপত্য করে গিয়েছেন তা ঠিক, কিন্তু বাস্তব-জীবনযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে অতি করুণভাবে কল্পরাজ্যের সকল দুয়ারে চাবিকাঠি লাগিয়ে তাঁকে সরে পড়তে হয়েছে অকালে। ক্ষ্যাপা কবি সারাজীবন এক আদর্শের পরশ-পাথর খুঁজে ফিরেছিলেন, যার পরশে তাঁর বিশ্বাস ছিল ‘সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ফুটবেগো ফুল ফুটবে’। কাব্যক্ষেত্রে সেই দুর্লভের স্পর্শ তিনি মাঝে মাঝে লাভ করেছিলেন বলে তিনি মাঝে মাঝে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু জীবনে তা প্রায় সর্বদাই অপ্রাপ্য থেকে গিয়েছিল; জীবনে তাকে রূপায়িত করার পথের সন্ধান তিনি কখনই পাননি, হয়তো সন্ধান করার চিন্তাও মাথায় আসেনি।

এমন এক শিল্পী মানুষের কথা লিখতে বসে মনে যুগপৎ বিস্ময় ও করুণাবোধ জাগে। বিস্ময় জাগে অপরূপ কল্পনা-শক্তি স্বতন্ত্র তার কবিচিন্তার গভীরতা ও সমুন্নতির কথা চিন্তা করে; করুণা জাগে, রুঢ় জীবন-বাস্তবের স্বরূপ অনুধাবনে তাঁর চূড়ান্ত ব্যর্থতায়। এই ব্যর্থতারই মাণ্ডল তাঁকে দিতে হয়েছে। আসলে জীবনের পক্ষ থেকে সরে গিয়ে। আর এজন্যেই বোধ হয়, তিনি আমাদের কাছের মানুষ হয়েও চিরকাল দূরেই সরে রইলেন। আবার দূরে সরে থেকেও আমাদের নিরন্তর আকর্ষণ করেছেন। কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে কিছু লেখার তাগিদ এককালে ঐ কারণেই আমি অনুভব করেছিলাম। আর তারই ফল ছিল ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত আমার গ্রন্থ ‘কবি

ফররুখ আহমদ’। তাতে কবি সম্পর্কে আমি যে সব বক্তব্য রেখেছিলাম তা আজও পরিবর্তন করার মত কোন কারণ দেখছি না। তাই আজ পরপারের যাত্রী কবিকে স্মরণ করতে গিয়ে আমি কবি-শিল্পী ফররুখ আহমদ সম্পর্কে আমার তৎকালীন বক্তব্যেরই যদি পুনরাবৃত্তি করি তাহলে সেটা অযথার্থ হবে না বলেই মনে করি। আমি বলেছিলামঃ

‘ফররুখ আহমদের কাব্যভাবনা বৈশিষ্ট্য ও শিল্পোৎকর্ষের জন্যে যেমন আমাদের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমনি এর কিছু কিছু অবাস্তবিক ক্রটি আমাদের শিল্পবোধকে পীড়িত করে। তাঁর কাব্য সাধনা প্রথম থেকেই ঐতিহ্য-চেতনার যে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত, সে খাতটি অপরিসর হলেও, কোথাও কোথাও বেশ গভীরতা লাভ করেছে। সংকুচিত ভাবনার বৃত্তে অবস্থান করেও এ আমাদের রস চেতনার গভীরে প্রবেশোন্মুখ। বিশেষ ধর্মান্দর্শ এর পরিমণ্ডলকে এক অর্থে সংকুচিত করলেও, ঐ ধর্মান্দর্শই আবার তাঁকে দেশ-কালের ভূগোলকে অস্বীকার করে আপন ব্যাপ্তি খুঁজতে প্ররোচিত করেছে। তাই পদ্মা-মেঘনার সৈকতে পাখা-মেলেও তাঁর কাব্য অনায়াসে আপনার আশ্রয় খুঁজছে ইরান-তুরান, আরব-আজমে। আবার দেশজ সূত্রের সম্পন্নতার অভাব এ কাব্যের প্রাণধর্মকে যে অনেকটাই পীড়িত করেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু দেশজ প্রকৃতি ও ঐতিহ্য মাঝে মাঝে হীরকের দীপ্তি নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। বিরল হলেও এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য রীতিমত ঈর্ষার উদ্রেক করে। প্রসঙ্গতঃ ‘ডাহুক’ নামক কবিতাটিকে এ সাফল্যের চূড়ান্ত স্বাক্ষররূপে উপস্থাপিত করা চলে।

তারপর আধুনিক যুগোচিত জীবন-ভাবনার জটিলতা ও যুগ সমস্যার অনুধাবন প্রচেষ্টা তাঁর কাব্যে দুর্লভ্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘লাশ’ উল্লেখযোগ্য এক বাতিক্রম হলেও তা বাতিক্রমই থেকে গিয়েছে। মানবতার দৈন্যের মূর্তি যেখানেই তাঁর চোখে পড়েছে সেখানে তিনি তাঁর মর্মমূলে দৃষ্টি চালিত করেননি। তার মধ্যে তিনি আধুনিক সভ্যতার অভিশাপকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, তার প্রতি অভিশম্পাৎ বর্ষণ করেছেন। তাঁর এসব রচনা বলে, ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় মূল্যবোধকে বিচলিত করে বলেই যেন তিনি বেশী বিচলিত বোধ করেন। এসব থেকে পরিভ্রাণ পাওয়ার জন্যেই যেন তিনি অতীত গৌরব স্মৃতির বেদীমূলে ফিরে যান বারবার শুধু আক্ষেপ করেন ‘শুধু এক লহমার ভুলে’ মুসলমান নিজের জন্যে ডেকে এনেছে বিপর্যয়। তাকে মানুষের মত বাণী, ত্যাগের বাণীকে আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতঃ যুগোচিত জীবন ভাবনার অনুপস্থিতি এবং আপন মনোগত একটি আদর্শভাবনার পৌনঃপুনিক উল্লেখ তাঁর কাব্য বক্তব্যকে



বড় বৈচিত্র্যহীন করে তুলেছে। কোন জিজ্ঞাসার পথ নয়, প্রশ্নাতীত বিশ্বাসের পথ ধরেই ইসলামের আদর্শলোকের দিকে তাঁর কাব্য যাত্রা করছে। সে আদর্শের নিরিখে তিনি সকল সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। যুগ-জীবন-জটিলতার সম্মুখীন হয়ে যে সংশয়ের কূটপ্রশ্ন দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত বিদ্ধ হচ্ছি, সে সংশয় ফররুখের কাব্যে মাঝে মাঝে স্নান ছায়া বিস্তার করলেও কখনই মনকে প্রশ্নে উচ্চকিত করে তোলেনি। ফররুখের কাছে তাঁর আদর্শ সকল আধুনিকতার চেয়েও আধুনিক, সকল আদর্শের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে প্রতিভাত। ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর এরূপ অনড় মনোভঙ্গী যেমন পীড়াদায়ক, আবার ভাষা, ছন্দ উচ্চ কণ্ঠ তাঁর রচনায় নেই, তাও ঠিক। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কার্যে তার সম্পূর্ণ সজীবতা তেমনি বিস্ময়কররূপে প্রীতিদায়ক। কবি-কর্মে তিনি রোমান্টিক সন্দেহ নেই; তাই স্বপ্নাভিসারে আশ্বাস ও আনন্দ দুই-ই পান। তবু তিনি মানবতার সকল অসম্মান, সকল বেদনা ও লাঞ্ছনাকে নির্বিকারভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে নির্যাতিত-আর্ত-মানবতার জন্যে বেদনা প্রকাশ করেছেন এবং মানুষের জন্যে এক শোষণহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। সে বিশ্বাসে ধর্মাদর্শের অনুরঞ্জন থাকলেও তার মূল্য কমে যায় না। ধর্ম-বিশ্বাস তাঁর কাছে এক মানব-কল্যাণকামী আদর্শ-ভাবনারই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন একজন শিল্পী সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আমাদের তাই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তবে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় তা হচ্ছে এই যে, তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের এক শক্তিমান শিল্পী। সীমিত ভাবনার পরিমণ্ডলেও তিনি বিরল-দৃষ্ট শিল্প সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের উৎকর্ষ বিধানে তাঁর প্রযত্নের অন্ত ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা কাব্যের বিকাশধারাকে যেমন সার্থকভাবে অনুকরণ করেছেন, তেমনি ইউরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যের বিকাশ ধারার সাথেও কিছুটা যোগরক্ষা করে চলেছিলেন। কাব্যের আঙ্গিকেই শুধু নয়, তাঁর কবিতার ভাবনার ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে বিদেশী কাব্যানুশীলনের পরিচয় প্রস্ফুট। তবু সত্যের অনুরোধেই বলতে হয় বাংলা কাব্যে এ প্রতিভা আশ্চর্যরূপে নিঃসঙ্গ। আজও বাংলা কাব্যে তাঁর কোন সত্যিকার অনুসারী জোটেনি। কোন কোন তরুণতর কবি তাঁর কাব্যাদর্শের ছোঁয়াচ পেয়েছেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁর তেমন নিকটবর্তী হতে পারেননি। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা কাব্যের শক্তিমান শিল্পী ফররুখ আহমদ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে অনেককেই আকর্ষণ করলেও প্রকৃতপক্ষে কাউকে সহযাত্রী বা অনুসারী হিসেবে পাননি। আসলে তিনি সূর্যের মত আপনার চারপাশে গ্রহ-নক্ষত্রের একটি পরিমণ্ডল

রচনার শক্তি ধরেননি। তিনি আকাশ কোণের একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতোই বাংলা কাব্যাকাশের প্রান্ত জুল জুল করেছেন। এই নিঃসঙ্গতার বৈশিষ্ট্যই হয়তো ভবিষ্যতেও তিনি অনেক কাব্যমোদীকে আকর্ষণ করবেন।

ফররুখ আহমদ আজ আমাদের মধ্যে নেই। তিনি আজ সকল বিতর্ক, সকল নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে। আমরা যারা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি, তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছি তারা কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ভুলতে পারি না। কারণ-

‘মনের আকাশে  
প্রশান্ত সুপ্তির মত  
ব্যথা ভারাক্রান্ত তার  
গন্ধ ভেসে আসে।’

তাঁর রোমান্টিক কবি-কল্পনা এখানেই জয়যুক্ত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

## ফররুখ আহমদের প্রভাব

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ

কবি শামসুর রাহমান ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা ও কাব্য-বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে প্রায় ত্রিশ বছর আগেই লিখেছিলেন, “ফররুখ আহমদ সেই সব বিরল কবিদেরই অন্যতম যাঁরা খুব অল্পদিনেই অনুকারকের দল সৃষ্টি করেন।” [সংগাত, ফাল্গুন ১৩৬০] শামসুর রাহমানের এই অভিমত যে যথার্থ, তথ্য-নির্ভর এবং বাস্তবনিষ্ঠ, তা ফররুখ আহমদের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কবিদের অনেকের রচনা থেকেই স্পষ্ট। ফররুখ আহমদ যেমন আবির্ভাবের অল্পকালের মধ্যেই কাব্যক্ষেত্রে তাঁর সৃজনী প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় স্বাক্ষরিত করেন, তেমনি অন্য কবিদের অনেকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারেও সক্ষম হন। ‘সাত সাগরের মাঝি’র অন্তর্গত কবিতাবলী রচিত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগেই তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাতেই ফররুখ আহমদের কবিশক্তি, কল্পনা-প্রতিভা ও সৃজনীক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি যে রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব সচেতন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত, সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন, তার পরিচয়ও দীপ্ত হয়েছিল। তবুও ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থেই ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিক ও রূপ-রীতিতে ফররুখ আহমদের কবিতায় তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় উজ্জ্বলতর রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে, তিনি যে একজন মৌলিক প্রতিভাধর কবি এ-সত্যও ভাষ্যর হয়ে ওঠে।

‘সাত সাগরের মাঝি’র অন্তর্গত কবিতাবলী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের সময়ই পাঠক ও সুধী-সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ‘সিন্দাবাদ’ ‘সাত সাগরের মাঝি’ ‘লাশ’ ‘ডাহুক’ ইত্যাদি কবিতা আলোড়ন জাগায়। বিভাগ-পূর্বকালে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই কাব্যগ্রন্থটি ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয় এবং ফররুখ আহমদ একজন শক্তিশালী ও মৌলিক প্রতিভাধর কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর ‘সিরাজাম মুনীরা’র অন্তর্গত কবিতাবলী বিভাগ-পূর্বকালে এবং প্রায় একই সময়ে রচিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বিভাগ-পরবর্তীকালে।

তাঁর সমসাময়িক ও উত্তরসূরী কবিদের ওপর ফররুখ আহমদের প্রভাবের আলোচনায় উপরোক্ত পটভূমির কথা অনিবার্যভাবেই আসে। কেননা, তাঁর অনুসারী ও অনুকারীদের ওপর ‘সাত সাগরের মাঝি’ এবং ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত

কবিতাবলীর প্রভাবই সর্বাধিক। কারণ, ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থেই তার কবিশক্তির সবগুলো লক্ষণ বর্তমান। “আরবী-ফরাসী শব্দের সুনিপুণ ব্যবহার করে, পুঁথি-সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব একটি ডিকশন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।” [শামসুর রাহমান, সওগাত, ফাল্গুন ১৩৬০]

বিভাগ-পূর্বকালে এবং বিভাগ -পরবর্তীকালেও ফররুখ আহমদের মত ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য এবং মুসলিম নবজাগরণের প্রেরণা নিয়ে যারা কবিতা লিখেছেন, তাঁরা প্রায় একই ধারা অনুসরণ করেছেন এবং কবিতার ভাষা, আঙ্গিক ও রূপরীতির দিক থেকেও হয়েছেন অনেকটাই তার প্রভাবাধীন। ইসলামী ও মুসলিম ইতিহাস এবং ঐতিহ্য থেকে, পুঁথি-সাহিত্য ও মুসলিম পুরাণ থেকে কাহিনী ও বিষয়বস্তু নিয়ে যারা খণ্ড এবং দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন, তাঁরাও ফররুখ আহমদের প্রভাব এড়াতে পারেননি। তিনি যে নিজস্ব ডিকশন তৈরি করে নিয়েছিলেন, তা বহুজনের কবিতায়ই প্রভাব ফেলেছে।

বিভাগ-পূর্বকালে এবং রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতে ফররুখ আহমদের প্রভাব যে ব্যাপক হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে সেকালের অনেক সমসাময়িক কবির রচনায়। উল্লেখ্য, ১৯৪২-৪৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সূচিত রেনেসাঁ আন্দোলন মুসলিম সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল নতুন পথ সন্ধান ও নির্মাণ-প্রচেষ্টায়। এ ক্ষেত্রে তাঁরা আইরিশ ও মার্কিন সাহিত্য আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা লাভের চেষ্টা করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, “সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা শোনা যেতে লাগল আরও পরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের পর। বলা হল প্রকাশ্যেই যে, আমাদের সাহিত্য হবে আলাদা; কেননা, আমাদের জীবনবোধ হিন্দুদের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। কবিতার ক্ষেত্রেই এ আদর্শের অনুসৃতি হল সার্থক।... কিছুটা অগভীর হলেও কাব্যক্ষেত্রে তিনটি ধারার চিহ্ন দেখা গেল - ইসলামী ঐতিহ্যের কাহিনী ও সৌন্দর্যের ধারা, ইসলামের সত্য বিশ্বাস এবং উপলব্ধিগত আদর্শ জীবনবোধ এবং সর্বশেষে পুঁথি-সাহিত্য ও পল্লী-গীতির রূপ এবং কল্পনার জীবন। [ইকবালের কবিতাঃ ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

রেনেসাঁ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসান প্রায় সমসাময়িক কালেই ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য-মণ্ডিত স্বতন্ত্র কাব্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক ও সহমর্মী এবং সহকর্মী হলেও রেনেসাঁ আন্দোলনের কালে আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি ও স্বাতন্ত্র্যের পথনির্দেশে ফররুখ আহমদই বলতে গেলে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আদর্শবোধ ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি চেতনা যেমন কবি-ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তি-প্রতিভাও সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের

দিক-নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি তার কবিতার বক্তব্য আঙ্গিকপ্রকরণ ও ভাষারীতি সমসাময়িকদের সৃজনীচেতনায় জাগিয়েছে অনুরণন। মুসলিম জাগরণের নায়ক এবং স্বতন্ত্র-সংস্কৃতি-চেতনার তুর্সবাদকদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয়েছে:

তোমরা এনেছ জ্যোছনা-ভেজানো  
স্বপ্ন সবুজ শাখে  
গভীর রাতের গুচ মোরাকাবা  
বন-ডাহুকীর ডাকে,  
কোথা নলবনে চৌচির হয়ে  
বাঁশী যেতে চায় ফেটে  
কোথায় জোলায়খা কোথায় মাস্তক  
চাঁপার আঙুল কেটে,  
কোথা মজলু বিরহী হৃদয়ে  
আকাশের নীরবতা,  
কোন ঝড়কায় শাহেরজাদীর  
ঘুম-ভাঙা রূপকথা  
নিশীথ রাতের ঘনায়িত ব্যাথা  
কোথা লায়লির প্রাণে  
মৌসুমী হাওয়া বয়ে গেছে বুঝি  
তোমাদের কানে কানে  
তোমাদের সুরে শুনেছি আমরা  
পথ চলবার বাঁশী,  
রুদ্ধ কপাটে যেখানে ঝঞ্ঝা  
বেজেছে সর্বনাশী  
ম্লান জড়তার জড়বাদ বাঁধ  
ভাঙে তোমাদের হাতে  
গোলাব কুঁড়ির ফুটবার ঝোঁজ  
দাও অমাবস্যাতে।  
বন্ধু ! তোমরা এনেছ দরদ  
উমরের বুক হতে  
কল্পলোকের আকাশ ছেড়েও

নেমেছ ধুলির স্রোতে,  
দুর্গত জনগণের সঙ্গে  
বেঁটে নাও ব্যথা-বিষ  
মরু ওয়েসিসে জাগাও তোমরা  
দোয়েলের মিঠে শিস।  
[দল বাঁধা বুলবুলি, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০]

এই আবেগই সঞ্চারিত হয়েছে সমসাময়িক কবি সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায়ঃ

তোমরা এনেছ সোনার কপাট খুলি  
তোমরা এনেছ সত্যের অঞ্জলি  
তোমরা এনেছ দিবসের দুখে  
স্বপ্নের উচ্ছ্বাস  
সংশয় ম্লান পৃথিবীর বুকে  
আনিয়াছ আশ্বাস  
তোমরা শায়েরী এনেছ নতুন গান,  
তোমাদের পথে বুলবুলি আজ  
শিস দিয়ে হয়রান  
নিরুদ্দেশের দুর্গম পথে  
তোমরা ঘোড়সওয়ার  
দীপ্ত দিবসে ঝলসিল হাতে  
উলঙ্গ তলোয়ার।  
স্নিগ্ধ নীলের জাজিম বিছানো  
নীল দরিয়ার বুকে  
প্রবাল-চূর্ণ ঢেউয়ের শিখরে  
সূর্যের শিখা খেলিতেছে  
কৌতুকে  
মাটিতে সফর আর নয় আর নয়  
মাটির অনেক ক্লান্তির দিন  
আনিয়াছে সংশয়  
এবার পানিতে নীল মখমল  
আয়েস এনেছে ভাই

উষ্ট্র-পাখীর ডানার পালক  
বিছানায় আর নাই  
সিঁধু-শকুন নেমে এসে নীচে  
ছুঁয়ে যায় জলকণা  
আমাদের মনে ভিড় করে এল  
অযুত যুগের স্বপ্ন-সম্ভাবনা ।

[ আমন্ত্রণ, মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫১ ]

উপরোক্ত ‘আমন্ত্রণ’ কবিতায় ফররুখ আহমদের ‘দলবাঁধা বুলবুলি’ (মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০) এবং ‘সাত সাগরের মাঝি’ (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখী ১৩৫০), ‘সিন্দাবাদ’ (সওগাত, পৌষ ১৩৫০) প্রভৃতি কবিতার আবেগ-আকৃতি এবং আঙ্গিক প্রকরণই শুধু অনুসৃত হয়নি, সেই সঙ্গে ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্প এবং বাকভঙ্গীও অনুসৃত হয়েছে ।

বস্তুতপক্ষে, রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়ে তরুণ মুসলিম কবিদের প্রায় সবাই ইসলামী আদর্শ, মুসলিম ঐতিহ্য-এ জাতীয় চেতনামূলক কবিতা রচনায় নজরুল এবং ফররুখ আহমদের কাব্যরীতিরই অনুসরণ করেছেন । এমনকি, শাহাদত হোসেন, বেনজীর আহমদ প্রমুখ পূর্বসূরীদের রচনায়ও এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদের কিছুটা প্রভাব বর্তেছে ।

চিন্তাধারা ও অনুপ্রেরণার দিক থেকে প্রায় একই বিন্দুতে অবস্থান করার ফলে সমসাময়িকদের রচনায় এই অনুসরণ অনেকটা সহজ স্বাভাবিকতার এলাকায় এসে গিয়েছিল । পুঁথির আদর্শ এবং লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যশালী অংশ ভিত্তি করে মুসলিম ঐতিহ্যের নবরূপায়ণে সৈয়দ আলী আহসানও ব্রতী হন । এসময় রচিত সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় ভাষা ও ভঙ্গির দিক থেকে নজরুলের প্রভাবও যেমন বর্তেছে, তেমনি সমসাময়িক কবি ফররুখ আহমদের কাব্যভাষা এবং বাকরীতির প্রভাবও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে । ১৯৫০ সালের দিকে লেখা সৈয়দ আলী আহসানের একটি কবিতাংশঃ

জরির জোকা, সেরোয়ানী আর  
আমামার সজ্জায়  
আতরের পানি মেশকের রেনু  
খোশবু বিলায়ে যায় ।

ইয়াকুতি আর জুমার রাতে  
ল্লেবাস পরিয়া  
সুলতানা আছে বসি,  
জোহরা-সেতারা নেমেছে মাটিতে  
আসমান হতে খসি ।  
[ বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন ]

গুধু ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের কবিতায়ই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তাঁদের সমসাময়িক এবং উত্তরসূরী কবিদের (যারা ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী) - অনেকের রচনায়ই আরবী, ফারসী শব্দাবলী এবং চলিত ভাষার পুঁথির কথা ও বাকভঙ্গী ভাষা ও রীতির অনুবর্তন ঘটছে। বিশেষতঃ পুঁথিসাহিত্যকেই যারা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে গ্রহণ করে এর নবরূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছেন, তাদের রচনায়ই এর প্রভাব বর্তেছে বেশী। মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আশরাফ, আশরাফ সিদ্দিকী, মতিউল ইসলাম, শাহেদা খানম, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী এবং আরও অনেকের কবিতায় এর পরিচয় আছে। কয়েকটি উদাহরণ :

আদমের খান্দান  
জ্বালাও এবার মন শামাদানে  
তৌহিদ অল্লান  
সুলাইমানের তখ্তে তাউসে  
যে আগের শিখা জ্বলে  
জ্বালাও সে আগে থাকের কুটিল  
কুঞ্চিত আঁখি তলে  
দেখাও আবার সফেদ লেবাস  
সোনালী আমামা, আর  
গৌরব জোব্বার  
লু-হাওয়ায় ভেসে আসছে যেখানে  
খোঁর্মা বীথির গান  
নাও নাও আজি সে পথের সন্ধান ।  
জড়ফ ওড়না উড়িয়ে লায়লী  
ডাকিছে বারম্বার



সে যে চিরজয়ী প্রেমের সারাভ  
যে পিয়েছে আল্লার  
নাই আর ভিন রাহা  
নবীজীর পথে গুড়া করে চলে  
বদকার আজদাহা ।

[ মতিউল ইসলাম, খান্দান, মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৫২ ]

মুফাখ্খারুল ইসলামও কাব্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন বিভাগ-পূর্ব কালে, রেনেসাঁ আন্দোলনের সময় । তিনিও কবিতায় ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন, ব্যবহার করেছেন আরবী-ফারসী শব্দাবলী এবং পুঁথির রীতিনীতি । রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়ই তিনিও ইসলামের ইতিহাসের পটভূমিতে এবং মুসলিম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাব্য উপাদান অবলম্বনে রোমান্টিক মানসচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন । লিখেছেন প্রেরণা উজ্জীবনী ও আবেগসঞ্চারী কবিতা । ফররুখ আহমদের মতই, অতীত ইতিহাসচেতনা এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতিবোধ তাঁর রচনায় ভাষা পেয়েছেঃ

সিতারা হিলাল ওতে আঁকা আছে  
ওই নীল আসমানে;  
ওরি রউশনী-ইঙ্গিত চলে  
দূর সফরের পানে ।  
মগীলী গুল্ম চিতল পত্র নড়ে  
ফুরফুরে সমীরণে;  
বুসা দেয় তারি পাতলা লবের ধারে  
বাবলের শাখা ক্ষণে ।  
আপেল-বনের শরদ কমল ছায়া  
রোদের গণ্ডি কাটে;  
আনার বাগিচা বিছাল  
আচল মায়া  
মরু-ঝঞ্ঝার ঘাটে ।  
[ কাফিলার পাসবান ]

ফররুখ আহমদের বাকভঙ্গী এবং উচ্চারণের সাযুজ্য মুফাখ্খারুল ইসলামের অনেক কবিতায়ই অনুভবযোগ্য :

পূর্ব হিন্দের সুদূর ফামিন-কুহের  
শৃংগ তার  
হয়তো শুনেছ দূর চোখ মেলি-  
ডেকেছে বখতিয়ার  
তোমার নামের ধমকে কেটেছে  
লাখো বছরের নিদ,  
ময়লুম এসে দাঁড়ায়েছে পাশে,  
কেঁপেছে জালিম হৃদ ।’  
[ বখতিয়ার খালজী ]

সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতাতেও মুসলিম পরিবেশ সৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের নবরূপায়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প রচনায় তিনি মুসলিম ইতিহাস ও পুরা কাহিনী থেকে কাব্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন এং এর ফলে ফররুখ আহমদের কবিতার মতোই তাঁর কবিতায়ও ‘লাইলী মজনু’, ‘শিরী-ফরহাদ’ ‘ইউসুফ- জুলেখা’ ‘হাতেম তাই’ প্রভৃতি চরিত্র রূপ-প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । পুঁথির ঘটনারাজি এবং চরিত্রাবলীকেও তিনি নতুনভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন ।

দেখেছি প্রত্যহ  
মণির শামীরা নিত্য  
ভুলে যায় জীবনের স্বাদ  
যখন অকাল বাধি তোলে  
সীমক গোলক  
হাসিনা বানুর দীর্ঘায়ত হরিণর চোখ  
পলাতকা মনে তাই  
আজাদ বক্তের সাধ জেগেছে কখন  
অমরত্ব খুঁজেছি সন্তানে  
অথবা হাতেম-সঙ্গী কোহেনিদা  
গুহার সন্ধানে  
জীবন-মৃত্যুর অর্থ ভেবেছি কত না ।  
[ বনি আদম ]

আবদুল গণি হাজারীরও কাব্যসাধনার শুরু ’৪৭-এর আগে অর্থাৎ বিভাগ-পূর্বকালে রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়েই । সে সময়ে তিনি কিছু কিছু ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্য

বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। এদিক থেকে ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের সাথে তাঁর এক ধরনের মানসআত্মীয়তা লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে, তাঁর রচনার উপজীব্য ও আঙ্গিকের এবং চেতনারও পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তবুও ফররুখ আহমদের প্রভাবের পরিচয় মেলে কোন কোন কবিতায় :

বাণিজ্য বায়ু হয়তো ডাক দিয়ে যাবে  
ময়না তুমি কি বোঝনা কিছু  
সাত সাগরের ঢেউয়ের মাথায়  
কিসতি আমার  
মেলবে না  
এই মৌসুমে  
কোন বন্দরে হবে নাকি লেখা আমার নাম  
সগুডিজার মাঝিমাল্লারা  
ডেকে গেছে বারবার  
সাগরের জল উত্তাল হয়েছে  
পূবের হাওয়ায় জোয়ার এসেছে  
বহুদিন হল  
ময়না আমার, বলবে না কথা  
এখনও কি তুমি ?  
[ অন্য তুফান ]

সেকালের অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধাবোধ আশরাফ সিদ্দিকীর রচনায় সেই বিভাগ পূর্বকালেই লক্ষণীয় হয়ঃ  
যেখানে সওদাগরী নৌকায়  
দ্বিপ্রহরের আসরে  
সায়ফুলমূলক আর বদীউজ্জামানের  
পংশীরাজ  
উড়ে চলে পুঁথির পাতার সুরে সুরে  
[ এখন দ্বিপ্রহর ]

গুধু স্মৃতিচারণায় এবং নষ্টালজিয়ার অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেই নয়। উজ্জীবনী প্রেরণা সৃষ্টি এবং নবযুগের পটভূমিতে প্রত্যয় দৃঢ় বক্তব্য প্রকাশেও (আশরাফ সিদ্দিকী) ফররুখ আহমদের মতোই, পুঁথি ও লোকসাহিত্য-আশ্রয়ী হয়েছেন, একালের ট্র্যাজিডি

বিধৃত করেছেন ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত ঘটনার স্মরণ নিয়ে :

এসো-

অশ্রু মুছে উঠে এসো ....

এই সেই কারবালা ময়দান

যুগের সৈনিকেরা যেখানে এজিদের

তীর খেয়ে লুটিয়ে পড়ে-

যুগের মহররম মাসে

ঐতিহাসিক এ -মৃত্যু ।

[ শান্তিসৈনিকের প্রতি ]

কিংবা -

দেখিয়া এলেম আমি আরবার

কারবালার রুধিরাক্ত আর্ত আহাজারী ....

তোমার আমার মত হাজার হাজার প্রাণ

হাজার হাজার আহা আদমসন্তান

এজিদের তীর খেয়ে খুঁজে মরে

পথের সন্ধান

এজিদের ছলনাতে চাক্ষুষ দূর্যের দিনে

কেঁদে মরে লক্ষ নর-নারী

[ আসাম ১৩৫৩ ]

১৩৫৩ সালে আসামের বাঙলা-খোদা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ কবিতায় মানবিক ট্র্যাজিডিই বাঙময় হয়েছে ।

কবিতায় প্রভাবের ব্যাপারটা কখনো হয় প্রত্যক্ষরূপে কখন বা পরোক্ষভাবে । অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব আবছা অনুভূতির স্তরে এবং চেতনার গভীরে কাজ করে । ফররুখ আহমদের হুবহু অনুসরণে কিংবা তাঁকে অনুকরণ করে আলোচ্য কবিরা সবাই কবিতা লিখেছেন কিনা সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল, ফররুখ আহমদের কাব্যরীতি ও বাকভঙ্গী তাঁদের অনেকের রচনায় প্রভাব ফেলেছে আর সেটা ঘটেছে সংস্কৃতিচেতনা ঐতিহ্যবোধ এবং মানস সাযুজ্যের কারণেই ।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, “ফররুখ আহমদের পরে আর যাদের দেখলাম, যারা ইসলামী বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন তাঁরা সকলে ফররুখ আহমদের অনুসরণ করলেন ।” [ পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা, ১৯৬৮ ] এ কথার সত্যতার পরিচয় মেলে বিভাগ-পূর্বকালে এবং বিভাগ-পরবর্তী কালেও ফররুখ-

অনুসারী বহু কবির রচনায়। সেকালের শাহেদা খানম, কামাল চৌধুরী, এ.এস.এম. আবদুল জলিল প্রমুখ কবিরা যেমন রেনেসাঁ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদের প্রভাবের আওতায় এসেছেন, তেমনি বিভাগ পরবর্তীকালেও এ প্রভাব অনেকের রচনায় লক্ষণীয়। যেমন ময়হারুল ইসলামের কবিতায়ঃ

তবে মন মোর হে নাবিক মন  
হে মন সিন্দাবাদ  
তুমি কি দেখেছ ঝঞ্ঝা ঢেকেছে  
আকাশের বাঁকা চাঁদ  
তবু ভয় নেই, তবু ভয় নেই  
হে গজনফর মন  
আজকে তোমায় বেছে নিতে হবে  
সবার মুক্তিপণ  
..... এবার তোমার নোঙর তোল,  
হে মন সিন্দাবাদ  
চারিধারে শোন রিক্ত মনের  
বুক ফাটা ফরিয়াদ  
বল্লম লও, তলোয়ার লও  
তীক্ষ্ণ বর্শা হাতে লও তুমি আজ  
কিস্তি তোমার ভাসাও দরিয়া মাঝ ....  
হে নাবিক মন ! হে সিন্দাবাদ  
মিনতি আমার নাও  
সোনার ধানের দেশ কোথাও আছে  
সেই দেশে আজ কিস্তি ভাসিয়ে দাও।

[ কবিতা/মাটির ফসল ]

উচ্চারণে ও বাকভঙ্গীতে এবং বিশেষভাবে ইতিহাসচেতনায় ফররুখ আহমদ ও জীবনানন্দ দাশের প্রভাবাধীন হলেও ময়হারুল ইসলামের উপরোক্ত কবিতায় সময়-সজ্ঞানতা এবং স্বদেশ-চেতনাও বাঙময়। 'নতুন কবিতা (আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত) শীর্ষক কবিতা-সংকলনের (১৯৫০ সালে প্রকাশিত) অনেকের কবিতায়, চেতনার গভীরে ও অবচেতনার স্তরে ফররুখ আহমদের প্রভাব লক্ষণীয় এবং অনুভবযোগ্য। বিভাগ-পূর্বকালেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মুসলিম ঐতিহ্যনির্ভর ও পাকিস্তান আন্দোলনকেন্দ্রিক কবিতায় এবং রোমান্টিক সনেটে ফররুখ আহমদের

কিছুটা প্রভাব বর্তেছিল। ‘নতুন কবিতা’র অন্তর্গত ‘ভূমধ্য সাগর তীরে’ শীর্ষক কবিতায় এবং কয়েকটি প্রেম বিষয়ক সনেটে জীবনানন্দীয় ও ফররুখীয় আবহ এবং বাকভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর অনুভব করা যায়।

‘নতুন কবিতা’র অন্তর্গত শামসুর রাহমানের কোন কোন কবিতা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ডক্টর হুমায়ুন আজাদের ভাষায় ও বিশ্লেষণে “শামসুর রাহমানই ‘নতুন কবিতা’ অন্তর্ভুক্ত একমাত্র কবি, যার কবিতার স্বপ্ন-কল্পনাবোধ উজ্জ্বল। স্বপ্ন-বিহার ও পরিবেশ চেতনা চুকেছে তাঁর কবিতায়, জীবনানন্দ দখল করেছেন তাঁর কল্পনা এবং চোখে প্রবেশ করেছে অচিরস্থায়ী মরু-স্বপ্ন। ‘অনেক চোখের রাত’ নামক কবিতাটির মরু-স্বপ্ন ভরা কয়েকটি পংক্তি এমন :

এমন অনেক রাত হয়তো নেমেছে/বাদাকশনের পথে/এমন অনেক রাত হয়তো নেমেছে সাত সাগরের ঢেউয়ে/হয়তো বা বিবসনা শা’জাদীর গজল মুখর/ কোন দূর ঝারোকায়ে/এমন অনেক রাত হয়তো নেমেছে/বেদুঈন কুমারীর চোখের পাতায়।” “এ রোমান্টিক স্বপ্নের ওপর প্রভাব ফেলেছেন হয়তো তিরিশের অব্যবহিত-পূর্ব মরু-স্বপ্ন - চারীরা, এমনকি ফররুখ আহমদ।” [শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা, পৃষ্ঠা -১৫]

বিভাগ-পূর্বকালে এবং বিভাগ-পরবর্তীকালেও ফররুখ আহমদের প্রভাবে কিভাবে সমকালীন ও উত্তরসূরী কবিদের রচনায় বর্তেছে, তা উপরোক্ত আলোচনা থেকেই আশা করি স্পষ্ট হবে। পঞ্চাশের দশকে যেমন পরবর্তীকালেও তেমনি, ফররুখ আহমদ ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং পুঁথি-সাহিত্যের নবরূপায়ণে আগ্রহী কবিদের ওপর ভাষা-ভঙ্গী, আঙ্গিক ও রূপ-রীতির থেকে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছেন। আবদুর রশীদ খান, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং আরও অনেকের রচনায় এর পরিচয় আছে। তবে এ আলোচনা বিভাগ-পূর্বকালের এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের পরিধি পর্যন্ত সীমায়িত বলেই সেই প্রভাবের পরিচয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার অবকাশ এখানে নেই হয়তো তা পরবর্তী কোন সময়ের উপজীব্য হবে।

যারা ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে গভীরভাবে বিশ্বাসী নন, পুঁথি-সাহিত্যের নবরূপায়ণ ও রূপকী প্রতীক ব্যবহারে যাদের উৎসাহ নেই, তাঁরাও অনেকটা পরোক্ষভাবে হলেও অনেকক্ষেত্রেই ফররুখ আহমদের প্রভাবের আওতায় এসেছেন। নজরুলোত্তর বাংলা কাব্যে প্রতীক ও রূপকের নবব্যবহার ফররুখ আহমদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং স্মরণীয় অবদান। ‘সাত সাগরের মাঝি,’ ‘হাতেম তায়ী,’ ‘হাবোদা-মরুর কাহিনী’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে প্রতীক ও রূপকের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার

রয়েছে। প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার আধুনিক কাব্যবোধ এবং জীবনচেতনার অগ্রসর কবিমনের পরিচায়ক। ফররুখ আহমদের কবিতায় মুক্ত জীবনের প্রতীক হিসাবে আদর্শের প্রতীক হিসাবে পাখির ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আদর্শআশ্রিত প্রতিভাসে ও আদর্শের প্রতীকে একদার স্বাধীন ও মুক্ত জীবনচারী পাখির উদ্দেশ্যে ফররুখ আহমদের গভীর আকৃতিভরা জিজ্ঞাসা :

আখরোট বনে  
বাদাম খোবানি বনে  
কেটেছে তোমার দিন।  
হে পাখি শুভ্রতনু  
সফেদ পালকে চমকে বিজুরি,  
চমকে বর্ণধনু।

সোনালি, রূপালি, রক্তিম রঙ্গিন।  
অকাল-মৃত্যু ঝড়কার কাছে এসে  
হে পাখী ! তোমার উঠেছে আর্তস্বর  
তুমি দেখ কোন ক্ষুধিত ভয়ংকর  
হিংস্র চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ শর  
নিরাশা-ধূসর কালো পটে ভাসে  
মৃত্যুর বন্দর।  
[আকাশ নাবিক]

মুক্ত জীবনের প্রতীক পাখির উদ্দেশ্যে ফররুখ আহমদের উত্তরসূরী এবং পঞ্চাশ দশকের কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সুগভীর জিজ্ঞাসা :

ফলবান বৃক্ষের ওপর ছেড়ে  
অধিকার তুমি  
শ্যামশোভা বন-নগরীর  
নিবিড় নায়ক পাখি তুমি  
কি করে খাঁচায় ঘরে স্বস্তি পেলে খুঁজে  
চিরতরে পাখি তুমি ?  
... ..  
মনে পড়ে পাখি, আকুল ফসল ভরা  
মাটির আহ্বান ?

মিহি রোদে ঝিকিমিকি কচি পাভা

বাতাসের সঙ্গে

মাতাল গাছের ছায়ায়?

[ পাখি তুমি ]

রীতিভংগী এবং প্রয়োগরীতির ভিন্নতা ও উচ্চারণের স্বাভাব্য সত্ত্বেও ফররুখ আহমদের কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং চিত্রকল্প রচনার ক্ষেত্রেও কিছুটা অলক্ষ্যে ছায়া ফেলেছে। উদাহরণ ‘ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালেও’ (ফররুখ আহমদ), ‘পালকমেঘের মত সুকোমল কৈশোরের স্বপ্নচারী’, (হাসান হাফিজুর রহমান)। ‘আকাশ নীলিমা’ ‘তারার চাঁদোয়া’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার সহজেই নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, ফররুখ আহমদের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার আঙ্গিক ও রীতিভঙ্গির সাথে এঁদের রচনার দূস্তর ব্যবধান।

ফররুখ আহমদের প্রভাব কেন পরবর্তীকালে ব্যাপকতা পায়নি, কেন তাঁকে অনুসরণ করে কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য কবি হতে পারেননি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে এবং ইতিমধ্যেই কোন কোন সমালোচক তুলেছেন। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন যে, নিছক অনুকরণ ও অনুসরণ করে কেউ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও বড় কবি হতে পারেন না। ফররুখ আহমদের কবিতায়ও মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশের প্রভাবের পরিচয় আছে, কিন্তু এই প্রভাবের আওতায়ই তিনি বন্দী থাকেননি। ব্যক্তি-প্রতিভার কল্যাণে এবং সৃজনী ক্ষমতায় তিনি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব পথ কেটে নিয়েছেন, বাংলা কাব্যে সংযোজন করেছেন বলিষ্ঠ ও নতুন কণ্ঠস্বর; ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে স্বকীয়তা মণ্ডিত কবিতা। তাঁর সৃজন শক্তির সাথে ঐতিহ্যবোধ, মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণা এবং গভীরতর বিশ্বাসের সমন্বয় সাধিত হওয়ার ফলে এবং ব্যক্তি প্রতিভার কল্যাণেই ফররুখ আহমদের সৃজন-প্রচেষ্টা এতখানি সার্থক মণ্ডিত হতে পেরেছে। অন্যপক্ষে, তাঁর সমসাময়িক ও সহকর্মীদের মধ্যে যারা ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্যের রূপকার হিসাবে কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা বিশ্বাসের স্থিরতর বিন্দুতে অবস্থান করতে না পেরে অনেকে ভিন্ন পথ নিয়েছেন, আবার অনেকে ক্রমান্বয়ে কাব্য-দিগন্তে দূরবর্তী অস্পষ্টতায় বিলীন হয়ে গেছেন। কিন্তু তাই বলে ফররুখ আহমদ কাব্য-পথের নিঃসঙ্গ পথিক ছিলেন, তাঁর সহযাত্রী কিম্বা অনুসারী ছিল না, তিনি সমসাময়িক ও উত্তরসূরীদের ওপর প্রভাব ফেলেননি, এমন কথা তথ্য-নির্ভর এবং ইতিহাস সমর্থিত নয়।



# মানবতার কবি ফররুখ

শাহাবুদ্দীন আহমদ

কবি ফররুখ আহমদকে দারুণভাবে ভুল বোঝা হয়েছে। সাধারণভাবে বাংলাদেশের একদল সমালোচক এবং তাদের মধ্যে প্রখ্যাত কেউ কেউ ফররুখকে যে অভিধায় দাঁড় করিয়েছেন আসলে ফররুখ তা নন, তা ছিলেন না কোদিন। একটা আনুমানিক ধারণা থেকে ফররুখকে যে সম্প্রদায়বিশেষের কবি বলে চিহ্নিত করা হয় সেটা বিশেষ রাজনীতিক কারণে যে তা ফররুখের গোটা সাহিত্য পাঠ করলে উপলব্ধি করা যাবে। আমি ফররুখের দু'টি প্রধান কাব্যের কথা বলব, 'সাত সাগরের মাঝি' ও হাতেম তা'য়ী' যেখানে কাব্য কোথাও বাগ্নিতার পর্যায়ে পৌছায়নি অথবা হয়ে ওঠেনি রাজনীতির প্রচারপত্র। যদি তার অন্তরে কোন আদর্শের আদল থাকেও, তা সাহিত্যিকরূপেই প্রকাশিত হয়েছে এবং সে জন্যেই বিশেষবাদের কবি বলে সীমাবদ্ধের শিকার হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা অন্যায্য হবে। মূল আলোচনা প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি ফররুখের 'হাতেম তা'য়ী'র দোসরা সওয়ালের সফরের পথে পরিচ্ছেদ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাব যে, কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কবির কলমে এই ধরনের উক্তির উদ্ভব হয় না :

আদমের আউলাদ, এক খান্দানের গোত্রভুক্ত  
নারী-নর, দেশে দেশে দূরান্তরে রয়েছে ছড়িয়ে  
বহু বর্ণ, অসংখ্য জবান কিন্তু রক্তধারা এক  
এক অনুভূতি হৃদয়ের। হাসি ও কান্নার অশ্রু  
বয়ে যায় একভাবে নীড় বাঁধা জীবনে, অথবা  
মরুচারী বেদুইন যাযাবর জীবনের স্রোতে।  
আল্লাহর রহমত, রেজা ঘিরে আছে একভাবে এই  
দুনিয়া জাহান। মুক্ত আলো বায়ু নামে একভাবে  
জনপদে, এক স্নেহচ্ছায়া ঘিরে আছে এ পৃথিবী  
আল্লার সংসার। তবু কেন এ বিভেদ ইবলিসের  
কি দুরাশা ধ্বংস করে মানুষের ঘর? কেড়ে নেয়  
শিশুর মুখের হাসি মুছে ফেলে শক্তি তরুণের,  
স্তব্ধ করে বলদপী কি আশায় জ্ঞানীর জবান?

রক্ত শোষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও  
এই পৃথিবীতে ? সভ্যতা গর্বিত মন জনপদে  
দেখে না কি রাত্রি দিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের  
ষড়যন্ত্রজাল শোষকের? দেখে না কি চারপাশে  
অনাহারক্লিষ্ট প্রায় ভারগ্রস্ত মরে ? মাটি, মাঠ  
কিনা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ  
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মত উদার  
উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে  
পড়েনি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে? পথে পথে  
কেন ব্যর্থ হাহাকার ? স্বপ্ন আর প্রশান্তির ঘর  
পৃথিবী হারালো কোন্ অহংকারে?

যে অনুভূতি ও উপলব্ধি উপরোক্ত আত্মকণ্ঠের জিজ্ঞাসায় প্রকাশ পেয়েছে তা যে  
সার্বজনীন অনুভূতি তা বোধ হয় ব্যাখ্যা ক’রে বোঝানোর প্রয়োজন নেই।

বলাবাহুল্য ফররুখের গোটা হাতেম তা’য়ী কাব্য মানবতামর্মী। ফররুখের  
মানবতার রূপ ও আদর্শ দেখার জন্য তাঁর এই একটি কাব্যই যথেষ্ট।

হাতেম তা’য়ীর হুসনা বানু তো অন্য কিছু নয়, সে সেই শান্তি ও মানবতা যাকে  
হুসনা বানু নামক দুর্লভ রমণীরূপে দেখানো হয়েছে। তাকে সহজে পাওয়া যায় না,  
তাকে সহজ প্রয়াসে জয় করা সম্ভব হয় না। একমাত্র পূর্ণ মানুষের পক্ষে সেই অতি  
দুর্লভ রত্নকে আয়ত্ত করা সম্ভব। জ্ঞান ও প্রেমে যিনি পূর্ণ, প্রজ্ঞা মনীষায় যিনি  
পরিণত, সাহস ও পৌরুষে যিনি শ্রেষ্ঠ, শ্রম ও নিষ্ঠায় যিনি অপরাজ্যেয়, সততা ও  
মনুষ্যত্বে যিনি অনন্য সেই-ই পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী। আর পূর্ণ মনুষ্যত্বে যে  
উত্তীর্ণ হবে সেই পাবে মানবতাকে, সেই পাবে শান্তিকে। কেননা মানবতা প্রতিষ্ঠা  
পেলেই শান্তিকেও পাওয়া যাবে।

সাত সওয়ালের যে ফাঁদে হুসনা বানু বন্দী সে সওয়াল তো আর কিছুই নয় তা  
হল মানবতার উদ্ধারকারী পথযাত্রীর পথের সম্ভাব্য বাধা। এই পৃথিবীতে সব  
মহামানবকেই বিশ্বের এই কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। কোন ঈসা,  
মুসা ও মুহম্মদ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে না ল’ড়ে সিদ্ধি লাভ করতে পারেননি। প্রশ্ন  
তো আর কিছু নয় সে হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্যরূপ রিপূর  
প্রতিবন্ধকতা। প্রথম সওয়ালেই আমরা এক পথিককে দেখছি যে লালসা রূপ  
লোভের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে, তাই সে প্রথম যাত্রার শুরুতেই ব্যর্থতার হাতে

আত্মসমর্পণ করল। সে একই সঙ্গে লোভ ও মোহের ফাঁদে ধরা দিল, সে মাহতাব সুরাতে নারীর যাদুকরী রূপের অতলান্ত দরিয়ার ডুবে গেল। কিন্তু জ্ঞানী ও দূরদর্শী হাতেম তাতে টলল না, সে বলল “জীন পরী পাবে না আমাকে, লালসার অন্ধকারে বিকাবো না মানবসত্তাকে।”

বলা বাহুল্য হাতেমের পূর্ণ সাফল্য ও বিজয়ের মৌল রহস্য কি? সে হল আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস আর মানুষের প্রতি অবিমিশ্র প্রেম এবং তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ প্রেম। এই প্রেম মানুষের জন্য সর্বত্যাগীর, সর্বস্বত্যাগীর। দূসরা সওয়াল-এর ‘পরীর প্রেম’ পরিচ্ছেদে কবি প্রেমের শক্তির সেই ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন :

পারেনি যেখানে যেতে কোন প্রাণী শক্তিমান  
কি করে সেখানে যাবে ঐ পরী নাজুক প্রাণ!  
প্রেমের শক্তি কাটবে কি তবে এ শর্বরী?  
হাতেম তায়ীকে চিনেছিল শুধু হাসনা পরী।  
অক্ষুট স্বরে পরী-রাণী তবে এ কথা বলে :  
প্রেমের পছা মানেনি তো বাধা জগদলে,  
মাশুকের পথ চেয়েছে জাহানে আশেক যদি  
পারেনি কখন বাধা দিতে তারে পাহাড়, নদী ;  
পারেনি কখন থামাতে সে গতি গিরি ও দরি।  
হাতেম তায়ীকে চিনেছিল শুধু হাসনা পরী।

এই মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ হাতেম তা’রীতে পরিশুদ্ধ পরিণতিতে পৌছেছিল কিন্তু তার আরম্ভ হয়েছিল ফররুখের কাব্যজীবনের শুরুতে। কবির প্রথম জীবনের কবিতা ‘রাত্রির অগাধ বনে’ ‘স্বপ্ন শেষ’ ‘শকুনেরা’ অথবা ‘লক্ষ ধ্বংস্তুপ’ ‘দুর্ভিক্ষের সন্তান’ ‘প্রেক্ষণ’ পরিপ্রেক্ষিত’ এই সংগ্রাম’ ‘ আজ সংগ্রাম’ এবং কিছু পরিণত যৌবনে রচিত তাঁর ‘লাশ’ প্রভৃতিতে আমরা যে কবিকে দেখি তিনি মানবতার লাঞ্ছনায় ব্যথিত ও বিদ্রোহী। এই বেদনা ফররুখকে একটি সমাধানকারী আদর্শের দিকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর সমসাময়িক কালে সুভাষ, সুকান্ত প্রমুখ কবিদের কবিতাতেও ঐ ব্যথিত মানবতার জন্য হাহাকারের সুর তীব্র হয়ে বেজেছিল এবং তারাও একটি বিশেষ আদর্শের সংগ্রামে নিপীড়িত মানুষের দুঃখের সমাধান খুঁজেছিলেন কিন্তু সে সমাধানের পথে ফররুখ স্বস্তি না পেয়ে অন্য পথ অবলম্বন করেন। এতে বাংলা কাব্যে কেবল বৈচিত্র বৃদ্ধি হল না, ফররুখ নিজেও মুক্তি পেলেন এবং এক নিজস্ব ধারার সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন।

এ কোন কুষ্ঠিত উচ্চারণের কথা নয় যে ফররুখ ইসলামী জীবনাদর্শের পথ মানবমুক্তির সমাধান বলে ভেবেছিলেন। তাঁর পৌরুষময় ব্যক্তিত্ব এবং বলিষ্ঠ জীবনবাদী চেতনা এবং একই সংগে আস্তিক্যবাদী বিশ্বাসী চিত্র অন্য কোন ধর্ম অথবা অন্যবাদে আকর্ষণ বোধ করেননি। তাঁর নিজের স্বভাবের সঙ্গে একাত্মবোধের এমন সুন্দর আশ্রয় আর অন্য কোথাও তিনি খুঁজে পাননি। সাহিত্যাংগনে ফররুখ আত্মরক্ষা করলেন একটি স্থির জীবনাদর্শে আত্মসমর্পণ করে। চিন্তাশীল ফররুখ বিশ্বসাহিত্য মোটামুটি যা পড়েছিলেন ইরানী, ইংরেজী ও জার্মানী এবং যে সব ধর্মী মতবাদ প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে যতটুকু অবহিত হয়েছিলেন তা থেকে তুলনামূলক বিচারে যা তাঁর কাছে সর্বোত্তম হাতিয়ার বলে মনে হয়েছিল সেটাকেই তিনি হাতে নিয়েছিলেন। এমন গভীর দৃষ্টি দিয়ে এবং এমন স্থির বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে বিচেনা করে এই আদর্শটিকে তিনি গ্রহণ করেন যে, তাঁর সমস্ত জীবনে আর কোনও মতাদর্শের মাহাত্ম্যরূপ তাঁকে টলাতে পারেনি।

প্রসঙ্গসূত্রে বলতে হয়, 'মানুষকে ভালোবেসেই তিনি ইসলামকে ভালোবেসেছিলেন। যেহেতু ইসলামের শিক্ষা মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা, মানবতাকে ভালোবাসার শিক্ষা। অতএব তাঁর জীবনদর্শন শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবনদর্শন।

সাম্যবাদ বলি, শান্তিবাদ বলি, অ-বর্ণবৈষম্যবাদ বলি, অ-শ্রেণী ভেদবাদ বলি, সমবন্টনবাদ বলি, অথবা এক কলায় মানবতাবাদ বলি, এ শিক্ষা যে একা ইসলামের তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ফররুখ শেষ পর্যন্ত সার্বজনীন মানবতাবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন। মনে রাখা দরকার ইসলাম কোন সাম্প্রদায়িকবাদ নয়। দু'চার জন জাহিল মুসলমানের নির্বোধ ক্রিয়াকর্মে ইসলামের আদর্শ ধূসরিত হয় না, ফররুখের আদর্শও নয়।

এ বিশ্বাস ফররুখের ছিল আর ছিল বলে মৌমাছির গুঞ্জনের মত তাঁর কানের কাছে তিনি সাম্প্রদায়িক এই কথা অবিরাম বেজে চললেও তাতে ভ্রঞ্জেপ করেননি। কারণ ফররুখ জানতেন দু'চারটি মৌমাছির দংশনে ফররুখের অপমৃত্যু হয় না। কারণ, ফররুখ কোন খড়ের কুটো নির্ভর করে ঝঞ্ঝাফুর্ক সমুদ্রে ভাসেন নি, আর যে চিন্তাই তিনি পোষণ করুন তাকে তিনি সত্যিকার দ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, কাল ফররুখ আহমদকে প্রবল মানবতাবাদী করে তুলেছিল। ফররুখের অভিজ্ঞতায় ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যন্ত্রণা, যুদ্ধজনিত কারণে অভাব ও দুর্ভিক্ষের বেদনা। ফররুখ নগর কলকাতার ক্রিষ্ট জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। দেখেছিলেন পরাধীনতার নিগ্রহ, দেখেছিলেন

জমিদারী ও মজুতদারী, দেখেছিলেন আভিজাত্য শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যের অভিশাপ দেখেছিলেন প্রবঞ্চক বুর্জোয়ার ছলনা, দেখেছিলেন বিদেশীর শাসন এবং বণিক ও বণিক-দালালদের শোষণ, দেখেছিলেন নগরী জীবনের ক্রন্দ, নারীর সতীত্বের লাঞ্ছনা, অভাবজনিত কারণে নারীর আত্মমর্যাদা বিক্রয়, দেখেছিলেন লাম্পট্য ও জীবন নিয়ে জুয়া, দেখেছিলেন চরিত্রহীন সুবিধাবাদীর তোষণ এবং মানুষের পথের কুকুরের মত জীবন ধারণ আর এই সব পুঞ্জীভূত বেদনা ও দুঃখ থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন। দুর্ভাগ্য, অভাব, অজ্ঞানতা ও মুর্থতা, লোভ ও লালসা অন্ধ আত্মা ও আত্মীয়প্রীতি, অন্ধ অর্থ ও দৌলত প্রীতিই যে মানুষের এই সঠিক দুর্দশার কারণ ফররুখ তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেদিকেই তাঁর অমিতসুন্দর কাব্যিক ভাষার রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

বিভাগ-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরীতে থেকে একদিন ফররুখের যে চেতনার উদ্ভব হয়েছিল সেই চেতনা তাঁর বিভাগ-উত্তর কালে স্তিমিত হয়নি। ফররুখ যে মানবতাবাদী পাকিস্তান চেয়েছিলেন তাকে তিনি তাঁর পাকিস্তানী জীবনে কোথাও পেলেন না। শোষকদের স্বরূপকে তিনি আরও প্রগাঢ়ভাবে ইতিমধ্যে উপলব্ধি করলেন, দেখলেন মানুষের চিরকালের ইতিহাসের কারণ, নমরুদ ও ফেরাউনেরা, শাদ্দাদ ও এজিদেরা পাকিস্তানে নতুনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তবু তিনি নৈরাশ্যের চাপে নিভলেন না বরং তাঁর মুজাহিদ আত্মা আরও জোরদার হয়ে উঠল। কারণ, তিনি জানতেন মানুষের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস এবং মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রামের পথেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। পাপ সম্পূর্ণভাবে নিষ্কিহ হবে না কিন্তু পুণ্যবান বিশ্বাসীর কাজ হবে মানুষকে পাপ ও পুণ্যের সুস্পষ্ট পথকে চিনিয়ে দেওয়া-বুঝিয়ে দেওয়া। ফররুখ তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠতম কাব্য হাতেম তা'য়ীতে মানবতাবাদী ধর্মের সেই মনীষা-দীপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণীকে উৎকৃষ্ট কাব্য পংক্তিতে, অপরূপ আঙ্গিক ও শিল্প সম্পদে গেঁথে গেছেন।

# কবি ফররুখ আহমদ

মুজীবুর রহমান খাঁ

ফররুখ আহমদ একটি সৌন্দর্য চেতনার নাম। আমাদের ঐতিহ্যভিত্তিক সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদ একটি বিশিষ্ট সুর সংযোজন করেছেন। এজন্য ফররুখ আহমদকে বলা হয় ইসলামী রেনেসাঁর কবি। আবার কেউ কেউ গুরুত্ব আরোপ করেন তার কাব্যের মানবিক দিকটার উপর তারা বলেন, ফররুখ আহমদ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষের গান গেয়ে গেছেন। তিনি মানবিকতার কবি। ফররুখ আহমদের এই দু’টি কবি সত্তাকে দু’টি পরস্পর-বিরোধী এবং বিচ্ছিন্ন কবি সত্তা বলেও কেউ কেউ চিহ্নিত করতে চান।

কবি ফররুখ আহমদের এই দু’টি কাব্যধারা আলাদা করে না দেখে তার প্রতিভার বৈচিত্র্য আমরা মূল্যায়ন করতে পারি। একই উৎসমূল থেকে পান করা একই অনুপ্রেরণার দু’টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলেও এটিকে আমরা নির্ধারিত করতে পারি। ফররুখ আহমদ ‘সাত সাগরের মাঝি’, ‘সিরাজাম মুনিরা’র কবি। তিনি ‘হাতেম তা’য়ী’ও লিখেছেন। তার কবিতার ধর্মে ও শরীরে অতীতের ছাপ আছে, তার কাব্যের সুরে ও কথায় ইসলামের আবেদন সোচ্চার। তিনি লিখেছেন-

“এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,  
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ,  
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কৈঁপে  
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠেছে দু’চোখ ছেপে  
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজতোরণ,”  
তারপর তিনি একই কবিতায় বলেছেন-

“শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা  
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা”

ফররুখ আহমদ বলেছেন-

“খোশ আমদেদ, গুলিস্তানের দলবাঁধা বুলবুলি,  
হেজাজ মরুর বালুকণা হাতে গোলাপ এনেছ তুলি,  
এনেছ রঙীন সিরাজী-সারা ব ঘুম নিঙরানো চুম,  
এনেছ জেহাদী তলোয়ার চোঁওয়া - খুন খারাবের ধুম।”

এসব কবিতার ভিতরই কবির ঐতিহ্য দিশারী মনের পরিচয় আমরা পাই। এ পথেই এ দেশের মানুষকে বাঁচার জন্য তিনি ডাক দিয়েছিলেন। এর ভিতর কেউ কেউ তার অতীতমুখী ও প্রতিক্রিয়া-ধর্মী মনকে আবিষ্কার করে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর কবিতাকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কটাক্ষও করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁর ‘লাশ’, ‘পটভূমি’, ‘পাথরের দিন’, ‘প্রেসম্যান’, ‘কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি’, ‘বিরাগ সড়কের গান’ প্রভৃতি কবিতাকে যুগনির্ভর, আধুনিক এবং মানবিক সুরে বাঁধা বলে কোন কোন সমালোচক অভিনিন্দিত করেছেন।

টি এস ইলিয়ট বলেছেন, বর্তমানের ভিতরেও অতীত আছে। অতীতকে একটা বর্তমানত্ব (Presentness of the Past) আছে। এটি ফররুখ আহমদের বেলায়ও সত্য। যুগ সচেতন কবি যেমন অতীতের যুগের আলোকেই দেখেন, তেমনিভাবে যুগ সচেতন ফররুখ আহমদও তাকে দেখেছিলেন। ইসলামী জাগরণের যেসব কথা তিনি লিখেছেন, সেসব কথা ও চিন্তা তাঁর সমকালীন মানুষের ঘরে ঘরে ছিল। এ উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার দাবী ছিল সেদিন আকাশে- বাতাসে। ইকবাল একদিন সে ভাবধারাকে ভাষা দেন। নজরুলের কণ্ঠেও ইসলামের জাগরণের বাণী আমরা শুনেছি। এই একই যুগ-চেতনার ফররুখ আহমদ ছিলেন উত্তরসূরী। ইসলামী রেনেসাঁর সাথে এই তিন কবিরই নাম জড়িত আছে।

নজরুলের মত ফররুখ আহমদও মানবিকতার কবি এবং মজলুম জনগণের কবি। আবার সাম্য ও মানবিকতার ধর্মই ইসলাম। ‘আল-ইনসানো আশরাফুল মখলুকাত’- মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ -এ ইসলামেরই বাণী। তাই ফররুখ আহমদ লিখতে পেরেছিলেন।

“জানি মানুষের লাশ মুখ গুজে পড়ে আছে ধরণীর পর  
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ির তাপে পড়ে আছে নিসাড় নিখর  
পাশ দিয়ে চলে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর .....

‘লাশ’ ও অন্যান্য মানবিকধর্মী এবং আধুনিক বলে চিহ্নিত ফররুখ আহমদের কবিতার সাথে তার ঐতিহ্যভিত্তিক কবিতার কোন বিরোধ নাই। এদের বাইরের রূপ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এদের আত্মিক বন্ধন অভিন্ন। যুগ-সচেতন ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের মধ্যে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যও আছে সত্য, কিন্তু তার কাব্যে সত্যিকার আদস্তে কোথায়ও মূল সুরে স্ব-বিরোধিতা নেই। তার আত্মিক ঐক্য কোথায়ও খণ্ডিত হয় নাই!

পরিশেষে, আমি শুধু বলতে চাই যে, কাব্য বিচারে কবির ব্যক্তিগত মতাদর্শ বড় কথা নয়, এক্ষেত্রে তার বিশ্বাস, ধর্ম, ভাবাদর্শকে বড় করে দেখলে চলবে না। কবির মত, বিশ্বাস, ভাবাদর্শ, ধর্ম ও চিন্তা-ভাবনার সাথে, কাব্য-রসিক ও সমালোচককে সম্পূর্ণ একাত্মতা ও সাযুজ্য ঘোষণা করে শুধু দেখতে হবে রসের রাজ্যে তার রচনার উত্তরণ সম্ভব হয়েছে, কি হয় নাই। এভাবে নিরাসক্ত বিচারে ফররুখ আহমদ যে সার্থক কবি, এ অভিমত নির্দিষ্টায় ব্যক্ত করা যায়।



# ফররুখ আহমদের কাব্য-নাটিকা ও সনেট-কাব্য আব্দুল কাদির

বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য হিসাবে হোমারের ‘ইলিয়াদ’ (Iliad), ব্যাসদেবের ‘মহাভারত’, ভার্জিলের ‘ইনেয়িদ’ (Aeneid), ফিরদৌসীর ‘শাহনামা’ ও Tasso-র Gerusalemme Liberata যেমন উল্লেখনীয়, কাব্যনাটক হিসাবে তেমনই মর্যাদার দাবী রাখে ইস্কাইলাসের, Agamemnon, সফোক্লসের Three Taeban Plays, কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’, সেক্সপীয়রের ‘হ্যামলেট’ ও গ্যেটের ‘ফাউস্ট’। বাঙলা ভাষায় গীতি-কবিতা ও আখ্যানকাব্য প্রথমাবধি থাকলেও কাব্যনাটক একালের সৃষ্টি; সেকালের যাত্রাওয়ালারা কখন কখন সংলাপে পদ্যরীতি ব্যবহার করলেও দৃশ্যকাব্য ঊনবিংশ শতকের উদ্ভাবনা। মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের নাট্যরূপ প্রদান করতে গিয়েই নাটকে যুক্তবন্ধ কাব্যরীতি প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষ্য করা হয়। রাজকৃষ্ণ রায়ের হরধনুর্ভঙ্গ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘রাবণ বধ’ নাটকদ্বয়ে এই রীতির প্রবর্তনা নবযুগের সূচনা ঘটে। দীনবন্ধু মিত্রের ‘লীলাবতী’, গিরিশচন্দ্রের ‘চণ্ড’, রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’, দ্বিজেন্দ্রলালের ‘ভীষণ’, ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘নবনারায়ণ’ প্রভৃতি নাটক প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর পয়াররীতিতে রচিত - তাদের কোন কোন দৃশ্যে গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’ সম্পূর্ণতঃ অমিল পয়ারে রচিত নাট্যকাব্য। বাঙলা নাটকে অমিল দীর্ঘপয়ার প্রথম ব্যবহার করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘প্রবোধ চন্দ্রোদয়’ ও ‘চণ্ডকৌশিক’ নাটক দু’টির কয়েকটি দৃশ্যে। একটু নমুনা-

বিধবা করিয়া সব অসুর -বধুরে,

প্রভু ওগো-

তাদের সীমন্ত হ’তে সিন্দুর

করিয়া অপনীত

লেপন করিলে তাহা সূর্য দেহে ; তাই

সে গো এবে লোহিত বরণ।

লক্ষ্মী আলিঙ্গিলা তোমা ভূজ-পাশে,

সেই আলিঙ্গন-ভরে পীনস্তন পত্রাবলীচিহ্ন  
পড়ে ওই বক্ষঃস্থলে- এবে যাহে মুক্তামালা  
- (প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, চতুর্থ অঙ্ক)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আয়ুত্মতী’ সম্পূর্ণতঃ অমিল দীর্ঘ পয়্যারে রচিত কাব্যনাটিকা।  
কয়েকটি চরণ দেখুন-

আশীর্বাদ করে তুমি আমারে ও আমার প্রিয়ারে  
অস্তাচল-চূড়া হ’তে। কাল পুনঃ ভাস্বর প্রভাতে  
- সুবর্ণে রঞ্জিব যবে তরঙ্গিত উদর-সাগর,  
আমাদের দু’জনের প’রে বরষিয়ো রশ্মিচ্ছটা  
মৌন মহিমায়, অপরূপ, - লাবণ্যের লাজাজ্জলি।

এই পাঁচ ছত্র নমুনা থেকেও মনে হয় যে, ‘আয়ুত্মতী’ যতখনি নাটক তার  
চাইতে অনেক বেশী কাব্য। রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’ সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি করা  
চলে। ‘চিত্রাঙ্গদা’ অপেক্ষা তাঁর ‘সতী’ অথবা ‘মালিনী’ নাট্যগুণে অধিকতর প্রদীপ্ত।  
ফররুখ আহমদের ‘নৌফেল ও হাতেম’ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠে: তার কোন গুণ শ্রেষ্ঠতর-  
কাব্যগুণ না নাট্যগুণ?

আগেই বলেছি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আয়ুত্মতী’ নাটকের ছন্দের আদলে ফররুখ  
আহমদের ‘নৌফেল ও হাতেম’ সংরচিত। কিন্তু ছন্দ অরূপ হলেও নাটকীয়তা গুণে  
‘নৌফেল ও হাতেম’ অনেক বেশী উত্তীর্ণ। আর ‘নৌফেল ও হাতেম’ ছাড়া ‘আয়ুত্মতী’র  
পরে এই ছাঁচে আর কোনো নাট্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে কিনা, আমার জানা নেই।

ইতালীয় কবি Horace (খৃস্টপূর্ব ৬৫ অব্দে জন্ম) তাঁর দি আর্ট অফ পোয়েট্রিতে  
বলেছেন:

IF you Would have your Play

desrve success,

Give it five acts complete;

nor more, nor less;

নাটকে পঞ্চাঙ্ক যোজনা এদেশেও সুপ্রচলিত রীতি। কিন্তু গ্রীসে ‘ট্রিলোজি’  
(Trilogy) হয় জনপ্রিয়। কালক্রমে ‘ট্রিলোজি’ সংক্ষিপ্ত হয়ে নাট্যকাব্যে তিন-অঙ্ক  
হয়েছে কিনা, তা বিশেষজ্ঞেরা বলতে পারেন। আলোচ্য ‘নৌফেল ও হাতেম’ তিন  
অঙ্কের কাব্যনাটিকা। প্রথম অঙ্কে পাঁচ দৃশ্য।

এই কাব্যনাটিকার নায়ক 'নৌফেল' ও নায়িকা 'বেগম'। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নৌফেল-চরিত্রের বিকাশ হয়েছে স্বাভাবিক; কিন্তু 'বেগম' চরিত্র সংঘাতের আবর্তে প'ড়ে গ'ড়ে ওঠেনি- তা 'মুর্শিদ'-চরিত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র হয়েছে। 'মুর্শিদ'-চরিত্রের মতোই 'হাতেম' চরিত্রও গোড়া থেকেই আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অবিচল-বিচিত্র ঘটনার টানা-পোড়েনে প'ড়ে বিকাশের অপেক্ষা রাখেনি। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই 'হাতেম' সম্বন্ধে নৌফেলের রাজ্যের 'তয় দর্শক' বলছে-

একবার করে যে পুরা, সাখাওতি করে যে জাহানে,

সঠিক জবান যার', তা'য়ী-পুত্র- সে দরাজ -দিল্,

হাতেম-চরিত্রের এ-সব বিশিষ্ট গুণ যদি গোড়াতেই বর্ণনার মারফত না হয়ে ঘটনা-সংঘাতের মাধ্যমে প্রকাশ পেত। (যেমন প্রকাশ পেয়েছে তৃতীয় অঙ্কে), তবে তার প্রভাব হত অধিক কার্যকরী। অবশ্য Horace বলেছেন-

The business of the drama

must appear

In action or description what

We hear

With Weaker passion Will

affect the heart,

Then when the faithful eye

beholds the part.

ঘটনার সমধিক বিন্যাসে মার্জিতরুচি দর্শকের মনে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে, এই আশংকাতেই বর্ণনার বিকল্পতা নাটকে স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষতঃ কাব্যনাটকে বর্ণনার অবকাশ সমধিক,- রূপ বা গুণের ব্যাখ্যানেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বেশী ফুটে ওঠে। আলোচ্য নাটকে এরূপ বর্ণনা আনন্দপ্রদ। হাতেম তার নিজের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে বলছে :

খ্যাতির সংঘর্ষে আমি দেখি নাই মর্দমী কখন।

অন্যত্র বলছেঃ

সামান্য খাদিম আমি ইন্সানের, তবু বলি,

এলাহির রেজামন্দি চেয়ে যে হয় খিদমতগার মানুষের

কিন্মা মখলুকের,

হয় না সে কোনদিন খ্যাতির পূজারী।

হাতেম-চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে সরাই মালিক বলছেঃ

স্বার্থের সংগ্রামে তা'কে পাবে না কখন  
মৃত্যু-মাঠে, অঙ্গের ময়দানে। কিন্তু অন্যায়ের মুখে  
আল্ বোরজের মত শিলা-দৃঢ় তার প্রতিরোধ।  
তুর পাহাড়ের মত দক্ষ সে আল্লাহর মহব্বতে,  
ভালবাসে স্রষ্টার সৃষ্টিকে।

শায়ের বলছে :

এ মাটিতে,

হীন স্বার্থে কলঙ্কিত জুলমাতের হিংস্র অক্ষকারে  
যেখানে দুর্লভ জানি মানুষত্ব, মদমী, সেখানে  
হাতেম তা'রীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মত,  
হাতেম তা'রীর শির পর্বতের মত মহীয়ান  
সুবহে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রউশন।

এসব বর্ণনায় যে চরিত্র-মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে, তা শুধু আনন্দের আন্বাদই দেয় না, মনুষ্যত্বের প্রেরণাও দেয়। সফোক্লসের Antigone নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে : রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তির বিবেকের দ্বন্দ্ব (The state Versus the Conscience to the individual) ; আর 'নৌফেল ও হাতেম' নাটকে দেখানো হয়েছে : ব্যক্তির খ্যাতির লিঙ্গা বনাম মান-বিকতার দ্বন্দ্ব। শুধু মনুষ্যপ্রীতি নয়, মনুষ্যত্বপ্রীতিও এই কাব্যনাটিকার অন্তর্নিহিত আদর্শ। এই মহৎ আদর্শের প্রচারণা কাব্যসৌন্দর্যের আবহে ও নাটকীয় ঘটনার আবর্তে এমন রসমহিমামণ্ডিত হয়েছে যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান হবে সংশয়াতীত।

ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' ১৮- অক্ষরের পংক্তিতে রচিত কাব্যনাটিকা। আর তাঁর 'মুহূর্তের কবিতা' ১৮ অক্ষরের পংক্তিতে রচিত সনেট-শতক। সনেটে থাকে এক ছন্দের ১৪টি পংক্তি এবং তা একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা। বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেট লেখেন মধুসূদন; তিনি ১৪-অক্ষরের চরণ ব্যবহার করেন। ইংরাজি সনেটে পঞ্চপদিক আয়ম্বিক ছন্দ ব্যবহৃত হয়; অনেকে মনে করেন যে, বাঙলায় তার অনুরূপ ছন্দ হচ্ছে-১৮-অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত। গোবিন্দ-চন্দ্র দাস ১৪-অক্ষরের পয়ার-পংক্তিতে সেক্সপীরিয় পদ্ধতিতে তাঁর ১২০টি সনেট প্রণয়ন করেন; সেই পদ্ধতিতে ছন্দে সঙ্গীতের রেশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছন্দকে কিছু মুক্তি দিতে

হয়, তাই সেক্ষেত্রে ১৪-অক্ষরের পংক্তি ব্যবহারই উপযুক্ত পছন্দ। কিন্তু আদি-ইতালীয় বা পেত্রাকীয় পদ্ধতিতে সনেটের সংহতি -গুণ কুত্রাপি শিথিল করা চলে না; কাজেই সে - পদ্ধতিতে ১৮ -অক্ষরের পংক্তি ব্যবহারই সনেটের স্থাপত্য কঠিন গাভীর বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আলোচ্য সনেট গ্রন্থে সেক্সপীরিয়-পেত্রাকীয় প্রভৃতি সকল রীতিতেই ১৮-অক্ষরের চরণ ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন : ‘মুহূর্তের কবিতা’ ; তাঁর এ-সব কবিতাকে ভেবেছেন “যেমন শিশির” অথবা “জন্ম নেয় যে কবিতা অর্ধস্কুট গোলাপের পাত্রে।” ইংরেজ কবি দান্তে গ্যাব্রিএল, রসেটি তাঁর House of Life নামক সনেট-গ্রন্থের মুখবন্ধ-রূপী সনেটটিতে বলেন-

A sonnet is a moments monument.

সনেট হচ্ছে একটি মুহূর্তের মিনার। সনেট ‘শিশির’ বা ‘পুষ্প’ তুল্য নয়; A sonnet is a coin সনেট তুলনীয় কঠিন মিনারের সঙ্গে, সমৃদ্ধ মুদ্রার সঙ্গে। কিন্তু ফররুখ আহমদের গ্রন্থের ‘মুহূর্তের কবিতা’ নাম সার্থক এজন্য যে তাতে সনেটের গাঢ়বন্ধ সুসংহত রূপ রচনা অপেক্ষা কাব্যভাবের সুখমা মগনের দিকে মনোযোগ অধিক। তিনি বলেছেন : “সে সুর আমার নাই, সে আনন্দ হারিয়েছি কবে।” তাঁর এই আক্ষেপ মাঝে মাঝে যথার্থ মনে হলেও তাঁর সমগ্র গ্রন্থটি প’ড়ে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁর কবিপ্রতিভা এখন অন্তিমুখ হয়নি- তাঁর এসব রচনা তাঁর প্রতিভা-সূর্যের শেষ কিরণ-সম্পাত নয়। এখন নিসর্গের সৌন্দর্য, মানুষের সংগ্রাম, তারুণ্যের স্বপ্ন তাঁর প্রাণে জাগায় অফুরন্ত রোমাঞ্চ। পুলকে তিনি গান গেয়ে ওঠেন ‘ফাল্গুনে’-

‘বনানী সেজেছে সাকী ফুলের পেয়ালা নিয়ে হাতে’,  
তুহিন শীতের শেষে দেখি আজ মুক্ত রূপ তার।  
গাছে গাছে ডালে ডালে তারুণ্যের জেগেছে জোয়ার,  
জেগেছে ফুলের কুঁড়ি অরণ্যের মদিরা বিলাতে।  
এতদিন যে অধ্যায় বর্ণে গন্ধে পারেনি মিলাতে  
এখন পেয়েছে তব্বী সেই বর্ণ ফুলগন্ধ-ভার’  
সবুজের অন্তরণে জীবনের অজস্র সম্ভার  
পেয়েছে বনানী ফিরে আজ ফাল্গুন -প্রভাতে॥  
এখন তরুণী সেই প্রশাখার মত বহু মেলে  
একান্তে প্রতীক্ষমানা দয়িতের সাথে চায় মিল,  
অরণ্যের শামাদানে প্রতীক্ষার মণিদীপ জ্বলে।

দেখে সে বিস্ময়ে চেয়ে সাজানো বনের মাহফিল!

হৃদয়ের সব সুর, অনুরাগ কণ্ঠে তার টেলে'

এ নির্জন বনছায় গেয়ে যায় প্রচ্ছন্ন কোকিল॥

এটি পেত্রাকীয় ছাঁচের সনেট। এর মিল-বিন্যাস (rhyme-structure) হচ্ছে-  
ক খ খ কঃ ক খ খ ক। গ ঘ গ ঘঃ গ ঘ ॥

পেত্রাকীর প্রিয় দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এই-

ক খ খ কঃ ক খ খ ক। গ ঘ ঙঃ গ ঘ ঙ ॥

এ গ্রন্থের 'জামী', 'হাফিজ', 'চিরাগী পাহাড়', 'জালালী কবুতর', 'একটি সূর্যোদয়' ও 'অশেষ' এই শেষোক্ত রীতিতে রচিত।

উপরোক্ত প্রথম পদ্ধতির অষ্টকে দু'প্রকার ও ষটকে দু'প্রকার মিল থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতির অষ্টকে দুপ্রকার এবং ষটকে তিন প্রকার মিল থাকে। আদি-ইতালীয় কোন রীতির সনেটেই মোট পাঁচের বেশী এবং ষটকে মোট তিনের বেশী মিল থাকে না। ষটকের চার ছত্রে এক রকমের মিল হয় না। অথচ আলোচ্য গ্রন্থের 'বিষন্ন চাঁদ' ও 'অশেষ ঐশ্বর্য' শীর্ষক সনেট দু'টিতে মিল-বিন্যাস হচ্ছে এ প্রকার-

ক খ খ কঃ ক খ খ ক। গ ঘ গ গ ঘ গ ॥

মনে হয়, সনেট গীতধ্বনি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এরূপ অন্ত্যমিল ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা এও হতে পারে যে, ভাবের অব্যাহত প্রকাশের প্রয়োজনেই তিনি এই ধারা উপযুক্ত ভেবেছেন। তাঁর অনেক সনেটেই মিল-বিন্যাসের প্রচলিত রীতির সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়; তার হেতুও হয়ত এই।

আলোচ্য গ্রন্থে 'ময়নামতী মাঠে', 'পুঁথি পড়া', 'সাতান্নুর কবিতা', 'সাম্পান মাঝির গান' ও 'প্রার্থনা' নামে কয়েকটি 'সনেট-পরম্পরা' (Sonnet sequence) স্থান পেয়েছে। 'সনেট-পরম্পরা' আসলে একটি অথও কবিতা, একই ভাবের সূত্রে গ্রথিত হয়ে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। 'ময়নামতীর মাঠে' শীর্ষক সনেট-পরম্পরার প্রথম দু'টি সনেট নিম্নে উদ্ধৃত করছি-

এক.

মাঠের সীমান্তে ঘেঁষে যেখানে প্রাচীন ঝাউ গাছ

(নির্জন পথের ফৌজ) বাতাসের শোনে দীর্ঘশ্বাস,

যেখানে সমস্ত দিন নদীতীরে খঞ্জনের নাচ,

যেখানে মাটির কান্না সারাক্ষণ কাঁদায় আকাশ;

সেখানে অনেক রাতে ঝাউ-শাখে ঘোড়া বেঁধে রেখে

জিণের শা'জাদা নামে ময়নামতীর ফাঁকা মাঠে ।  
 উজ্জ্বল আগুন-রঙ শা'জাদার (জানে না অনেকে)  
 কি যেন খোঁজে সে একা অন্ধকারে কুণ্ঠিত ললাটে !  
 বাউ-ডালে বাঁধা ঘোড়া অসহিষ্ণু মেঘের মতন  
 ঘুমন্ত মাঠের বুকে হেঁষা-রবে কাঁপায় কখন ।  
 (আলোয়ার শিখা জ্বলে নাসারন্ত্রে) । শা'জাদা উন্মূন  
 দিওয়ানার হালে ঘোরে (দেখেছে প্রবীণ বৃদ্ধ কোন) ।  
 জমাট আঁধার যেই চিড় খায় মোরগের ডাকে,  
 ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মিশে যায় সে রাতের বাঁকে॥

দুই.

অমা অন্ধকার কালো ঝড়ো রাতে শুনেছি আবার  
 ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঝড়-গতি মাঠ থেকে মাঠে  
 ঘোরে সে ঘুর্নীর মত; আকাশের বিরুদ্ধে কপাটে  
 দিয়ানার আহাজারি প্রতিহত হয় বারম্বার ।  
 আঁধারে যায় না দেখা, মনে হয় সে ঘোড়-সওয়ার  
 কাল ঘোড়া নিয়ে তার খুঁজে ফেরে দিক-দিগন্তর;  
 চাপ চাপ অন্ধকারে মিশে থাকে ঘোড়ার কেশর;  
 আতশী যন্ত্রণা শুধু অনুভব করা যায় তা'র॥

বাউ-শাখা ভেঙে পড়ে তার সেই আগ্নেয় প্রশ্বাসে !  
 সমস্ত মাঠের বুক বিক্ষত ঘোড়ার পদতলে  
 দলিত, মথিত, পিষ্ট ! নামে আকাশের আঁখি জলে  
 কী সান্ত্বনা ! শেষ হয়ে যায় ঝড় বৃষ্টির আশ্বাসে !

এ কাহিনী পুরাতন ; তবু বৃদ্ধ জয়ীফেরা বলে,  
 কাল বৈশাখীর রাতে সে ঘোড়সওয়ার ফিরে' আসে ।  
 উপরোদ্ধৃত প্রথম সনেটটি সেক্সপীরিয়; তার হাঁচ-

ক খ ক খ : গ ঘ গ ঘ । ঙ চ ঙ চ : ছ ছ ॥

দ্বিতীয় সনেটটি ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় রীতিতে রচিত ; তার হাঁচ-  
 ক খ খ ক : ক গ গ ক । ঘ ঙ ঙ ঘ : ঙ ঘ ॥

এ দু'টি সনেটে কল্পনার উদ্দাম বিহার ও ভাবের নিগূঢ় মূর্তি হয়েছে মোহনীয়। কিন্তু এই সনেট পরম্পরার তৃতীয় ও চতুর্থ সনেটে দুর্বল মিল (famine rhyme) ব্যবহার ও মিল-বিন্যাসে বেপরোয়ায়ীতি অনুসরণের দরুন ভাবের মোহন রূপ ভাস্বর থাকে নি, -মাঝে মাঝে ভাবের সূত্রগুলো গেছে জড়িয়ে। ছন্দমিল সম্বন্ধে এজরা পাউণ্ড বলেছেন-

A rhyme must have in it some slight element of surprise is to give pleasure ; it need not be bizarre or curious, but it must be well used at all. (Literary Essays, p.7)

নিখুঁত মিল ব্যবহার সম্বন্ধে ফররুখ আহমদ যদি অধিকতর সচেতন হতেন, তবে তাঁর অনেক সনেটই মধুরতর ছন্দঃ স্পন্দের সৃষ্টি করত। বলাবাহুল্য যে, সনেটের সুকঠিন গাঁথুনিতে প্রধান সূত্রের কাজ করে নিখুঁত মিল,- সেই সৃষ্টি করে সুগভীর ছন্দধ্বনি, এবং সেই মিল ছন্দতরঙ্গে সনেটের সূচাম অবয়বে বাজে মধুর গীতঝংকার। ফররুখ আহমদের অনেক সনেটেই কল্পনার ঐশ্বর্য ও ভাবের বিস্তার প্রচুর; তাতে যদি চমৎকার অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ ঘটতো, এবং মিল-কল্পে থাকত অধিকতর বিধি-বশ্যতার পরিচয়, তা হলে তাঁর পরিবেশিত রসের ভোজ হত পরিপূর্ণ। সংক্ষেপে: বলা চলে, তাঁর কোন কোন সনেট বক্তব্য-প্রধান (verse as speech) হলেও কয়েকটি সনেট বাস্তবিকই গীতধ্বনিময় কবিতার (verse as song) হয়েছে। সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি 'হাজারে না মিলে এক'। কাজেই স্বল্পসংখ্যক রচনার জন্যেই ফররুখ আহমদ সার্থক সনেটকার হিসাবেও মর্যাদার আসন পাবেন।



# ফররুখের স্বোপার্জিত ভবন 'হাবেদা মরুর কাহিনী'

আফজাল চৌধুরী

শ্রেষ্ঠ কবিতা ও রচনাবলী-জাতীয় প্রকাশনা ছাড়া ফররুখ আহমদের মরণোত্তর পর্বের প্রকাশিত দুটি কাব্য গ্রন্থের একটির নাম 'কাফেলা' ও অপরটির নাম 'হাবেদা মরুর কাহিনী'। 'কাফেলা'র প্রকাশ কাল আগস্ট ১৯৮০ এবং 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র সেপ্টেম্বর ১৯৮১। শেষোক্ত গ্রন্থে দীর্ঘ এক ফর্মার একটি সমৃদ্ধ ভূমিকা আছে কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ'র। এই গ্রন্থের ভূমিকাংশের সব শেষে স্বয়ং ফররুখ আহমদের ক্ষুদ্র বক্তব্য, 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র পাণ্ডুলিপি প্রাথমিকভাবে শেষ করে নোট আকারে তিনি যা লিখেছেন, তাও আছে। মন্তব্যটি নিম্নরূপঃ

“রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম 'হওয়ার ময়দান'। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সওয়ালাে।

'হাবেদা মরুর কাহিনী'-গদ্যে লেখা রূপক কবিতা। ঈসায়ী উনিশ শো সাতান্ন'র শেষ ভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশ শো আটান্ন'র প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতাটি লেখা হয়-দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল আর সেই মারাত্মক নৈরাজ্যের মুখে যখন প্রত্যেক দেশাত্মবোধ সম্পন্ন নাগরিক কামনা করেছিলেন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের।”

মোট ঊনপঞ্চাশটি ছন্দ-মুক্ত, অন্তর্মিলহীন কবিতার সঞ্চয়ে এই কাব্যগ্রন্থের অবয়ব নির্মিত। প্রথম কবিতাটিকে উপপাদক রূপে ধরলে মোট কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় আটান্ন। বিশ শতকের আটান্ন সালে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত বলে কবিবাচ্যে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণও উল্লেখিত। তাই এ -আটান্নটি কবিতা বিশ শতকের প্রথমপাদের আচ্ছন্ন আটান্নটি সৌর বছরের খতিয়ান রূপেও সংখ্যা-রহস্য ব্যঞ্জনায উপস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে, যে দুর্বহ দুঃসময়ের, কিংবা এর উৎক্রান্তির অথবা এর পরিণতির সাক্ষী কবি নিজেই। বলা আবশ্যিক যে, এ গ্রন্থে, কাল-চেতনা কবির অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অনেক বেশী আকৃষ্ট, প্রায় অমোঘ, দূরতিক্রম্য, তাই সনিষ্ঠরূপেই বিশ্লেষিত। ব্যগ্র পাঠক নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেবেন যে, কবির মর্মরশোভিত প্রথম গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'ও অমিত কাল-চেতনায় সংক্রমিত, তবে 'সাত সাগরের মাঝি'তে উভুঙ্গ আশার

দিগন্তচাৰী বিচরণ কবির অমিত শক্তির লীলা বিচ্ছুরণ করেছে। আর এই গ্রন্থটি যেন নিউটনের গতির সূত্রের 'ইকুয়াল এণ্ড অপোজিট রিয়াকশন'কে ধারণ করেছে যা 'সাত সাগরের মাঝি'র সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান। ফলে ফররুখ-তত্ত্বের ধীর বিশ্লেষণে, কবি-রহস্যোদঘাটনে এ-গ্রন্থ দারুণ দলিল রূপেই শুধু মূল্যবান নয় বরং এ-কবিত্ব কতটুকু কালোত্তীর্ণ তা সৎবিচারও এরই সাহায্যে নিরূপণ করতে হবে। অতএব প্রথা বা 'ক্লিশে' তাত্ত্বিকতা নয় বরং মৌল, আমূল ও ফররুখীয় একটি নিজস্ব মার্গ নির্দেশ করে 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র যথার্থ মূল্যায়নের জন্য আহ্বান জানানো আমরা প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব বলে বিবেচনা করছি।

দূর্ভাগ্যক্রমে ফররুখ আহমদের ডিকশন নিয়ে যত বাদানুবাদ হয়েছে তার সিকি ভাগও মূল্যায়নধর্মী বিতর্ক আমাদের সমাজে হয়নি। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুর সাথে উপেক্ষা প্রদর্শনজনিত কারণে জড়িত কুচিহ্নিত ব্যক্তিরো ও শোকসভা ও শোকালোচনায় ব্যাপ্ত হয়েছেন এবং সিরিয়াস ফররুখ চর্চায় আগ্রহ দেখানো আবশ্যিকতার দিকে ঝুঁকেছেন। এখন ফররুখ চর্চায় বিমুখতা দেখানো আর সম্ভব নয়। ফররুখের কাব্যসম্ভার এখন জাতীয় সম্পদ এবং তাঁর বেপরোয়া চরিত্রও একটি মডেল বিশেষ। কিন্তু তাই বলে যে তাঁর শব্দচয়ন-নীতি নবীন সমাজে গৃহীত হয়েছে তাও বলা যাবে না। বরং কৃত্রিম পাহারা ও প্রয়োচনায় নবীনমণ্ডলকে ফররুখের উত্তরাধিকারের স্পর্শ হতে দূরে রাখার সচেতন প্রয়াস আছে। এত বড় প্রতিভাকে ডিঙিয়ে লেসার জিনিয়াসকে তুঙ্গে তোলার একটি জাতীয় ফ্যালাসীর কান্টও চালু হয়েছে। ফলে সত্যিকার গণমুখিনতা ভুল ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হচ্ছে এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক মুক্তি হচ্ছে সুদূর পরাহত। কিন্তু ফররুখ আহমদের এ বিশেষ ডিকশন কি ফ্যালাসী গ্রন্থ? তাঁর শব্দচয়ন কি পশ্চাদমুখী? জাতীয় মিথ্ (myth) রূপে তিনি যা অনুশীলন করেছেন বা গছাতে চেয়েছেন তা কি জবরদস্তিমূলক ও অবৈজ্ঞানিক? এ সমস্ত প্রশ্নের সুন্দর সুরাহা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ফররুখ-চর্চার আশু বাধা যে কমিউনিকেশন গ্যাপ তা বলিষ্ঠ হাতে সরিয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরী। এসব বিতর্কমূলক প্রশ্নের জটিল আবর্তে এখন যাচ্ছি না আমরা। শুধু একটা ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি, যা ফররুখ আহমদের শব্দচয়ন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদের সহগামী কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ফররুখের এই সমবয়স্ক কবিদ্বয় নিষ্ঠা ও প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতার শক্ত প্রবক্তা ও প্রতিনিধিত্বশীল কবিরূপে এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। এই চল্লিশের দশকেই একদিকে ক্ষয়িষ্ণু নান্দনিকতা (সমর সেনকে যে ধারার ঐ দশকীয় প্রতিনিধি বলা যায়) ও সুকান্ত-

সুভাষ প্রদর্শিত বামপন্থী গণমুখিনতা দ্বন্দ্বমুখর দুটি পথ খুঁজে নেয়। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও আত্মসী বামবাদ প্রবেশ করে স্নায়ু যুদ্ধে এবং বুদ্ধদেব বসুর মত মুরব্বীও কাছা এটে নেমে পড়েন লড়াইয়ের ময়দানে। কমরেড মুজাফফর আহমদ নজরুল চর্চার অবতারণা করে তাঁর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তাকে বুদ্ধের নান্দনিকতার বিরুদ্ধে ঢালরূপে ব্যবহার করেন এবং সুভাষগণ নজরুলকে মাথার ওপর ছাতররূপে মেলে ধরেন। এ সময়েই সুভাষদের বন্ধু ফররুখ অমিত বাহুবল নিয়ে সে দলে না ভিড়ে নিঃসঙ্গতায় সমাধান খুঁজতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, ততদিনে শক্ত হাতের জন্য তিনি বাম মহলে সুকান্তের চেয়েও অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ কবি-ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই কি তাঁর গন্তব্য পথ? ফররুখের মনে প্রশ্ন। প্রচলিত এ ভাষাতেই তাঁকে সারাজীবন লিখতে হবে কি? তাঁর মনের দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই ঘনঘোর জিজ্ঞাসায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, মৌন হয়ে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত পথ ও পাথেয় দুই লাভ করলেন। এ সব কথা তাঁর দুটি একটি সনেটে ব্যক্ত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে একমাত্র মধুসূদনের সঙ্গেই তাঁর মিল পাওয়া যায় এবং প্রতিভা ও সামর্থ্যে সত্যিই তিনি তো মধু কবির মতই ক্লাসিক ও দ্বিজজয়ী। শৈলী নির্বাচনে ও বিষয় সন্ধানে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর ‘কাসাসুল আশিয়া’ পাঠ, হাতমে তা’যীর মিথ্ গ্রহণ ইত্যাদি তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রিক নব-বাঙলা সভ্যতার মধুসূদন রূপেই উপস্থাপিত করছে- ‘ফররুখ আহমদ’ এই নামেই রয়েছে এক অসামান্য দার্ঢ্য ও ব্যঞ্জনা।

ফলে যুগনায়ক রূপে তাঁর মনযিল তাঁকে দূর থেকে ডেকেছে, অসামান্য দূরদৃষ্টি নিয়ে তিনি চলেছেন। সমসাময়িক সকলের হয়ে, সকলের দায় কাঁধে তুলে নিয়ে। দূরদৃষ্টিহীনরা তাঁকে আজও বুঝতে পারছে না। তাই ফররুখ-বিতর্ক আজও চলছে, চলছে তাঁর প্রভাব ক্ষালনের অপচেষ্টা এবং নিপুণ অন্তর্ঘাত।

বর্তমানে মোট সতের কোটি বাংলাভাষীর মাঝে বার কোটিই মুসলমান। বার কোটি মানুষের হৃৎস্পন্দন অননুভূত বাংলা সাহিত্য চর্চায় স্বাভাবিকভাবে এ জনতার ভাষা, মিথ্, মটিফসমূহের সুপ্রতিষ্ঠা এবং আধুনিকতার সম্মিলন সাধনের মহাব্রত তিনি পালন করে গেছেন। তাই মহাগণমুখিতা তাঁর অনুগমন করেছে, তাঁকে এর পেছনে ছুটেত হয়নি। বুদ্ধদের বসুর নান্দনিক স্কুল ও সুভাষ-সুকান্তের গণমুখী নৈশ-বিদ্যালয়ের সংগে ফররুখের গণমুক্তি আন্দোলনের মিল ও বেমিল এখানেই। তাঁর সিন্দাবাদ-বৃত্তি ও হাতেমতা’য়ীপনার ব্যাখ্যাসূত্র ও এরূপ তুল্যমূল্যেই সহজলভ্য বলে আমরা মনে করি।

ফররুখ আহমদ ‘সাত সাগরের মাঝি’তে যে উত্তুঙ্গ সমুদ্র বিহার করেছিলেন তার শম ঘটেছে ‘হাবেন্দা’ মরুর কাহিনী’তে। ‘সাত সাগরের মাঝি’তে আশা-

নৈরাশ্যের প্রচণ্ড দোলাচল আছে, সমুদ্রের বন্দর হতে বন্দরে নোঙ্গরপাত ও গমনাগমন আছে, আছে সমুদ্র ঝড়ের সঙ্গে বলিষ্ঠ পেশীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এমনকি, 'রাত পোহাবার কত দেবী'- এই প্রশ্নের এফোঁর ওফোঁর করা দিগন্ত বিদারণ। তবু যৌব শক্তি হাজার মার খেয়ে সেখানে ক্লান্ত হলেও শ্রান্ত নয়, এক বুক ভরসায় ভাঙা পাটাতনে তবু সেখানে পাল চড়ছে, মহা কুন্ততে চলছে দাঁড় টানাটানি। কিন্তু 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে শ্রান্ত প্রৌঢ়ত্ব ঐতিহাসিক অভিযাত্রার ক্রটি-বিচ্যুতির বিচার-বিশ্লেষণে ব্যাপ্ত এবং এক নিঃসীম হওয়ার তেপান্তরে, বাদগর্দ হাম্মামের প্রহেলিকায়, আদিগন্ত নৈরাশ্যের মরীচিকায় পথ হারিয়ে লক্ষ্য করছেঃ

এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাবে বলে

টেনে নিয়ে চলছে গহীন বনের অন্ধকারে

যেখানে অপমৃত্যুর খাদের মত

গভীর গড়খাঁই, আর কাঁটা তারের পাহারা।

বিভিন্ন মতবাদ অধ্যুষিত দুনিয়ায়।

এই তো বিভ্রান্ত মানুষের চেহারা।

[চব্বিশ : হাবেদা মরুর কাহিনী]

এদিকে সমুদ্রপথে যে বিচরণ শুরু হয়েছিল একদা 'সাত সাগরের মাঝি' রূপে সেই ভ্রমণ, স্থলপথে অন্তহীন 'কাফেলা' রূপে হেরার রাজতোরণের উদ্দেশ্যে, চিত্ররূপময় অভিযাত্রায়, এসে পৌঁছেছে এক নিষ্করণ দশতে হাবেদায়। বর্ণনাটি এইরূপঃ

কাফেলা এসে দাঁড়ালো

হাওয়ার মাঠ দশতে হাবেদায়

জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে

খাঁ খাঁ করছে যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া ময়দান

যেখানে পোড়া-মাটি রঙ ফসলের শূন্য মাঠ

বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুমরে উঠছে রাত্রি দিন ...

কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে,

সব চেয়ে প্রাণবন্ত চারা গাছ

যে মাটিতে মাথা তুলে

কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে

যে মরা গাছের শুকনো ডালে দেখছি

ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন ... ..

সব চেয়ে বলিষ্ঠ বুক  
 আর জোরালো ডানার পাখি  
 যে প্রান্তর পার হওয়ার পাখি  
 ডানা গুটিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে মুখ খুবড়ে  
 আজদাহার তীব্র দৃষ্টিতে সম্মোহিত শিকারের মত  
 তারপর আর কোন দিনই যার সাড়া পাওয়া যায়নি।

কাফেলা এসে দাঁড়ালো  
 হাবেদার সেই মৃত্যু-হিংস্র প্রান্তরে  
 একদিকে যার ক্ষুদ্র কহর দরিয়া  
 অন্যদিকে লুন্ধ বাদগর্দ হাম্মাম  
 জেগে আছে দুই ধ্বংসের  
 দুই অপমৃত্যুর ইশারা নিয়ে  
 এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো সবার মন  
 আসন্ন মৃত্যুর আভাসে,  
 কেঁপে উঠলো কাফেলা-সালার  
 সেই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তরে,  
 হাওয়ার মাঠ দশতে হাবেদার  
 তপ্ত তামার মত ময়দানে .....

[ দুই : হাবেদা মরুর কাহিনী ]

এ অবস্থায় যা হবার তাই হয়েছে অর্থাৎ গতি রুদ্ধ হয়েছে, সংকট হয়েছে ঘনীভূত। সচেতন পাঠক ইতিমধ্যে অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, এ-গ্রন্থের কবিতাগুলোর শিরোনাম নেই (উদ্ধৃতির শেষে নম্বর যুক্ত শিরোনাম দেয়া হয়েছে এক, দুই, ঊনপঞ্চাশ ইত্যাদি) এবং গদ্য-ছন্দ এর বাহন। যে ‘সাত সাগরের মাঝি’তে তরঙ্গ দোলার মতই ছন্দের দোল এখানে তা বেলাভূমির ভাটার চিত্রের মতই অপসৃত। যে ‘সাত সাগরের মাঝি’তে রোমাঞ্চকর চিত্ররূপময়তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য-কলারূপে উৎকীর্ণ এখানে তা একমাত্র রূপকালংকার ছাড়া আর কোন ভূষণে সজ্জিত নয়। এ ব্যবধান যৌবনের সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের, আবেগের সঙ্গে হিসাবের, সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থতার। কেননা :

জোনাকী জ্বলা বিজন বনের মধ্যে  
 ক্ষণিক আলো-ছায়ার মত

জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে  
আমাদের সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা !  
যে-আলোয় পথ চিনে নেয়া যায় না ।  
যে-অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যায় না পথের নিশানা  
সেই অস্বস্তিকর আলো-আধারিতেই  
শেষ হয়ে যাচ্ছে  
আমাদের মৃত্যু তিক্ত দিন  
আমাদের মৃত্যুর তিক্ত রাত্রি  
এই ভয়ংকর, অমোঘ নেমেসিসের করাল গ্রাসে আমরা সকলে নিপতিত, কিস্তিঃ  
তবু যখন দেখি  
শান্ত সাম্পান মাঝির চোখে  
হঠাৎ ঝলসে ওঠা  
সিন্দাবাদের চোখের বিস্মৃত দ্যুতি,  
তখন আমি আশ্বস্ত হই ।  
আমি বিশ্বাস করি  
ইসলামের প্রাণ প্রবাহ আবার যাবে ছড়িয়ে  
দুনিয়ার এই প্রান্ত থেকেই সারা জাহানে ।

[আঠারো : হাবেদা মরুর কাহিনী ]

শেষ পংক্তিটি লক্ষ্য করার যোগ্য যে, দুনিয়ার এই প্রান্ত থেকেই সারা জাহানে  
ইসলামের প্রাণ প্রবাহ আবার যাবে ছড়িয়ে । এ আবার কী উদ্ভট বিশ্বাস কবি-চিন্তে  
উথলে উঠল? এমনিতেই নৈরাস্যের ঘনাক্ষকার? কিস্তি আলো ফুটবে আবার হেন  
এক হারানো দিগন্ত হতেই-তা কী ভাবে সম্ভব? না এ-কোন প্রগলভ খেয়ালিপনা  
নয়, বরং শান্ত আত্মবিশ্বাস, আত্মসত্তা সম্পর্কিত 'বাকাবিল্লাহ' পর্যায়ে উপনীত এবং  
ধ্যাননেত্রে স্কুরিত তার আত্মরূপ দর্শনই এই বিশ্বাসের ভিত্তি, যথা-

সমস্ত ঘুমন্ত শিশুকে বুকে নিয়ে  
যখন ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবী  
শূন্য ভাসমান এক বিশাল দোলনার মত  
তখন জেগে থাকে শুধু ধ্যানীর দৃষ্টি  
অতন্দ্র তারাদের সাথে  
রাত জাগা পাখিদের সাথে  
স্বপ্নে দেখে সে হাবেদা মরুর প্রান্তরে

এক নতুন ভোরের,  
 স্বপ্ন দেখে এক নতুন যুগের  
 দু'চোখ বেয়ে যখন নেমে আসে  
 দু'ফোঁটা শিশির বিন্দু  
 দুনিয়ার সব দৌলতের চেয়ে কিম্বতী  
 সকলের চেয়ে দামী ।

[ ছেচক্লিশ : হাবেদা মরুর কাহিনী ]

২. চিহ্নিত এই 'সে' কে? আমাদের সিদ্ধান্ত তিনি স্বয়ং কবি ।

মধুসূদনের সঙ্গে তাঁকে আমরা তুলনা করেছি । মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' কবির শক্তি, সামর্থ্য ও উর্ধগামিতার যে বলসানো রূপের ধারক তাঁর সর্বশেষ সৃষ্টি 'মায়াকানন' তাঁর দেউলিয়াত্বের দর্পণ রূপে তাঁর ফতুর দশার অভিজ্ঞান রূপে উত্থান ও পতন নির্দেশ করেছে । কিন্তু ফররুখের ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য টানার প্রস্তাব আমরা করি না । কারণ, 'হাবেদা মরুর কাহিনী' 'মায়া কানন'-এর মত ফতুর নয় কিংবা হালকাও নয় । 'হাবেদা মরুর কাহিনী' একটি নিরাভরণ সার্থক রূপক কাব্য । আগাগোড়া এক সীটিঙয়ে বসে দারুণ ঔৎসুক্যে এটি পড়তে হয় । আমাদের স্বকাল এতে এমন রূপে অঙ্কিত যা রূপকে-প্রতীকেও হুবহু তাই । এটি একটি গদ্য পৃথিবীর রূপকাক্ষয়, একটি সরল রেখায় খচিত, মাত্র একটি ভূষণে ভূষিত । একে 'সাত সাগরের মাঝি'র ভূষণ পরানো যেন বেশ্যাকে গিল্লীর অলংকারে সাজানোর শামিল । ফররুখ যেহেতু যথাযথ কালচেতনায় প্রাজ্ঞ তাই তিনি তা পারেন না । এখানে কবির প্রতিভার ফতুরত্ব আবিষ্কার নিরর্থক । 'যেমন নুন-পানি, তেমনি কাম জানি' - এই হচ্ছে দক্ষ রাধুনির বচন । যেমন কাল তেমনি তার রূপাঙ্কন দক্ষ কবিরই কাজ । যথা উক্ত 'বলাকা' রচয়িতার রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন 'পুনশ্চ' কাব্য সাদামাটা গদ্যে কালের সঙ্গে তাল ঠুকে । তেমনি 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিও স্বকালের সঙ্গে ঘরোয়া গদ্যের মিতালি পেতেছেন 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে মাত্র একটি কারণে :

যেন বঞ্চিত বনিআদমের দীর্ঘশ্বাস  
 রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে  
 যেন এই ভূষাতণ্ড হাবেদার মরু মাঠ  
 আবার হতে পারে  
 সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত

দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য

দুনিয়ার সকল মানবীর জন্য ।

[ উনপঞ্চাশঃ হামেদা মরুর কাহিনী ]

এই গ্রন্থের শেষ কবিতার একেবারে শেষাংশ হতে উপরের উদ্ধৃতি নিয়েছি । কবির অশেষ শুভ কামনা বলিষ্ঠ আশাবাদ, মানবমুক্তির দৃঢ় স্বপ্নসাধের সকল উপকরণই এখানে আছে । এশিয়ার সতের কোটি জনতা অধ্যুষিত একটি সভ্যমণ্ডলের মুখ্য কবিকণ্ঠরূপে তাঁর এই উচ্চারণ খুব সহজেই বলে দেয় যে, ইনি ‘ফররুখ আহমদ’ । আমরা তাই কবির মরণোত্তর পর্বের এ কাব্য-গ্রন্থকে ফররুখের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এবং আমাদের সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রূপক কাব্য রূপেই গণ্য করতে চাই ।

কবির স্নেহভাজন উত্তরসূরী জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ গ্রন্থটির সুদীর্ঘ ভূমিকায় এ কাব্যের একটি সুস্পষ্ট ক্রটি নির্দেশ করেছেন । তিনি বলেছেন :

“মুজ্জহ্মদের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ও শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারে অমনোযোগ কিংবা অসতর্কতা কবিতার সুশৃঙ্খল অন্তর প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে । কারণ, গদ্য কবিতার ছন্দ যদিও সুনির্দিষ্ট কিংবা নিরূপিত ছন্দ নয়, তাহলেও ছন্দস্পন্দন (রিদম) এবং যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ কিংবা চোরাস্রোত, তা -ও শব্দ নির্বাচনের এই অসতর্কতা ও অমনোযোগের কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায় । ফররুখ আহমদের মত শব্দ-সচেতন, ভাষা ব্যবহারে দক্ষ কবির ক্ষেত্রেও যে এমনটি না ঘটেছে, এমন নয় । ‘হামেদা মরুর কাহিনী’তেও তিনি বক্তব্য প্রকাশের অকারণ ঝোঁকে অনেক অকাব্যিক ও নিতান্ত গদ্যাভ্যক শব্দ ব্যবহার করেছেন । কবির বদলে হয়ে উঠেছেন বক্তা ।”

তারপর তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে উদ্ধৃত করেছেন নীচের পংক্তিগুলো :

যেদিন থেকে আমরা নিয়েছি

ঈমানের পরিবেত বে-ঈমানী

একতার পরিবর্তে অনৈক্য

আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা

(কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা)

গুরু হয়েছে সেদিন থেকেই

আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি ।



কবিতাটির নম্বর বার। উপরের উদ্ধৃতির পর চার-ছয়টি পংক্তির শেষে কবিতাটি শেষ হয়েছে এইভাবেঃ

যে-হাত বিলিয়ে দিত সারা দুনিয়ার বুকে  
বেশুয়ার চুনি, পান্না, জমরুদ, জওহেরাত  
সে হাত এখন অন্যের দরজায় ত্রুপার্থী  
দুনিয়ার বুকে যে ছিল শ্রেষ্ঠ বন্টনকারী দাতা  
সে আজ ভিক্ষা চায় কান্না করুণ কণ্ঠে  
একটি সামান্য তামার পয়সা।

কোন বিচারেই উদ্ধৃত এ শেষাংশ অকাব্যিক নয় বরং সেতারের আলাপ ও মীড়ের আয়াস সাধনের পর বৃষ্টিমুখর ঝালার মত শেষ পংক্তিগুলো কানে অনশ্বর সঙ্গীতের রবে বাজতে থাকে। বেদনা ও নৈরাশ্যের দারুণ ঘূর্ণাবর্ত রচনাকারী এ-কবিতাটির শেষাংশের সূচনার আলাপ তাই সাদামাটা গদ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ-তো বরং এক শিল্প কুশলতাই বটে।

তবু কথা থাকে। এ-কাব্যের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি নির্মাণের বার বছর পর কবির লোকান্তর পর্বে এটি প্রকাশিত হল। তিনি এর উৎকর্ষ বর্ধনের কোন সুযোগ আর পেলেন না। একটানে লিখে ফেলে গেছেন, তাই কুড়িয়ে এখন প্রকাশ করা হচ্ছে। এখন তাঁর আকরিক পর্যায়ে লেখা সংগ্রহ করে বিনা মার্জনায় তা প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা জানি প্রেসের ছাপা বন্ধ করেও বড় লেখকেরা পাণ্ডুলিপি কাটা-ছেঁড়া করে থাকেন। ফররুখ জীবিত থাকলে কি তাই করতেন না?

# ফররুখ আহমদের কবিতায় কিংবদন্তী : হাতেম তা'য়ী প্রসঙ্গ

সৈয়দ মন্জুরুল ইসলাম

১.

পাঁচ বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ -কাব্য নাটক 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) এবং কাহিনী কাব্য 'হাতেম তা'য়ী', (১৯৬৬) প্রাক-ইসলামী যুগের কিংবদন্তীর পুরুষ হাতেম তা'য়ীর ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন অনুসঙ্গে প্রকাশ করেছে। কবির কাব্যজীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে রচিত এ দুই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র হিসাবে একই ব্যক্তির উপস্থিতি বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফররুখ আহমদের কাব্যনির্মাণের সামগ্রিক পরিসর বিবেচনা করলেও কোন চরিত্রের এমন বিশাল প্রকাশ চোখে পড়ে না। কিংবদন্তীর আরেক নায়ক সিন্দাবাদ, প্রতীকী চরিত্র হিসাবে কোন কোন কবিতায় উপস্থিত। আরও কয়েকটি কবিতায়, বিশেষ করে 'সিরাজাম মুনিরা' কাব্যগ্রন্থে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং ইসলামী উন্মেষের সঙ্গে জড়িত আরও কিছু ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এ স্থানে কিংবদন্তী রূপান্তরিত হয়েছে ইতিহাসে। এবং ঐতিহাসিক ও আদর্শগত পরিমণ্ডলে বিচরণকারী এসব প্রাত। স্মরণীয় চরিত্র চিত্রণে ফররুখ আহমদ যতটা সফল হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী সফল হয়েছেন কিংবদন্তীয় হাতেম ও সিন্দাবাদের চরিত্র চিত্রণে। অর্থাৎ ইতিহাস অপেক্ষা কিংবদন্তীতে তাঁর প্রকাশের উল্লাস এবং সাক্ষন্দ অধিক। এবং খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, 'সিরাজাম মুনিরা'র ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোও এক সময়ে কিংবদন্তীর পোষাক পরে অবতীর্ণ, যে পোষাক চরিত্র হিসাবে তাঁদের উত্তরণের প্রধান বাহন। পরিশেষে, কিংবদন্তীয় এবং ঐতিহাসিক, এই উভয় শ্রেণীর কাহিনী বিন্যাস, আবহ সৃষ্টি, চরিত্রাঙ্কন, প্রতীক-উপমা ব্যবহার এবং বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকগত প্রকাশের একটি মূল্যায়নে এই ধারণা স্পষ্টতর হবে যে, ফররুখ আহমদের প্রধান উৎকর্ষ তাঁর প্রথমোক্ত বিচরণ ক্ষেত্রে। তাঁর কাব্যাদর্শ, কবি পরিচয় এবং ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত অবস্থান বিচারে কিংবদন্ত চিহ্নিত হবে তাঁর প্রধান প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে।

২.

ষাটের দশকে হাতেম তা'য়ী ফররুখ আহমদের দু'টি বৃহৎ সৃষ্টির কেন্দ্রে কি ভাবে প্রতিস্থাপিত হলেন এবং এর ফলে কবির সৃষ্টিধারায় কোন নতুন দিকচিহ্নের

সংযোজন হ'ল কিনা, এই বিবেচনার আগে দু'টি জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে হবে। প্রথমতঃ হাতেম তা'রীকে এবং দ্বিতীয়তঃ হাতেম তা'রী কেন? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর লুক্কায়িত প্রাক-ইসলামী আরবের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য এবং কিংবদন্তীতে এবং দ্বিতীয়টির উত্তর ফররুখের ভাবাদর্শের বিস্তীর্ণ পশ্চাৎভূমিতে। দু'টি প্রধান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ফররুখের কল্পণার রসায়নকে সুসংহত করেছে। ইসলামী আদর্শের যে রূপরেখা অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি তাঁর কবিতায় নবজাগ্রত মুসলিম মানসের অনুসরণীয় হিসাবে দেখাতে চেয়েছিলেন, সেই আদর্শের স্থান ও পাত্র সমন্বিত হয়েছিল হাতেম চরিত্রে এবং কিংবদন্তীয় ও পৌরাণিক কালের সকল অনুষ্ণ মানবিকভাবে ইসলামী বলে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে কালের সমস্যাটিও তিনি দুরীভূত করেছেন। পুঁথি সাহিত্যের যে সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপতি হয়েছিল এবং তিনি যার আজীবন অনুরাগী ছিলেন, সেই পুঁথি সাহিত্যেরই এক সফল নায়ক হাতেম। এই হিসাবে তিনি স্থান, কাল ও পাত্রের উর্ধ্বে। এবং এই অবস্থানে হাতেম অতি সহজেই মহৎ আদর্শবোধের এক জীবন্ত প্রতীক হিসাবে অত্যন্ত সবলভাবে কার্যকরী। লিখিত ও পৌরাণিক। এ উভয় বিবেচনায় স্বাভাবিক পছন্দ ছিলেন হাতেম। লিখিত ও পৌরাণিক ইতিহাসের সময়কে ডিসিয়ে এত সহজে আদর্শের জগতের সময়হীন সংজ্ঞাহীন এক প্রতীকে মূর্ত হতে পেরেছিলেন এবং তাও আবার পুঁথি সাহিত্যের পুরাতন ধারায় কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে, এজন্যই হাতেম।

কিংবদন্তী বা myth এর আলোচনায় যে প্রসঙ্গসমূহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেগুলো হচ্ছে কিংবদন্তীর উৎপত্তি এবং তার ব্যবহার ও কার্যকারিতা। পণ্ডিতগণ সকলেই একমত যে, কিংবদন্তীর উৎপত্তি প্রাক ইতিহাসে, আদিম মনের সৌন্দর্য চেতনতার বহিঃপ্রকাশে। এর আরও একটি দিক হচ্ছে ঐশ্বরিক, অর্থাৎ কিংবদন্তীর উৎপত্তি ঈশ্বরের সময়হীনতার সঙ্গে মানবের সঙ্ক্ষিপ্ত-এলিয়ট কথিত “point of Intersection of the timeless/with time”। আদি ধর্মগুলোতে ঈশ্বরের প্রকাশ বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পরিচয়ে -সুন্দর, ভয়াল, ভয়ঙ্কর, প্রীতিময়, সর্বরূপে। এইসব প্রকাশের বিচিত্র অনুভূতিগুলো বিভিন্ন চেতনায় বিভিন্নভাবে দোলা দিয়েছে এবং তাকে ধরে রাখা হয়েছে বহুবিধ উপায়ে। কিংবদন্তীর বিভিন্ন নির্মাণ বহুলাংশে ঈশ্বরের বিবিধ প্রকাশের এক একটি বাহন। একজন সমালোচকের মতেঃ

কিংবদন্তী কোন সহজ আবিষ্কৃত বস্তু নয়, যা শুধু ইতিহাসের প্রবাহে পূর্ণতাপ্রাপ্ত অনুভূতি বা বিশ্বাসের একটি বিশেষ মাধ্যম, বা মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার হাতিয়ার। শেলিং এর চূড়ান্ত আদর্শবাদের দর্শন অনুযায়ী কিংবদন্তীর প্রক্রিয়া বস্তুতঃ একটি ঐশ্বরিক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায়

ঈশ্বর বা Absolute নিজেকে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনায় প্রকাশ করেন... Absolute এর আত্মপ্রকাশের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় হচ্ছে কিংবদন্তী।<sup>১</sup>

অন্যত্র, এই সমালোচক লিখেছেন, “নৈতিক নীতি অনুযায়ী কিংবদন্তী একটি নিজস্ব জগত সৃষ্টি করে যার সর্বত্র প্রকাশিত ঈশ্বরের পরিব্যাপ্ত নিয়মসমূহ এবং চরিত্রগত প্রয়োজনীয়তা। কিংবদন্তীর নৈব্যক্তিকতা আসে এর নৈতিক নির্মাণ থেকে যে নির্মাণ সুনির্দিষ্ট এবং প্রয়োজনীয়।”<sup>২</sup> কিংবদন্তীর ব্যবহার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এ.এম. হকার্ট লিখেছেন, “কিংবদন্তী মানুষকে পাইয়ে দেয়, অথবা পেতে সাহায্য করে তার কামনার প্রধান বস্তুটি -জীবন।”<sup>৩</sup> কিংবদন্তীর আরেক গবেষক, বি. মলিনোস্কি তাঁর ‘আদি মনস্তত্ত্বে কিংবদন্তী’ গ্রন্থে লিখেছেন : “আদিম সংস্কৃতিতে কিংবদন্তী একটি অপরিহার্য কাজ সম্পাদন করে; বিশ্বাসকে সে প্রকাশ, বৃদ্ধি এবং রূপবদ্ধ করে, নৈতিকতাকে টিকিয়ে রাখে এবং প্রয়োগ করে। এর কাজ হ’ল দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় রীতিনীতির জোপান দেয়া।”<sup>৪</sup>

এসব আলোচনা থেকে যে প্রধান সূত্রগুলো গ্রহীত করা যায়, সেগুলো হচ্ছে কিংবদন্তীর বিস্তৃত নৈতিক এবং নান্দনিক তাৎপর্য এবং এর আধ্যাত্মিক উৎপত্তি। এ দুই সূত্র ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যে কিংবদন্তীর ব্যবহারকে সমৃদ্ধ করেছে, পূর্ণতা দিয়েছে। কিংবদন্তীর সঙ্গে রূপকথার একটি প্রয়োজনীয় সীমারেখা টানতে হয় এখানে। রূপকথা নিছকই অলীক, এর বাস্তব বা ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। মানুষের মনোলোক ও কল্পনার প্রকাশই এর একমাত্র উৎসভূমি। বাস্তব-জীবনের কিছু ছায়াপাত যদি সেখানে হয়, সে শুধু অনুষ্ঙ্গ মাত্র। রূপ কথার সারাংশার কল্পনা উদ্ভূত, কল্পনা-বাহিত। অন্যদিকে, কিংবদন্তীর উৎস ইতিহাসের পিছনে প্রাক-ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন ভূমিতে, তারই অস্পষ্ট ছায়ায়। কিন্তু কখনও কখনও ইতিহাসের কোন ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব তার আলোকিত কক্ষচ্যুত হয়ে উদ্ধাপিণ্ডের মত কিংবদন্তীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং এর ছায়াঙ্গনে রহস্যমণ্ডিত হ’য়ে প্রোথিত হ’য়ে থাকে।

কিংবদন্তীর উৎস ও ব্যবহারের যথাক্রমে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা বিভিন্ন সময়ে কমবেশী গুরুত্বে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রীক সাহিত্যে এ উভয়ই বিধিত হয়েছে, শেক্সপীয়ারে প্রাধান্য পেয়েছে নৈতিকতা (এই নৈতিকতা কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা ধর্মীয় অনুশাসন নয়, এ জীবন ধর্মের কিছু গুঢ় এবং একান্ত উচ্চারণের সহজাত সন্নিবেশ)। রোমান্টিক যুগে যখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তিরোহিত হয়েছে কল্পনাকে শৃঙ্খলিত করার অভিযোগ শিরোধার্য করে, সেখানে আধ্যাত্মিকতা সেই আদিম ঈশ্বরানুভূতির তুল্য। ঈশ্বর প্রকাশ পেয়েছেন বিভিন্ন রূপে; উইলিয়াম রেকের মত

শিল্পীর হাতে সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যক্তিগত অনুধাবনেও। নৈতিকতায় শেফালীর মানবনিষ্ঠ নীতিধর্মের উৎকর্ষিত বহিঃপ্রকাশ। তাই রোমান্টিক যুগে পৌরাণিক ও কিংবদন্তীয় কাহিনী ও ব্যক্তি সমাবেশের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। রোমান্টিক মনের সহজাত সৌন্দর্য-বোধে ও সৌকুমার্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস সত্য ও মানবনিষ্ঠ জীবন-দৃষ্টি, পৌরাণিক চেতনাবোধ, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, সবই সঞ্জীবিত হয়েছে, মূর্ত এবং অর্থবহ হয়েছে। প্রথাগত পৌরাণিক কাহিনী, অর্থাৎ যে কিংবদন্তী ঐতিহ্য হিসাবে দীর্ঘদিন লালিত হয়ে এসেছে, তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে ব্লেকের মত উদ্ভাবনা শক্তির অধিকারী কবির নিজস্ব কিংবদন্তী সৃষ্টি। কিন্তু ব্লেক রোমান্টিক চরিত্রের বাইরে পা রাখেননি। তাঁর বিখ্যাত চিত্র ‘দি এ্যানশেন্ট অব ডোজ’-এ বৃদ্ধ ঈশ্বর শক্তিরূপে বজ্রের মাধ্যমে সৃষ্টির ভিতর যখন প্রাণ সঞ্চর করেছেন, তখন এই ব্যক্তিগত কিংবদন্তীতে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রথাগত রোমান্টিক শক্তি উপাসনা, শক্তির রূপ অন্বেষী রোমান্টিক কবির আকাজ্জ্বার তীব্র উচ্চারণ। রোমান্টিক মন ও মননের একজন কবি কিংবদন্তীতে তাঁর চিন্তা চেতনার মহা বিস্তৃত জগতের এক সুন্দর এবং সশরীর উপস্থিতি দেখতে পান। একটি প্রতীকের যতখানি সামর্থ আছে কবির মনোগত বোধ ও আবেগ, তার উপলব্ধির এবং সৃষ্টির তাগিদকে ধরে রাখার, তার থেকে অনেক তীব্রতায় এবং বলিষ্ঠতায় ধরে রাখে কিংবদন্তী। একটি প্রতীক থেকে অনেক দীর্ঘায়িত প্রেক্ষাপটে স্থাপিত বলে কিংবদন্তীর আবেদন সামগ্রিক। ফররুখ আহমদের কবিতায় কিংবদন্তী তাঁর অন্তর্নিহিত রোমান্টিকতা থেকেই উদ্ভূত। তিনি তাঁর কাব্যে কিংবদন্তীর ব্যবহার করেছেন বলে তিনি রোমান্টিক, তা নয়; বরং তিনি রোমান্টিক ছিলেন বলেই কিংবদন্তীর এমন বিচিত্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার তাঁর কবিতায়। ফররুখের রোমান্টিকতার উপাদানসমূহও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইন্দ্রিয়বাদী ও মরমীয়াবাদী উভয় শ্রেণীর রোমান্টিকতার। তাঁর ইন্দ্রিয়ঘনত্ব, অতিন্দ্রীয় লোকের প্রতি দূর্বীর আগ্রহ, সৌন্দর্যচেতনা, অস্থিরতা, নিসর্গ-নির্ভরতা, পৌরাণিকতা বীরবাহু নায়কের আবাহন ও স্তুতিগান, শুদ্ধ শিল্পবিন্যাস, প্রতীক/ উপমা/রূপক ব্যবহার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে সংযোগ প্রবল, রোমান্টিকতা শুধু যে ইংরেজী কাব্যধারার একটি বিশেষ কালের একান্ত অধিকার, তা নয়। বাংলা ভাষায়, বিশেষ করে মাইকেল, সত্যেন্দ্রনাথ থেকে নজরুল সবাই কমবেশী রোমান্টিকতায় আবিষ্ট। তবে ইংল্যান্ডে একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ শ্রেণীর কবির মধ্যে এই আন্দোলনটি স্বাভাবিক এবং বৈশিষ্ট্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আবার দেখা যায়, ঐ কালের একজন কবির সমগ্র সৃষ্টিতে প্রধান শক্তি সঞ্চর করেছে এই ধারাটি এবং তার সমগ্র সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি মিশে আছে এর উপাদানসমূহ। ফলে,

একজন রোমান্টিক কবি বলতে সাধারণতঃ যত সহজে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস বা শেলীকে বুঝায়, তত সহজে মাইকেলকে বোঝায় না।

ফররুখ আহমদের কবিতায় কিংবদন্তীর ধারা এই রোমান্টিক মেজাজের হলেও এর প্রবাহ ছুঁয়ে এসেছে পুঁথি সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভূমি। পুঁথি সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চিন্তা ও আঙ্গিকগত সারল্য এবং এর অন্তর্নিহিত দীর্ঘমেয়াদী আবেদন। এখানে কিংবদন্তীর নৈতিকতা মানবনিষ্ঠ ও ধর্মীয় উভয় অনুশাসনের একটি সমন্বয়। কারণ ধর্মীয় অনুশাসনের বিভিন্ন দিক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে মানবিক হৃদয়বোধের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই নৈতিকতার জগৎ নেহাৎই সাদা কালো। এখানে বুদ্ধিগত জটিলতা বা ব্যাখ্যাগত ধূসরতার কোন স্থান নেই। সাধারণ বুদ্ধির মানুষের মুহূর্তের অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়েছে পুঁথি সাহিত্যে, তাই জটিলতা পরিহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ঐতিহ্যগতভাবে পুঁথি সাহিত্যে অতিমাত্রায় কল্পনানির্ভর বলে কিংবদন্তীয় আধ্যাত্মিকতা এখানে অনুপস্থিত বহুলাংশে। সে স্থলে এসেছে রূপকথার বিভিন্ন প্রেক্ষাপট। আবেদনের মাত্রাকে তীক্ষ্ণায়িত করার জন্য সেখানে কল্পনাকে দেয়া হয়েছে অতিরিক্ত স্বাধীনতা। ফররুখ আহমদের কিংবদন্তীয় এই দুই ধারায়- রোমান্টিকতা ও পুঁথি সাহিত্যের-অপূর্ব মিশ্রণ চোখে পড়ে। একদিকে তাঁর কিংবদন্তীতে আছে পৌরাণিক সময়গত ব্যবধান, আছে মানবনিষ্ঠ নৈতিকতা আর আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন প্রতিফলন, অন্যদিকে আছে পুঁথি সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনের বিভিন্ন দিক এবং রূপকথার মুক্ত কল্পনা। ‘সিরাজাম মুনিরা’ কাব্যগ্রন্থের রোমান্টিকতা এসেছে চরিত্রের মহত্ব সৃষ্টিতে, মহৎ ও বৃহত্তর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বে এবং নিসর্গ বর্ণনায়। কিন্তু এই রোমান্টিকতা স্বকীয় চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও কিছুটা নিস্প্রাণ। তুলনায় হাতেম তা’য়ীর রোমান্টিকতা উদ্দাম এবং গতিশীল। দু’টি গ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণঃ

১. কী বিচিত্র জৌলুসে রাঙে নিখর রাত্রিতল

জমাট পাথর জুলমাত ছিড়ে জাগে শিখা প্রোজ্জ্বল।

নতুন পথের মুবারক-বাদে আগ্নেয় বোররাক

সাত সাহারার সাইমুমে শোনে খোর্মী বীথির ডাক,

লাখে সিতারার মাঝে সে উজালা প্রদীপ্ত রোশ্নিতে;

উমর স্মৃতির আতশী বেদনা মখলুকাতির ভিতে।

(উমর-দরাজ দিল, ‘সি-মু’)

২. কিন্তু ঘুম ভেঙে যায় অকস্মাৎ, হারিয়ে পলকে  
সমস্ত অলীক স্বপ্ন মৃত্যু-তিক্ত কিম্বা মৃত্যু কালো  
আদিগন্ত ঘন অন্ধকারে, মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে  
চেতনার তীব্র কশা স্বপ্নলোক থেকে, মনে পড়ে  
দৃষ্টিহার্য পরিত্যক্ত আছি মরু মাঠে, মনে পড়ে  
আমি অন্ধ, আমি অন্ধ, আমি অন্ধ; -বন্দী এ জিন্দানে।  
(হাতেম তা'য়ীর প্রতি পিঞ্জরের  
অন্ধ কয়েদী, 'হা, তা' )

৩. এই সংগ্রাম দিন রাত্রির তীরে  
চলে অবিরাম সারা মন ঘিরে ঘিরে।  
প্রতি মুহূর্তে স্থাপদ তুলিছে ফণা  
হানি পরাজয়ী বিষাক্ত যন্ত্রণা,  
ক্রুর হীনতার পিছল পথে সে  
বিষাইছে রাত্রিরে ॥

( এই সংগ্রাম, 'সি, মু' )

তিনটি কাব্যংশেই রাত্রি এবং আরও বিশেষ অর্থে অন্ধকারের, প্রতিপক্ষ রূপকে চিত্রায়িত করা হয়েছে আলো-অন্ধকারের প্রতীকী সংগ্রামে। রাত্রির বর্ণনায়, যা ফররুখের কবিতা অসংখ্য, শুভ-অশুভের, সুব-অসুরের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আদি রোমান্টিকতার একটি বৈশিষ্ট্য এই দ্বন্দ্ব এবং পৃথিবী সম্পর্কে রোমান্টিক কবির দ্বন্দ্বিক চিন্তার এটি একটি বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ১ সংখ্যক বর্ণনার অ-রোমান্টিক সুলভ মেকীত্ব এসেছে প্রধানতঃ প্রচুর আরবী, ফারসী ব্যবহারে। 'জুলমত' 'মুবারক-বাদে' 'সিতারা' 'রোশনী' 'মখলু- কাত' ইত্যাদি শব্দের এমন কোন ছন্দময়তা বা গীতলতা নেই যার ফলে ছন্দগতভাবে তাদের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত করা যায়। এ নিছক কবির সচেতন 'ইসলামী' মানসিকতার একটি অপ্রয়োজনীয় দিক। কয়েকটি নির্মাণ এ কারণে রীতিমত শ্রুতিকটু যেমন "উজালা প্রদীপ্ত রোশনী"। আরবী-সংস্কৃত - বাংলা- ফার্সীর জগা-খিচুড়ির তুলনীয় কিছু অতিমাত্রায় হেলেনিক বা গ্রীস ও রোমমুখী বহুভাষাবিদ কোন রোমান্টিক কবির সৃষ্টিতে কোথাও দেখা যাবে না। ২ সংখ্যক বর্ণনায় আরবী-ফার্সীর দাগট কিছুটা কম; কারণ এখানে কবি লিখেছেন এক ধরনের স্বাধীনতা নিয়ে যা ঐতিহাসিক ও জীবনভিত্তিক বর্ণনায় পাওয়া দুষ্কর, বিশেষ করে যে চরিত্রের সামান্যতম বিকৃতিধর্মী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। এখানে চরিত্রসমূহ

কাল্পনিক। হাতেমের আধা প্রাক-ঐতিহাসিক, আধা পৌরাণিক চরিত্রের ক্ষেত্রেও কল্পনাপ্রধান নির্মাণ উপকরণ। বস্তুত এরূপ চরিত্রেই ফররুখ আহমদের সর্বাপেক্ষা বেশী পক্ষপাতিত্ব। অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর “কবি ফররুখ আহমদ” গ্রন্থে ‘নৌফেল ও হাতেম’-এর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে ঐ গ্রন্থে “প্রধান চরিত্রগুলোর মুখ দিয়ে কবি প্রায়শই আপন মনোগত আদর্শ, ধর্মবোধ ও নৈতিক ভাবনা প্রচারণের প্রয়াস পেয়েছেন। তাতে করে চরিত্রগুলো সজীব রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে প্রায়শঃই ভাবের বাহন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছে।”<sup>৫</sup>

কল্পনার রং জড়ানোর যথেষ্ট স্বাধীনতা যে সব চরিত্রের বেলায়, তাদের কবি নিজস্ব সৃষ্টির বিশাল ক্যানভাসে যেমন খুশী বসাতে পারেন, যে কোন আলোকে দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা রঙের উন্মোচনে। তারা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাদের অন্তর্নিহিত ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ ইত্যাদির পরস্পরবিরোধী কর্মকাণ্ডে। এই দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ, আবার দীর্ঘ কাহিনীর বিভিন্ন খণ্ডঘটনার মধ্যবর্তী যোগসূত্র। ভাই ‘নৌফেল ও হাতেম’ ও ‘হাতেম তা’য়ী’তে যে দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা যতই দুর্বল বা লুক্কায়িত হোক না কেন, সেই দ্বন্দ্ব আদর্শ ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে দেখা যায়না। এ প্রসঙ্গে ‘নৌফেল ও হাতেম’ সম্পর্কিত আলোচনায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য রেখেছেন, তা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। তিনি লিখেছেন “নৌফেল ও হাতেম’-এর দ্বন্দ্বিক জীবন কাহিনীর রূপক আধারে কবি মূলত আপনার একটি মনোগত আদর্শকেই উজ্জ্বল রূপে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। কবির লক্ষ্য ঐ আদর্শটি, (তার ভিত্তিভূমি) আবর্তসংকুল মানব-জীবন নয়। ঐ আদর্শেই দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে, কবি জীবনের দ্বন্দ্বিক রূপ ফুটিয়ে তোলার সুযোগটি হাতের কাছে পেয়েও কাজে লাগাতে পারেন নি।”<sup>৬</sup>

এই মতামতটি যথার্থ বলে গ্রহণযোগ্য তখন, যখন আমাদের বিবেচ্য কাহিনী নির্ভর ও ঘটনাসঙ্কুল নাটক। কিন্তু কাব্য নাট্যে প্রথমতঃ কাহিনী সবসময় মুখ্য নয়, যেমন কবিতার প্রধান উপজীব্য নয় কাহিনী। তাই কবিতায় বা কবিতা নির্ভর নাটকে সাধারণ গদ্য কাহিনীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত সরাসরি উপস্থিত হতে পারে না, হয় রূপকের মাধ্যমে, প্রতীকের মাধ্যমে, ভাবাদর্শের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। প্রতীকী নাটকে, যেমন আইরিশ কবি ইয়েটসের রচনায় বা জাপানের ‘নো’ নাটকে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কাহিনী নির্ভর নয়, বরং ভাব ও প্রতীকী নির্ভর। ‘না’ নাটকের প্রেক্ষাপট পৌরাণিক; এবং সেখানে মুখের সঙ্গে মুখোশের বিবাদে, সাদার সঙ্গে কালোর প্রতীকী দ্বন্দ্বই নাটকের মূল সংঘাত। ইয়েটসের নাটকেও, বোধ করি তার সব



ক'টি পৌরাণিক কাহিনী আর কিংবদন্তীর শরীর নির্ভর বলেই, দ্বন্দ্ব আসছে প্রতীকীভাবে: কবির ভাবমূর্তির সঙ্গে প্রতিমূর্তির, দিনের সঙ্গে রাতের, একের সঙ্গে বহুর কলহে। ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' এমনি একটি অতীত নির্ভর জীবন চিত্র, যার পৌরাণিক কাহিনীতে একটি চরিত্রের শুভ্রতার পাশে আরেকটি চরিত্রের অশুচি প্রতীকীভাবে সেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যা নাটকের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। 'নৌফেল ও হাতেম'কে যদি আমরা কিংবদন্তীর প্রেক্ষিতে ব্যবচ্ছেদ করি, দেখব তার মূল সূর এক বৃহৎ দ্বন্দ্বের। হাতেমের চরিত্রের যে দীর্ঘ ছায়াপথ অন্যান্য চরিত্রের বেড়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় এবং যে ছায়াপথে ফররুখের আদর্শের সবগুলি আচরণ বিধিত, হয়তো তা আপাত দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বকে আড়াল করে। কিন্তু দ্বন্দ্ব আছে: ঐ আড়ালটুকু সামান্য সরালেই তার দেখা মেলে।

বস্ত্তত: কিংবদন্তী নির্ভর (রূপকথা ভিত্তিক নয়) কাহিনী বর্ণনায় দ্বন্দ্বের উপস্থিতি- ফররুখের মত অন্যভাষার কোন কবির বা বাংলা পুঁথি সাহিত্যিকদের আদৌ বিরল নয়। কিংবদন্তীয় সাহিত্যের অন্যতম পরিচয় হচ্ছে এর উচ্চাশা-প্রতিপদে চরিত্র, কাহিনী, উদ্দেশ্য, অভিলেখ সকল অনুষঙ্গের বেড়ে ওঠার বাসনা। একটি চরিত্র শুধু চরিত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, একটি ঘটনা থাকে না ঘটনার পরিসরে বন্দী। তারা জীবন অপেক্ষা বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তারা প্রতীক হিসাবে নিজস্ব বৃত্তের বাইরেও অনেক কিছুর প্রতিভূ। সাদা চরিত্র সেখানে হয় শুচি-শুভ্র, চোখ ঝলসানো; কালো চরিত্র কদর্ষ-কদাকার, গা শিউরে ওঠার মত। এই দুই বিপরীত মেরু অভিমুখে যাত্রার যে আয়োজন এবং তার যে বেগ, তাইতো দ্বন্দ্ব হিসাবে যথেষ্ট। আবার যদি একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে কিংবদন্তীর বিকাশ, তবে তার ক্রমশঃ দীর্ঘ হয়ে ওঠা দেহ প্রয়োজনবোধেই নতুন মাপজোকের বিচার দাবী করবে। পাঠক-শ্রোতার এই ক্রম-সম্প্রসারিত চেতনার গতিশীল-তাই এক ধরনের দ্বন্দ্ব।

তবে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যে আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন তা যদি মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়, তবে চরিত্রের সকল পূর্ণতা সত্ত্বেও নাটকে বা কাহিনীতে আসবে এক ধরনের শ্লথবদ্ধতা, যা আমরা নৌফেল ও হাতেম'-এর বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই। ইয়েটস-এর কাব্যনাটকে আদর্শের প্রসঙ্গ যে নেই, তা' নয়। তার সংস্কৃতি, ব্যক্তি আর জাতীয় মানসের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, রূপক-প্রতীক চিত্রকল্পের অখণ্ডতা রক্ষা আর হৃদয়ধর্ম প্রচারের স্বঘোষিত সংগ্রাম আদর্শভিত্তিক অবশ্যই। তবে তাঁর নাটকে, বিশেষ করে অতিমাত্রায় পৌরাণিক ও কিংবদন্তী ভিত্তিক কুহলান নাট্যচক্র বা ক্যাথলীন, উয়েশীন ও অন্যান্য আইরিশ কিংবদন্তীয় চরিত্রসমূহ নিয়ে নির্মিত নাটকসমূহে এই আদর্শবোধ মূখ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা কোন দৃশ্যমান

অনুষঙ্গও নয়- এই অর্থে যে নাট্যরচনার কোন আলাদা বা বহিরারোপিত দিক নয় তো। বরং তাঁর সমস্ত নাট্যরচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এসব উদ্দেশ্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে। নাটকের সচেতন বা অবচেতন কেন্দ্রে এদের বসবাস। তুলনায় ফররুখ আহমদ সচেতন বা সচেষ্ট ভাবে আদর্শবাদী। হাতেমের চরিত্রে অতিমানবীয় গুণাবলী আরোপ করেই তিনি সম্ভ্রষ্ট নন, তাঁকে সর্বকালের সর্বযুগের একক প্রতিভূ হিসাবে স্থাপন করতে চেয়েছেন। প্রতীকের যে অঞ্চল তা ইয়েটসের নাটকে দেখা যায়, তা ফররুখ আহমদে নেই। পরিবর্তে আছে এক ধরণের ঋণকরণ প্রচেষ্টা। ও সংখ্যক উদ্ধৃতিটি তুলিয়ে দেখলে চোখে পড়বে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য-আরোপিত ভাষার শৃংখল থেকে এর মুক্তি। যে সংগ্রামের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা অত্যন্ত সমসাময়িক, অথচ তা অতীতেরও; অর্থাৎ এই সংগ্রাম অনন্তের। রাত্রি এখানে অশুভের একটি উপসর্গ বলে দিনকে তিনি অত্যন্ত প্রথাগত ভাবে এর বিপক্ষে স্থাপন করেছেন। “এই সংগ্রাম দিন রাত্রির তীরে” এবং দিন রাত্রির ভিতর। তুলনীয় ‘সিরাজাম মুনিরা’র আরেকটি কবিতা, ‘গাওসুল আজম’:

তিমির-পঙ্খীর দেশে, প্রবৃত্তি-বিজিত মৃত দেশে  
 এনে দাও সুপ্রবল প্রাণ বহি জীলান সূর্যের,  
 সত্যের আলোক শিখা এ মৃত কলুষ রাত্রি শেষে  
 আবার জাগায়ে যাও .....

এখানে archetypal সংগ্রাম দিন ও রাত্রির, শুচি ও অশুচির। ঐতিহাসিক এই সর্বগুণে গুণান্বিত চরিত্রে অন্তর্গত কোন দ্বন্দ্ব না থাকায় তিনি গাওসুল আজমকে সত্য এবং শুভের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন, যেমন দেখেছেন রৌদ্রদীপ্ত দিনকে। এ দুই প্রতীকী ক্রিয়ায় প্রতিস্থাপন করেছেন পরস্পরের পাশাপাশি এবং রাত্রির বিপক্ষে। এই দ্বিবিধ প্রতীকী ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় দ্বন্দ্বিক কাঠামো তৈরী হয়েছে। কিন্তু এ কবিতায় তিনি “এই সংগ্রাম”-এর মতোই, অকপট। ভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প সর্বক্ষেত্রে এই সত্যতার জন্য কবিতাটির আবেদন দীর্ঘ মেয়াদী।

রোমান্টিক কবির পক্ষে সহজাত অপর যে কাজ তা হচ্ছে নিসর্গ চিত্রায়ন। নিসর্গের ভিতর দিয়ে শুধু প্রকৃতির হৃদয়ের কাছাকাছিই পৌঁছানো যায় না, সৃষ্টিকর্তাকেও উপলব্ধি করা যায়। প্রাচীন গ্রীক ধর্ম বা সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে রোমান্টিক যুগের কবিদের অনেকেই নিসর্গের ভিতর ঈশ্বরের আত্মার সন্ধান করেছেন। যাঁরা আধা-ধর্মীয় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গটি এড়িয়ে চলতে চান, যেমন প্রথম পর্যায়ের ইয়েটস, তাদের কাছে হৃদয়ের মানস প্রতিমা বা অন্তত নিজের আত্মার প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে নিসর্গের আরশিতে। বাংলা কাব্যে যারা প্রবল ভাবে নিসর্গ প্রেমিক, যেমন

জীবনানন্দ দাশ, তাঁদের নিসর্গ বর্ণনায় ঈশ্বর না এলেও এসেছে এক দূরগত অস্তিত্বের অশরীরী উপস্থিতি, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কিন্তু যা নিসর্গের শরীরের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। অতীন্দ্রিয়বাদ বললে এর সবটা ব্যাখ্যা হয় না। ফররুখের কবিতায় এই নিসর্গ এসেছে প্রধানতঃ বর্ণনার অনুষ্ণে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ভাববোধের কারণে। নিসর্গকে তিনি চিত্রকল্প, রূপক রচনার ভূমি হিসাবে দেখেছেন, আবার তাঁর ভাবাদর্শের বর্ণনায় প্রতীক হিসাবেও চেয়েছেন। কিন্তু আলোচনায় দেখা যাবে প্রথমতঃ কিংবদন্তী নির্ভর অন্যান্য কবিদের বর্ণনার মত ফররুখের বর্ণনাতেও নিসর্গ প্রধানত প্রতীকী। দ্বিতীয়তঃ ওয়ার্ডসওয়াথের বা “There hath passed away a glory from the earth” জীবনানন্দের :

বহু-বহু দিন আগে; -যেইখানে শংখমালা কাঁথা বুনিয়াছে  
সে কত শতাব্দী আগে মাছরাঙা- ঝিলমিলঃ - কড়ি খেলা ঘর ;  
কোন যেন কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর ;

( কোথাও মাঠের কাছে ; রূপসী বাংলা)

এই চিন্তার মত ফররুখের কবিতায়ও নিসর্গের নেই পৌরাণিক যুগের সুস্থতা আর সম্পূর্ণতা। মানুষের পতন স্বলন আর পাপের সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গের পটপরিবর্তন হচ্ছে। নিসর্গ অপরিবর্তিত অবশ্যই, কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগের এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির। এ কারণে কিংবদন্তীমূলক ‘নৌফেল ও হাতেম’ ও হাতেম তা’য়ী’র যে নৈসর্গিক বর্ণনা আছে, তা বিষয়বস্তুর ওঠা নামার সঙ্গে সমান্তরাল। হাতেমের দৃষ্টিতে পৃথিবী প্রসারিত, সুসমা মণ্ডিত ; যদিও অন্ধকারকে তিনি অস্বীকার করেন না :

দেখেছি প্রান্তর প্রসারিত

মরুমাঠ, বিয়াবান, জনপদ দেখেছি অনেক

(নৌ.হা. ২,২)

অথবা ‘হাতেম তা’য়ী’র পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদীর বর্ণনায়

দেখেছি সৌন্দর্য যত ... ফুল, পাখী, অরণ্য, প্রান্তর,

শিশির, সমুদ্র, নদী, দেখি স্বপ্নলোকে।

তুলনায় নৌফেলের মুখে নিসর্গ বর্ণনা ‘আজদাহা’ তুল্যা সুবিশাল অন্ধকারের বিবরণীতে সীমাবদ্ধ। ফররুখ আহমদ যে ভাবাদর্শ সমুন্নত রাখতে চান উভয় গ্রন্থে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায়, হাতেমের চরিত্রের ক্রমসম্প্রসারণতা এবং নৌফেলের প্রাথমিক সঙ্কীর্ণতার জন্য দৃষ্টি যথাক্রমে বাইরের নিঃসীম দূরত্বে এবং হৃদয়ের আবদ্ধ অন্ধকারে প্রোথিত। কাজেই নিসর্গ বর্ণনায় এসেছে যথাক্রমে প্রাচুর্য যেহেতু

বাইরের দৃষ্টি হারিয়েছে, তার হৃদয়ের দৃষ্টি হয়েছে? জাগ্রত, এবং পরিধি দৈহিক দৃষ্টির চাইতেও বহুব্যাপ্ত। ফলে শিশির, বর্ণা, সমুদ্র, পাহাড় অতি সহজেই একই বর্ণনায় সংযুক্ত হয়েছে :

এই সূক্ষ্ম বিচার বোধ অন্যত্রও আছে। যেমন ‘বিচ্ছিন্ন দেশে হাতেম তা’য়ী’ শুরু হয়েছে এই বর্ণনায় এভাবে:

যখন দুর্গম পথ পার হ’য়ে দাঁড়ালো হাতেম  
অজানা শহর-প্রান্তে- মিশে গেছে তখন আঁধারে  
আফতাব।

বিচ্ছিন্ন দেশ অজানা দেশ জ্ঞানের বাইরের। তাই তা অশুভ। এদেশে প্রাণ নেই, “পায় না সে দরিয়ার ঢেউ, পায় না প্রাণের সাড়া।” এই নিশ্চাপ অজানা ভূগোল প্রথম দৃষ্টিতেই তাই অন্ধকারের।

এই নিসর্গ চেতনা কিংবদন্তী নির্ভর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য, তবে নিসর্গভিত্তিক অনেক (অ-কিংবদন্তীয়, এমনকি আধুনিক) কবিতাতেই তা দেখা যাবে। ইয়েটসের The Shadowy waters এ প্রধান চরিত্র ফরগ্যাল তাঁর সমুদ্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে যেমন প্রতীকীভাবে বর্ণনা করেছেন, তেমনি তাঁর মাঝি-মাল্লার ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হয়েছে বিপরীত উচ্চারণে, সিন্দাবাদ কিংবদন্তীর তুলনীয় ইউলিসিস কাহিনীর সঙ্গে, যার সুন্দর একটি রূপ পাওয়া যায় টেনিসনে ইউলিসিস কবিতায়। ‘দরিয়ায় শেষ রাত্রি’র সিন্দাবাদ বলছে :

হীরা জওহর ফুটেছিল কত দরিয়ার নীল ছাঁচে  
সফরের মায়া টানছে আমাকে দূর হতে আরো দূরে  
পাশাপাশি ইউলিসিসের :

The lights begin to twinkle from the rocks  
The long day wanes; The slow moon climbs; the deep  
Moans round With many Voices .

তার অবশিষ্ট To sail beyond the sunset. উভয় ক্ষেত্রেই নিসর্গ বর্ণনায় কিছু কিছু উপকরণ অভিন্ন : যেমন সমুদ্রের আলো-আঁধারির হাতছানি, ক্লাস্তি আর অবসাদের ভিতর দিয়ে ইচ্ছার দূরন্ত প্রকাশ, নীল কালো রাত, চাঁদ, জ্যোৎস্না, কুয়াশা। কিংবদন্তীর পুরুষেরা বাধাকে হেয় করে, ভয়কে পরাস্ত করে, সাধারণের চিন্তার জগতের বাইরে এদের বিচরণ। এদের আচার আচরণ পরিষ্কার দিবালোকে বিশেষণ করা যায় না ; গোধুলির আলো-অন্ধকারে, রাত্রির তিমির জ্যোৎস্নার রহস্যলোকে এদের আংশিক উন্মোচন। ইয়েটসের ফরগ্যাল, টেনিসনের ইউলিসিস,

ফররুখের সিন্দাবাদ তিনি কিংবদন্তীর নায়ক রাত্রি আর সমুদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ।  
অর্থাৎ বিশালতা, ব্যাপ্তি আর অজানার জগতে তাদের বিচরণ ।

৩.

প্রতীকের মত কিংবদন্তীর দুই উৎস- প্রথাসিদ্ধতায় এবং ব্যক্তি মানসে । কবি প্রতীক বা কিংবদন্তী ধার করেন তাঁর ঐতিহ্য থেকে ; তার পূর্বসুরিদের কাছ থেকে অথবা তাঁর সমসাময়িক চিন্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যম রূপে প্রচলিত প্রতীক ধারা থেকে; কিন্তু তিনি প্রয়োজন বোধে প্রতীক নির্মাণ করেন, উদ্ভাবন করেন । তবে এই উদ্ভাবিত প্রতীক খুব কম ক্ষেত্রেই হয় পুরোপুরি নিজস্ব । কবিমানস ছাড়াও কার্ল ইয়ং কথিত Collective unconscious অথবা প্লেটো ও নব্য প্লেটোবাদীদের বিশ্বাস বা world soul যাকেই আমরা প্রতীকের আধার বলে ধরি না কেন, সর্বক্ষেত্রেই অধিকাংশ প্রতীকের কিছু কিছু অনুষঙ্গ থাকে যা একেবারেই সর্বলোকের ও সর্বকালের । রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী প্রতীক হিসাবে নতুনত্ব দিলেও আসলে তা মরমী সাহিত্যের একটি পুরানো প্রতীক । কিন্তু এর বিশেষ ব্যবহার, অন্ততঃ ঐ কবিতায় নতুনত্বের না হলেও চমৎকারিত্বের দাবীদার । এই অর্থে কবিদের অনেক নির্মাণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং অপ্রথাগতভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বিরোধীভাবেও হয়ে থাকে, বা তাদের উৎসার সাধারণের চিন্তাজগৎ থেকে হলেও বহিঃপ্রকাশ হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিধিতে । কোন কোন এমন প্রতীক, যেমন ইয়েটসের মিনার বা জীবনানন্দের হাইটড্রান্ট, এই ব্যক্তিক গভীর বিচারের বাইরে মোটেই অর্থবহ হবে না । তেমনি কিংবদন্তীর কোন কোন কাহিনী বা চরিত্র লেখক/কবির নিজস্ব প্রয়োজনে একান্ত ব্যক্তিগত বা কালগত হয়ে দাঁড়ায় । এসব নিম্নাঙ্গের ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিসীমার বা কালসীমার বাইরে কোন অর্থ থাকবে না । যারা কিংবদন্তী নির্ভর, তাঁদের কবিতায় প্রায়ই কিংবদন্তীর নতুন প্রকাশ বা উপস্থাপনা চোখে পড়ে যা ভিন্নার্থক এবং স্থানবিশেষে উপযোগী বা অনুপযোগী আমাদের কালের কিংবদন্তী প্রায়শই ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত উচ্চারণের পিছনে শক্তি যোগানোর জন্য । পাশ্চাত্যের জনৈক সমালোচকের মতেঃ

বিজ্ঞাপন পূর্ব সংস্কৃতিগুলোতে জীববাদী (animistic) কিংবদন্তী এবং যাদুকরি আচরণসমূহের প্রাধান্য দেখা যায় । আমাদের অসাম্প্রদায়িক এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি সমূহে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতিবাদী সামাজিক কিংবদন্তী, যাতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চিন্তা প্রতিফলিত হয় এবং যা প্রচারের প্রয়োজনে নিছক মিথ্যাভাষণের সাহায্য নেয় ।”<sup>৭</sup>

ফররুখের কবিতায়, বিশেষ করে হাতেম কেন্দ্রিক দুটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে এ কথাগুলি প্রযোজ্য । কারণ আমরা দেখেছি কবি দু’ধরনের কিংবদন্তী, পৌরাণিক এবং

ব্যক্তিগতভাবে সৃষ্ট, ব্যবহার করেছেন। ‘নৌফেল ও হাতেম’ সম্বন্ধে অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে-

এই কাব্যনাট্যে ফররুখ আহমদ স্বপ্নের, আদর্শের ও তত্ত্ব ভাবনার জগৎ থেকে অনেকটাই যেন সমাজকর্মীর বাস্তব ভাবনার জগতে নেমে এসেছেন। .... কিংবদন্তী নির্ভর হাতেম তা'য়ী চরিত্রকে কবি ইসলামী প্রেম, সেবা ও কর্মের মহান আদর্শের মূর্ত প্রতীক রূপে দাঁড় করিয়ে আপন সম্বন্ধপোষিত কবি স্বপ্নটিকে বাস্তবায়নের পথ খুঁজেছেন।

অন্যদিকে ‘হাতেম তা'য়ী’ অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁথি সাহিত্যিক সৈয়দ হামজার ‘হাতেম তা'য়ী’ অবলম্বনে রচিত। এবং এর প্রধান যে দুটি উদ্দেশ্য অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করছেন, “জীবনাদর্শের সূষ্ঠ রূপায়ণ এবং পুঁথির নবরূপায়ণের মাধ্যমে.... ঐতিহ্যের ধারাটির পুনরুজ্জীবন সাধন।”<sup>১</sup> এই উভয় ক্ষেত্রেই একটি অভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। তা হল, ফররুখের কাব্যাদর্শ ও ভাবাদর্শের একটি সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ প্রকাশ। মুসলিম নব জাগরণের যে স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখে এসেছেন, তার একটি পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হাতেমের চরিত্রের মাধ্যমে, এই ছিল মোটামুটি উদ্দেশ্য। কতখানি সফল হয়েছে, তার বিচার অন্যত্র; তবে এর প্রধান বাহন এবং বলা যায় প্রধান অন্তরায়, কিংবদন্তীমূলক কেন্দ্রীয় কাহিনী ও চরিত্র।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিশ্লেষণে ফররুখের কাব্যসাধনার দু'টি উল্লেখযোগ্য সূত্র উন্মোচিত হয়েছে। একটি হল তাঁর ‘সচেষ্টি প্রয়াস’ এবং অন্যটি তাঁর আদর্শচিন্তা। অথবা বলা যায়, আদর্শচিন্তার জন্য সচেষ্টি প্রয়াস। একটি পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্বপরিকল্পিত আয়োজনে এ দু'টি গ্রন্থ নির্মিত হয়েছে যা কবির সহজাত বা স্বভাবসিদ্ধ নয়। কাব্যদ্বয়ে বিরাট সংখ্যক আরবী ফার্সী শব্দ এবং প্রধানতঃ আরব দেশীয় চিত্রকল্প এই পূর্বপরিকল্পনারই সাক্ষ্য দেয়। এসব রূপক ও চিত্রকল্পের তুলনীয় বিচারে সুলক্ষ্য। ‘সিরাজাম মুনিরা’ কাব্যগ্রন্থে, যেখানে আয়োজন বিস্তৃত নয়, উদ্দেশ্যও তেমন প্রবল নয়, উদ্দেশ্যও তেমন প্রবল নয়, সেখানে মেকীত্ব কিন্তু বহুলাংশে অনুপস্থিত। অন্যদিকে হাতেম কেন্দ্রিক গ্রন্থদ্বয়ে মেকীত্ব সর্বব্যাপ্তি। হাতেম তা'য়ীর ধার করা শব্দাবলী পুঁথির প্রচলিত ভাষাগত মিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমার, যদিও পুঁথির সহজাত সারল্য এবং ভাবাবেগ এখানে সঞ্চারিত হয়নি খুব একটা। কিন্তু ‘নৌফেল ও হাতেম’-এ এই মিশ্রণ কাহিনীর নাটকীয় অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বহুলাংশে অপ্রয়োজনীয়। এ দুটি গ্রন্থে একটি বিশেষ তাগিদে বহিরাশ্রিত শব্দধারার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কবি, এবং এটা যে তাঁর আদর্শগত আত্মতৃপ্তি, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই আদর্শগত জয়গান মূখ্য বলে এ দু'টি গ্রন্থে কিংবদন্তীর ব্যবহার এত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি গ্রন্থেই প্রথাগত কিংবদন্তী এসেছে কাহিনী ও চিত্রায়ণের মাধ্যমে। কাহিনী যদিও এক বিশেষ স্থান ও কালের, তবু এর বর্ণনায় এক ধরনের বিশ্বব্যাপিতা এসেছে যার ফলে আলৌকিক তথ্যসমৃদ্ধ হলেও তা সার্বজনীন। হাতেমের চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তাকে অতিমানবীয়তা দান করেছে কিন্তু যে প্রতীকী অর্থে তার চরিত্র একজন 'কামিল ইনসানের' সেই মূল্যবোধের বিশ্লেষণে হাতেম আমাদের ইঙ্গিত বলে আমাদের কালের। এই সার্বজনীনতা কিংবদন্তীর মূল সূত্র। কারণ চরিত্র বা কাহিনী কোন ব্যক্তি বা কাণ্ডবিশেষ নয়। তারা এক একটি আদর্শ এবং type এ পরিণত। ফলে মূল্যবোধের প্রতীক হিসাবে তাদের দেখতে হয়। এই মূল্যবোধের সন্ধান সর্বকালের বলে, এর সব কালই নিজের কাছে ক্রান্তিকাল বলে, ঐসব মূল্যবোধকে সদাজাগ্রত মনে হয় কিংবদন্তীর চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে। সৈয়দ হামজার মতে হাতেম এমনি আদর্শ এক পুরুষঃ

হামজা বলে হাতেম হইলে দীনদার

পরপাশের দর্জা দিত পরওয়ারদিগার।

আর 'নৌফেল ও হাতেম-এর' শায়েরের মতে হাতেম

নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী

হাতেম “শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ইনসানের শ্রেষ্ঠ সে খাদিম,” “অন্যায়ের মুখে আল বোরজের মত শিলাদৃঢ় তার প্রতিরোধ। / তুর পাহাড়ের মত দক্ষ সে আল্লার মুহক্বতে” .... ইত্যাদি। কিংবদন্তীর যেহেতু চরিত্রায়ণের কোন ধূসর এলাকা নেই, তাই চিত্রায়ণে ফররুখ কিংবদন্তীর সাদা কালোর বলিষ্ঠ রেখাকে ব্যবহার করছেন। এই অতিকায় এবং অতি উচ্চ চরিত্রকে মানবিক রূপ দান করা অন্যভাবে সম্ভব হত না। অথবা বলা যায় এই অতিমানবীয়তা কিংবদন্তীর চরিত্র ছাড়া কারও পক্ষে অর্জন বা ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই ফররুখ দ্বারস্থ হয়েছেন কিংবদন্তীর।

প্রথাগত কিংবদন্তী কবিকে এই চরিত্রায়ণ উপহার দিলেও আর কোন উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ হয়নি। যেমন ভাবাদর্শের বর্তমান বা সমসাময়িক প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে কিংবদন্তী স্বাভাবতই নীরব। কিংবদন্তী শুধু আদর্শ বা model দিতে পারে, এর সমসাময়িক মূল্যায়ন বা প্রয়োগ নির্ভর করবে কবির মানসিকতা ও কালীক চিন্তার উপর। এজন্য ফররুখ নিজস্ব কিংবদন্তী তৈরী করছেন। যেমন মুসলিম পুনর্জাগরণের আহ্বান দিতে গিয়ে তিনি বর্তমান সমাজের যে চিত্রটি তুল ধরেছেন, তা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত কিংবদন্তীয় নির্মাণ। 'নৌফেল ও হাতেম'-এর শায়েরের ভাষায় (৫)ঃ

এ মাটিতে,  
হীন স্বার্থে কলঙ্কিত জুলমাতের হিংস্র অঙ্ককারে  
যেখানে দুর্লভ জানি মনুষ্যত্ব, মর্দমী .....

ফররুখের নিজস্ব কালচিন্তারই এ প্রতিফলন। তাঁর কাব্যজীবনের উন্মেষ ঘটে এক ক্রান্তিকালে। এবং তাঁর বামপন্থী বিশ্বাস, দারিদ্রের প্রতি ভালবাসা, অন্যায় অবিচারের প্রতি তাঁর ঘৃণা, এবং বৃহৎ ব্যক্তিত্ব সন্ধানী তাঁর রোমান্টিক মনের প্রভাবে তিনি এমন একটি স্বপ্ন দেখে এসেছেন যেখানে অন্যায় অবিচারের অঙ্ককার তিরোহিত করে বারে বারে উন্মোচিত হয়েছেন একজন পথিকৃৎ পুরুষ। ফলে হাতেমের চরিত্র অচেতন বা সচেতনভাবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। এই চরিত্রের বিজয় তাঁর নিজস্ব আদর্শ চিন্তারই জয়গান। কিংবদন্তীকে এভাবে ব্যক্তিগত সাদা-কালোর পরিধিতে এনে ফররুখ তাঁর সযত্ন লালিত আশাটি পূরণ করেছেন।

৪.

ফররুখের অন্যান্য কিংবদন্তীয় চরিত্র যথা সিন্দাবাদ বা শাহরিয়ারের (যাদের উৎপত্তিস্থল ‘আরব্য রজনী’র কল্পলোকে) পাশে হাতেমের চরিত্র স্থাপন করলে কিংবদন্তীর প্রতি কবির সর্বশেষ আনুগত্যই প্রকাশ পাবে। এই চরিত্রসমূহের দাবী মিটিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, তাদের বিভিন্ন আদর্শের প্রতিভূ হিসাবেও দেখেছেন। হাতেম আদর্শ দাতা, সৎ এবং কর্মী পুরুষ, সিন্দাবাদ আদর্শ নাবিক, উদ্যোগী এবং অভিযাত্রী; শাহরিয়ার প্রথমত উচ্ছৃঙ্খল এবং পাপবদ্ধ, পরে প্রকৃত শ্রেমিক। চরিত্রের প্রতি এই বিশ্বস্ততাই যথেষ্ট নয়; কারণ কিংবদন্তীয় চরিত্র বিকশিত হতে না পারলে তা যত বৃহৎই হোক, তাতে একঘেঁয়েমি আসবে। ফররুখ আহমদ তাই সমান্তরাল কাহিনী বেছে নিয়েছেন- নৌফেল ও হাতেম, শাহরিয়ার ও উজীরজাদীর তুলনামূলক বিবর্তন। উভয়ক্ষেত্রেই মন্দ পরিবর্তিত হয় ভালোয়, অশুভ শুভতে। সিন্দাবাদের চরিত্রের, বিশেষ করে দরিয়ার শেষ রাত্রিতে হাতেম ও উজীর জাদীর তুল্য শক্তি লক্ষ্য করা যায়। কবিতার শুরুতে মাঝি-মাল্লার আবেদন শুধু অগ্রাহ্যই করেনি সে, তাদের দূর সমুদ্র পাড়ি দিতে উদ্বুদ্ধও করেছে, তাদের দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ও অবসাদ সত্ত্বেও। কবিতাটি হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে, সেই মুহূর্তে, যখন সিন্দাবাদ মাল্লাদের আবেদনে রাজী হয়েছে, জাহাজের মুখ বন্দরের দিকে ফেরাতে আদেশ দিয়েছে। এ কোন পরাজয় নয় সিন্দাবাদের জন্য, বরং জয়ই। তার উৎসাহ-উদ্দীপনা মাল্লাদের মধ্যে সংক্রামিত হবার পরই তাঁর এই নতুন সংকল্প। বৃহৎ শক্তি আর আত্মার যারা অধিকারী ফররুখের কিংবদন্তীতে, তারা নির্ধারিত কাজটি সমাপ্ত করে চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী; নৌফেল ও শাহরিয়ার পরিবর্তিত হয়েছে, মাল্লারা



অনুপ্রাণিত হয়েছে, প্রতীকী অর্থে শুভের এবং নৈতিকতার এ এক দীর্ঘসূত্রী বিজয়।

ফররুখের কিংবদন্তী-নির্ভর চরিত্র ও ঘটনাসমূহের এক পর্যায়-ক্রমিক উত্তরণ লক্ষণীয়। এই উত্তরণ তাঁর প্রথাসিদ্ধ এবং উদ্ভাবিত উভয় কিংবদন্তীর ব্যবহারে চোখে পড়ে। ক'টি উদাহরণ-

১. 'শাহরিয়ার' কবিতার প্রথমেই এক স্থবিরতা চিহ্নিত হয় ('মায়ু শান্ত শিথিল') যা জীবনের সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে ও তাকে কলুষিত করে। কিন্তু যখন উজীরজাদীর প্রভাবে প্রেমসত্য ও প্রেম সৌন্দর্য সম্বন্ধে শাহরিয়ারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল, তখন সে বিচলিতঃ 'ছুটছে সে আজ অন্ধের বেগে'। অতঃপর তাঁর যাত্রা এলিয়টের waste land সদৃশ্য পোড়ো জমির ভিতর দিয়ে। এ হচ্ছে আত্মার ধূসরতার বহিঃপ্রকাশ। লক্ষণীয় এলিয়ট ব্যবহৃত ও উদ্ভাবিত waste land কিংবদন্তীতে 'শাহরিয়ার' কবিতার মতই যৌনতা ও স্বেচ্ছাচার পতন ও স্থলনের প্রধান কারণ।

শাহরিয়ারের আত্মোপলব্ধির সংগে সংগে তাঁর বর্হিচরিত্রের ওঠানামা, অধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর উত্তরণ নেতির অন্ধকার থেকে প্রাপ্তির আলোকে, এই উত্তরণের গতি কবিতার সর্বত্র সঞ্চারিত।

২. 'দরিয়ার শেষ রাত্রি' কথোপকথনমূলক বলে এর কাহিনীতে বিবর্তন সুনির্দিষ্ট। কিন্তু সিন্দাবাদের চরিত্রের প্রাথমিক দৃঢ়তা তার শেষ প্রস্থান পর্যন্ত অটুট থাকে। কিন্তু মাল্লাদের আবেদন বিবেচনা ও গ্রহণ করার মাধ্যমে তার চরিত্র পূর্ণতা পেল। জীবনের দুই প্রান্তে,- সমুদ্র ও বন্দরের উভয় বিপরীতে যখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, তখন এ দুই অবস্থানের বিশিষ্টতা তাঁর চরিত্রের উত্তরণের পথে সহায়ক হল।

৩. 'নৌফেলও হাতেম'-এর হাতেমও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে একটিই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম আবির্ভাবে হাতেমের চরিত্রপোষোগী মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে বাদশা ও হাতেমের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু হাতেম পরিপূর্ণ নন, কারণ তিনি বলেছেন,

তৃষ্ণা তবু মেটে নাই। অসম্পূর্ণ

অপূর্ব আমার সত্তা খুঁজে ফেরে পূর্ণতা প্রাপ্তের।

নৌফেলের মূল সংঘাত আদর্শের, চিন্তার আর মনের; এবং এই সংঘাত তাকে যেন সেই পূর্ণতা দিল, যার ভিতর দিয়ে হাতেম-চরিত্র ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল। শেষ ভাষণে হাতেম বলেছেন : 'স্থির হও বাদশা নেকনাম।' এই আহবান স্বগতোক্তি বটে। নিজেকেই স্থির হতে নির্দেশ দিচ্ছেন হাতেম : অজানা অচেনার অস্থির নেশার

ঘোর কাটাতে বলছেন। সর্বশেষে স্বয়ং নৌফেল হাতেমকে বলছেন ‘কামিল-ইনসান’ ‘আল্লামা পিয়ারা বান্দা’। এই ক্রমিক বিবর্তন কিংবদন্তীয় ধারাকে সংহত করেছে। ফররুখ আহমদের কবি মানস যে শুধু আদর্শগত কারণে কিংবদন্তীর দ্বারস্থ হয়েছিল, তা বললে তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও মহত্বকে ঋণাত্মক করে দেখা হবে। তাঁর আপাত ভাবাদর্শিতার আড়ালে, অপরিচিত শব্দ-বর্মের অন্তরালে, তাঁর উদ্দাম গতিশীলতার পেছনে ছিল একটি সহজ-সরল শিল্পীসত্তা কিংবদন্তীতে আকৃষ্ট হয়েছিল এর সহজাত আবেদন এবং সৌকর্যের অকপট প্রকাশের জন্য। সকল কিংবদন্তী আমাদের আত্মার গভীরে প্রবেশ করে, আমাদের মন ও মানসকে নাড়া দেয়; যে কারণে তারা এত সহজবোধ্য এবং চিরস্থায়ী। ফররুখের কবিতায় যে জন্যে কিংবদন্তী ব্যবহারের এই অনুষ্টি খুব সহজদৃষ্ট নয়। তার কারণঃ এর প্রকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে ঘটেছে এ তাঁর কাব্য সৃষ্টির সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে। একে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয় তাঁর সার্বিক শিল্পবোধ থেকে, কিন্তু একে অস্বীকার করাও তেমনি অসম্ভব। বস্তুত তাঁর আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধ এ দু’য়ের মিশ্রণে ও সমীকরণে ফররুখের কিংবদন্তী পরিপুষ্ট। ফররুখের কিংবদন্তী যেমন “বিশ্ব ও মানবসত্তার অন্তর্নিহিত সূত্রগুলির বহিঃপ্রকাশ” ০ ঘটায়, তেমনি তাঁর অন্তর্স্থিত সৌন্দর্য পিপাসার এক বিরাট মোচনক্ষেত্রও এই কিংবদন্তী।

## টীকা

১. টমাস এ, সিবীয়োক, “মিথঃ এ সিম্পোজিয়াম” (ব্লু মিংটন, লণ্ডনঃ ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২), পৃঃ ৬
২. ঐ, পৃঃ ৭
৩. এ,এম, হকার্ট, “লাইফ গিভিং মিথ” (জীবনদাতা কিংবদন্তী) (লণ্ডন ১৯৫২), পৃঃ ১৬
৪. বি. মালিনোফ্‌স্কি, “মিথ ইন প্রিমেটিভ সাইকোলজী” (আদিম মনস্তত্ত্বে কিংবদন্তী) (লণ্ডন, ১৯২৬) পৃঃ ১৩
৫. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, “কবি ফররুখ আহমদ” (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯) পৃঃ ১৭২
৬. ঐ পৃঃ ১৭৩
৭. ডেভিড বিতনী, “মিথ, সিম্বোলিজম এণ্ড ট্রুথ” (কিংবদন্তী প্রতীকবাদ ও সত্য) টমাস এ, সিবীয়োক সম্পাদিত “মিথঃ এ সিম্পোজিয়াম” গ্রন্থে সংকলিত, পৃঃ ২৩
৮. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, “কবি ফররুখ আহমদ” পৃঃ ১৫২
৯. ঐ, পৃঃ ২১৯
১০. ফিলিপ হুইলরাইট “দি সেমান্টিক এ্যাপ্রোচ টু মিথ,” সিবীয়োক “মিথ,” পৃঃ ১৫৪

# ফররুখ আহমদের কবিতায় বাক্‌প্রতিমা

বিপ্রদাস বড়ুয়া

ছন্দোবন্ধে ও বাক্‌-ব্যঞ্জনায় ফররুখ আহমদের কবিতা বাংলা কবিতার ধারায় বিশেষ পথ-রেখা নির্মাণ করেছে- এইরূপ নির্মাণে তাঁর কবিতা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন সৃষ্টি করে যে অভিজ্ঞতার সন্ধান দেয় তা ঐতিহ্যের এক বিশেষ মূল্যবোধে উজ্জীবিত। ঐতিহ্যের এই স্বাভাবিক জগৎ আরব্য উপন্যাস, ইরান-আরবের সংস্কৃতি এবং কোরানের কাহিনী এবং সেই প্রেক্ষিতে মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানই তাঁর কাব্যচর্চার মূল প্রেরণা। এই পটভূমিতে তাঁর বাক্‌প্রতিমার চিত্রময়তা, ধ্বনিরূপ প্রবলতা এবং স্বাদলিপ্ততা এক বৈভবমণ্ডিত সম্পদ। শুধু উপরোক্ত রকমের বাক্‌প্রতিমাই তাঁর কবিতার অবয়ব বললে কম করে বলা হবে, আমি সূত্রাকারে আরও কিছু প্রতিমার সন্ধান দিতে সচেষ্ট হব; দেখা যাবে তিনি কখনও কখনও পরাবস্তুর পানে ছুটছেন, কখনও প্রতিমাপুঞ্জ গড়ে তুলছেন নিবিড়ভাবে, অথবা সভ্যতার সংকটজাত প্রতিমা তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। তাঁর বাক্‌চিত্রাবলীর দৃশ্যময়তা কখনও কখনও এমন আচ্ছন্নতা নিয়ে উপস্থিত হয়, আবার স্পর্শের এমন নিবিড়তায় ডুবিয়ে রাখে .... ফররুখ আহমদের বাক্‌প্রতিমা বাংলা কবিতার নতুন সংযোজন, কাজী নজরুল ইসলামের পর এমন সার্থক প্রতিমা নির্মাণ বাংলা কবিতায় আরও কেউই করতে পারেননি। তাঁর প্রথম দিকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করছি। যেমনঃ

ঘন সুন্দর কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহঁস,  
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,  
পিপুল বনের ঝাঁঝাল হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;  
নামে নির্ভীক সিঙ্কু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

[ সিন্দাবাদ : সাত সাগরের মাঝি ]

সিন্দাবাদ নাবিক কবির নিকট বীরত্ব ও নতুন প্রেরণা সৃষ্টিকারী প্রতীক মানব - মুসলমান জাতিকে নব-জাগরণের বাণী শোনাতে পারে এমন নির্ভীক মানবই। সাত সাগর পাড়ির নতুন আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে।

চিত্রগুলি হচ্ছে ঘন-নিবিড় কাফুরের বন, দিল, হাতীর দাঁত, শিলাদৃঢ় আবলুস, পিপুল বন, ঝাঁঝাল হাওয়া (হাওয়া দৃশ্যমানও বলা যায়), ঘুম নামা চোখ, সিঙ্কু ঈগল এবং দরিয়ার হাম্মাম। আবার কাফুর বন, পিপুল বন, দরিয়া গন্ধ-বিস্তারী

প্রতিমা; হাতীর দাঁত বা হস্তি যুগপৎ শব্দমান ও গতিমান প্রতিমা নির্মাণ করছে; হাওয়া, ঈগল ও সমুদ্র করে শব্দমান ও গতিমান প্রতিমান নির্মাণ করছে; হাওয়া, ঈগল ও সমুদ্র করে শব্দমান গতিমান স্পর্শ সুখকর প্রতিমার উৎসার; হাতীর দাঁতের দৃঢ়তার ও শুভ্রতার সঙ্গে উপমিত হয়েছে শিলাদৃঢ় আবলুস কাঠের (লক্ষণীয় আবলুস কাঠ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; এখানে হস্তী-দন্তের শুভ্রতার সঙ্গে বৃক্ষের কৃষ্ণবর্ণ কাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রময় বাকবিস্তার নিবিড় বৈভবমণ্ডিত বলা যায়) ; অবশেষে বলা চলে এই শ্রেণীর বাকবৈভব নির্মাণে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন তুল্যমূল্যরূপে । অথবা, আরও একটি চিত্রধর্মী ও ধ্বনিময় দৃষ্টান্ত আহরণ করছি (এই কবিতায় এমন উল্লেখযোগ্য পঙক্তিমালা অনেক):

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ  
 শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,  
 ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদে চাঁদির তাজ,  
 পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;  
 নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ !

‘সিন্দাবাদ’ কবিতার গতিমান-চিত্রময় বাক্যপ্রতিমার সার্থকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা চলে না । এই কবিতার স্তরে-স্তরে যে ধ্বনিবহুল শব্দের কারুকার্য চলেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য যুক্ত হয়ে চক্ষুস্মান প্রতিমাবলী যে তৃপ্তি দেয়, কোন কোন চিত্রের স্পর্শ সুখময়তা এমন নিবিড়, সমুদ্রের নোনা স্বাদ এমন মুগ্ধকর, সমুদ্রের - দাঁড়ের শব্দ এতই শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর- ফররুখ আহমদের কাব্যাবলীতে ‘সিন্দাবাদ’ একটি শ্রেষ্ঠ পুষ্প বলে বিবেচিত হবে । অথবা ‘দরিয়ার শেষ রাত্রি’ কবিতার পঞ্চম মাল্লার মুখে শুনি বাকবৈভব ময় উক্তি :

সাত সাগরের সাথী তুমি জান পাথরে গড়া এ মুঠি,  
 বেদনা-নিসাড় দোলনার সুরে প’ড়েছিল পাশে লুটি’  
 বেহুঁশ হালতে খুঁজেছি আঁধারে দু’খানা কোমল ডানা  
 কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার শুনব না আর মানা ।

[ দরিয়ার শেষ রাত্রি : ঐ ]

মনন-যুক্ত এই স্মৃতিময় চিত্রগুলি গ্রথিত হয়ে শেষ পঙক্তিতে এসে তীব্র এক অনুভূতির মুখে দাঁড়াই । ‘কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার’ বলার সঙ্গে সঙ্গে যে গতিশীল চিত্রটির সাক্ষাৎ পাই, যে মানসিক শক্তিটি অনুভবযোগ্য হয়, আসলে তখনও কিশতির মুখ ঘোরেনি কিন্তু পাঠকের চোখে ‘ঘোরাও’ বলার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি প্রত্যক্ষবৎ হয় । কবির বাকবিন্যাস-নৈপুণ্য এইভাবে সার্থকতা লাভ করে । আবার ষষ্ঠ মালার

বক্তব্যঃ

কাল মাস্তুলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে,  
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরুভূর কূলে কূলে

[ঐ : ঐ ]

‘মাস্তুলে ঝড়ের কান্না শুনেছি’ শব্দমান প্রতিমার উদাহরণ নয় শুধু ‘ঝড়ের কান্না’ শব্দগোষ্ঠীকে উদ্বোধিত করছে না শুধু- এই শব্দমান প্রতিমা যেন দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে, কেননা মাস্তুল ঝড় দৃশ্যমান কিন্তু এখানে দুটি দৃশ্যময় চিত্র চক্ষুকে তৃপ্ত করলেও ঝড়ের কান্নাটি বর্ণনার সৌষ্ঠবে-দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে বলে আমার ধারণা। পরবর্তী পঙক্তি সম্পর্কেও অনুরূপ বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু এই চিত্রটিতে একটি বিষাদময়তা অতিমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠার ফলে পূর্বোক্ত গতিময়- শব্দমান বাক্চিত্রটি থেকে একে একটু পৃথক চোখে দেখেছি (যদিও প্রথম পঙক্তিতেও কান্নার বেদনা-বিষাদ আছে তা পরবর্তী চরণের মত হাহাকারমণ্ডিত নয়, পরবর্তী চরণে মরুভূমির ধূ ধূ বিস্তার শূন্যতার মননশীল প্রতিমার সংযোজনে বেশী হাহাকারমণ্ডিত হয়েছে)।

তঁার কবিতায় ধ্বনিরূপময় বাক্প্রতিমার সন্ধান মিলবে চিত্ররূপময় প্রতিমার পাশাপাশি, দুই ধরনের বাক্প্রতিমায় তঁার সিদ্ধি ঈর্ষার উদ্বেক করতে পারে। এমন কয়েকটি উদাহরণ রাখছিঃ

একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব  
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব  
অক্ষুট হ'য়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।  
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;  
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

[পাঞ্জেরী : ঐ ]

আজকে কঠিন ঝড়ের বাতাস দ্বারে করে কশাঘাত,  
সর্প-চিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত,  
প্রবল পুচ্ছ আঘাতে তোমার রঙীন মিনার ভাঙে।

[সাত সাগরের মাঝি : ঐ]

ঘুম ভাঙলো কি হে আলোর পাখী ? মহানীলিমায় ভ্রাম্যমান  
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হতে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান?

[ সিরাজাম মুনিরা : সিরাজাম মুনিরা ]

জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অঙ্ককার রাতে ;

যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর

[ নৌফেল ও হাতেম : নৌফেল ও হাতেম ]

ধূলির তুফান তুলি ওরা চলে রাত্রিদিন মরুর হওয়ায়

ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,

[ কাফেলা : কাফেলা ]

সামান্য বিন্দুর আকারে

দেখা দেয় যে বৈশাখী ঝড়ের মেঘ

সারা আসমানে সে ছড়িয়ে পড়ে অবলীলাক্রমে,

ইসরাফিলের শিঙ্গার ধ্বনি

যখন আমরা স্তন্যে পাই মেঘের বজ্রকণ্ঠে,

আর অনুভব করি

ভাঙা গড়া,

ঝড় ঝাপট,

বৃষ্টি বাদলের এক নতুন অধ্যায় ।

[ গদ্য পৃথিবী : সংখ্যা ২৯ ]

তার কবিতার এই প্রবল ধ্বনিময় বাক্‌প্রতিমা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও কাব্যগ্রন্থের তুলনামূলক ক্রমাবনতিতে এইভাবে আছে- ‘সাত সাগরের মাঝি,’ ‘সিরাজাম মুনীরা’ ও ‘নৌফেল ও হাতেম’ । নিঃসন্দেহে বলা যায় বহু কবিতার মধ্যে ‘সিন্দাবাদ’, ‘দরিয়ায় শেষ ‘রাত্রি’, বার দরিয়ায়’ তিনটি কবিতা প্রবল ধ্বনিরূপময় বাক্‌প্রতিমা-সমৃদ্ধ ।

ফররুখ আহমদের কবিতায় সমুদ্র (এই অনুশঙ্গে জাহাজ, ঢেউ, বন্দর, ঝড়), মরুভূমি (কাফেলা, উট, মৃগতৃষ্ণিকা ইত্যাদি), অরণ্য, শিরাজী, সূর্য, পাখি (ঈগল), চাঁদ, বৈশাখী ঝড় ইত্যাদি শব্দ ও চিত্রাবলী প্রবল আবর্তনশীল হয়ে বারবার এসেছে (আমার প্রথম দৃষ্টিতে এই সকল শব্দই বেশী চোখে পড়েছে) । অথবা ফররুখ আহমদকে বুঝতে হলে সমুদ্র ও মরুপুরাণের তীব্র ও ঝাঁঝালো উপাদান দু’টি বিশ্লেষণ করলে সঠিক উত্তর মিলবে, তিনি এই দুটি বিষয়ের অনুশঙ্গে আর- বাকি সবকিছু আহরণ করেছেন কিংবা বলা যায় আবর্তন সৃষ্টি করেছেন- বাক্‌প্রতিমাশেষণেও এই পথে নতুন-নতুন উল্লেখনীয় বিষয়ের অবতারণা অনুভব

করা যাবে। মননশীল প্রতিমাবলীর মধ্যে ইনসান, মঞ্জিল, তোরণ, আলো বা মুক্তি এবং এই শ্রেণীর অনুগামী প্রতিমা বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। অন্যদিকে মৃত্যু বাক্যপ্রতিমা বারবার উচ্চারিত হলেও বুঝতে হবে জীবনের উল্লাস বা নবজীবনের প্রতিষ্ঠার আলোকেই এর আবর্তনশীল উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা। ফররুখ আহমদ নব-জীবনের উদ্বোধক ও আশার বাণী বিন্যাসকারী কবি- ঘুমন্ত জাতির অয়েশী শরীরে তিন যাযাবরের গতিবেগ সঞ্চারকামী, ‘এক দিগ্বিজয়ী মানবগোষ্ঠীর সমরজিৎ শোণিত-স্রোতের নির্দেশক’। এই জন্য অরণ্যের ঝড়ের সঙ্কেতের সমান্তরালে ভেসে আসে নতুন মাটির ঘ্রাণের প্রতিমাঃ

আরণ্য ঝড়ের শব্দ শোনা যায় সেই পদক্ষেপে  
মাটির নতুন ঘ্রাণ ভেসে আসে সে, ঝড় মৌসুমে  
যে ঝড় (বিশীর্ণ-শ্রান্তি) চলেছিল দীর্ঘ পথ মেপে  
মৃত্যুর মর্সিয়া হয়ে, রূপ নিল আজ সাইমুমে।  
সসাগর পৃথিবীর আদিগন্ত স্নায়ু ওঠে কেঁপে  
রাত্রি-শ্রান্ত প্রেসম্যান স্বপ্ন দেখে পরিপূর্ণ ঘুমে॥

[ প্রেসম্যানঃ হে বন্য স্বপ্নেরা ]

এখানে আরণ্য ঝড়ের প্রতিমা মাটির নতুন ঘ্রাণ বহন করে আনছে, আবার সেই ঝড় মৃত্যুর মর্সিয়ার বাকচিহ্ন অঙ্কন করলেও কিংবা সসাগর পৃথিবীর স্নায়ু কাঁপিয়ে তোলার প্রতিমা গড়লেও পরবর্তী পদক্ষেপে দেখি রাত্রি-শ্রান্ত প্রেসম্যান পরিপূর্ণ ঘুমে আশার স্বপ্ন দেখছে (এই নাগরিক মানুষ হেমিংওয়ের বৃদ্ধ বাঘের গর্জনের স্বপ্নকে স্মরণ করায়)। এই মননশীল বাক্যপ্রতিমাটি ফররুখ আহমদের মানসিক-তাকে ধারণ করেছে। এখানে ঝড়, মরুভূমির সাইমুম, সাগর, মৃত্যু ও উজ্জীবনের স্বপ্ন প্রভৃতি বাকচিহ্নগুলি একটি পূর্ণ বাক্যপ্রতিমা নির্মাণ করেছে এবং ফররুখ আহমদের মানসিকতা এখানে পরিস্ফুট হয়েছে বলতে পারি। অথবা :

ঝড়ের শিখরে জাগায় প্রবল হেঁচা  
গতি আবর্তে সুদৃঢ় তার নেশা  
ভাঙে না বাধার কুটির ব্যঙ্গস্বরে  
চোখের পলকে সে আরবী তাজী উধাও দেশান্তরে।  
কেঁপে ওঠে তার সজীব খুরের আঘাতে মৃতের ঘর,  
জেগে ওঠে তার প্রবল গতির ঝড়ে মৃত প্রান্তর।

[ ইশারা : সিরাজাম মুনিরা ]

ঝড়ের তান্তবে অশ্ব হেঁষা ধ্বনি তোলে এবং সেই তাজী এখনই দিগ্বিজয়ে ছুটবে, আর সত্যই যখন যাত্র শুরু করল দেখলাম তার খুরের প্রবল আঘাতে মৃতের ঘর-বাড়ি বিলোপ হতে শুরু করেছে এবং পরিশেষে শুনতে পাই অশ্বের খুরের আঘাতে দীর্ঘ কাঁটাময় মৃত প্রান্তর সজীব হয়ে উঠছে- ফররুখ আহমদের বাকপ্রতিমায় বক্তব্য স্কুরিত হয়ে উঠল। উপরোক্ত দুটি বাকবন্ধে লক্ষ্য করা যায় গদ্যের একটা টান, এই মেজাজটি খুব জোরকদম নিয়ে তীব্র গতিশীল নয়, কিন্তু শ্রুতিশীল। আরও লক্ষ্যণীয় দুটি বাকপ্রতিমায় তাঁর ধ্বনিময় বৈভব দীপ্ত হয়ে উঠেছে। একটি উৎকৃষ্টতম ধ্বনিরূপপ্রবল বাকপ্রতিমাঃ

বাজে অনন্ত জলতরঙ্গ মৃদঙ্গ অশ্বের  
সারং রবাব একাকার হ'ল যন্ত্রীর মন্তরে।

[ আলী হায়দার : সিরাজাম মুনিরা ]

সভ্যতার সঙ্কট-জাত বাকপ্রতিমা নিদর্শন তুলে ধরছি এবার। একদিন বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষুধার হাহাকার উঠেছিল, সেই একদিনের ইতিহাস ১৩৫০ সালের মন্ডন্তর, সেই দিনের ফররুখ আহমদ কলকাতা নগরের এবং বাংলার দুঃস্বপ্নকে ধরেছেন এইভাবেঃ

অন্ধকার ! গুঢ় অন্ধকার-

ভয়ঙ্করী এ রজনী বাহুতে জড়ায় কাল সাপ  
মানুষী বিবেকে শুধু পড়িতেছে শয়তানী চাপ  
পাশব প্রতাপ।

... ...

গলিত শবের মুখে এই প্রশ্ন এ সংশয় আশঙ্কা- কুটিল  
বহু রাত্রি পার হয়ে জ্বলিত পথের প্রান্তে শংকিত নিখিল

আজও স্বপ্ন দেখে,

আজিও শবের পিছে পার হয়ে যাত্রীদল চলেছে অনেক।

[ নাম কবিতা : হে বনা স্বপ্নের ]

এ পাশব অমানুষী ত্রুর

নির্লজ্জ দস্যুর

পৈশাচিক লোভ

করিছে বিলোপ

শাস্ত মানবসত্তা, মানুষের প্রাপ্য অধিকার

ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,



মানুষের হাড় দিয়ে আজ গড়ে খেলাঘর;  
সাক্ষ্য তার প'ড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর' পর।

[ লাশঃ সাত সাগরের মাঝি ]

'হে বন্য স্বপ্নেরা' নামক অগ্রস্থিত কাব্যের নাম-কবিতাটি থেকে নেওয়া প্রথম উদ্ধৃতির এই ছত্র কয়টি। ফররুখ আহমদের রোমান্টিক মন একদিন সভ্যতার সঙ্কট দেখে বিমূঢ় হয়ে এই পঙ্ক্তি নিয়ে রচনা করেছেন, এমন আরও কবিতা আছে ('সিরাজাম মুনিরা'র 'এই সংগ্রাম' কবিতায়ও এই সংকট প্রকাশ পেয়েছে)। ফররুখ আহমদ যেখানে আতর লোবানের গন্ধই বেশী শুঁতে ভালোবাসেন সেখানে পাই এই লাশের তীব্র গন্ধ, এই দুটিই ঝাঁঝালো অর্থাৎ দ্রাণেন্দ্রিয়ময় বাক্‌প্রতিমা।

যে-সকল মননশীল ও সাধারণ অর্থ-প্রকাশক প্রতিমা ফররুখ আহমদের কাব্য দেহ গঠন করে, যাদের সঞ্চারণ তাঁর কাব্যে বহুগুণিত তেমন একটি স্তবক আহরণ করছি। শব্দগুলি ঘুম, সুবে সাদেক, তারকা, মিনার, ঝড়, ঈগল, দিগন্তে সোনালি বান, তিমির শিকল উটের সারি, যাত্রীদল প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্টতাজ্ঞাপক মননের :

তাদের চলার তালে চুম ভাঙে, দুই চোখে নেমে আসে ঘুম,

সুবে সাদেকের শুভ্র পথে এসে তারকারা নীরব নিঝুম ...

দীর্ঘ মোরাকাবা শেষে অকস্মাৎ প্রভাতের রঙিন মিনার

চূড়া তোলে তার ... ..

প্রবল গতির ঝড় বুকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উড়িছে ঈগল,

দিগন্তে সোনালি বানে খুলে গেছে শর্বরীর তিমির শিকল,

উটের সারির পাশে জমা হ'ল একে একে দৃঢ় অচপল

দূর যাত্রীদল।

[ কাফেলা : কাফেলা ]



# স্মৃতিচারণ



# আমার বন্ধু ফররুখ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নিজের স্মৃতির ওপর আমার নিজের কোনও আস্থা নেই। যেমন এক সময় আমার বন্ধুমূল ধারণা ছিল, স্কটিশে বি-এ পড়বার সময় আমাকে সুকান্তর নিকট সম্পর্কের এক দাদা প্রথমে কবিতার একটা খাতা এনে দেয় এবং পরে কিশোরবয়সী সুকান্তকে এনে আলাপ করায়। পার্টিভাগের পর তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে লিখিতভাবে বলা হয় এটা মিথ্যে এবং সুকান্তর চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই তারা সেটা প্রমাণ করে। সুকান্তর গুরুজনবর্গ এ বিষয়ে নীরব থেকে বুঝিয়ে দেন হাওয়া কোন দিকে।

কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কিত একটা ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা এখানে সেখানে আগেও বলেছি। তবে তা নিয়ে আজও কোনও ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

সম্প্রতি ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত এবং শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত সাত-শো পৃষ্ঠার একটি মোটা বই ‘ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি’ হাতে পেয়ে সেই পুরানো কথা নতুন করে মনে পড়ল। এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। তবু বলছি তাতে একটু মজা আছে। সালটা ১৯৩৯। ভুল হওয়ার নয়। লেখক-অধ্যাপকদের অনেকেই তখন রিপনে পড়ান। তাঁদের ছাত্রদের কার কার লেখা তখন কাগজে বেরোচ্ছে। তাঁরা সবাই আমার সমকালীন। ফররুখ, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস। বি-এতে আশুতোষ ছেড়ে আমি যাচ্ছি। স্কটিশে। কিভাবে যেন কানে এল ফররুখও নাকি স্কটিশে ভর্তি হচ্ছে। দর্শন ওরও বিষয়। কাজেই গোড়া থেকেই মতলব ছিল ওকে খুঁজে বার করার।

দর্শনের ক্লাসে গিয়ে বসেছি। উসখুস করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। স্কটিশে ছিল গ্যালারি ধরনের বসবার জায়গা। অধ্যাপক তখনও ক্লাসে ঢোকেন নি। পিছনের বেঞ্চিতে ঠিক আমার পিছনেই একজন বসে। চেহারা দেখে আমার কিছু একটা মনে হয়েছিল নিশ্চয়। চোখেমুখে বেশ একটা ধারালোভাব। মনের মধ্যে খেলে গেল, এ নিশ্চয় ফররুখ। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছি না।

পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম?

ছেলেটি তার উত্তরে ওভাবে খিঁচিয়ে উঠে বলবে, ‘আমার নাম শুনে আপনার কাম’ এটা ছিল আমার ধারণার বাইরে। তখন আমার বেশ নামডাক। ‘পদাতিক’

বেরোবে বেরোবে করছে। শুনে একটু চুপসে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এর শেষ দেখতে হবে। এ ছেলে ফররুখ না হয়েই যায় না।

ফররুখের কবিতা তখন ‘কবিতা’, ‘পরিচয়’, ‘চতুরঙ্গ’, বেরোচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে, সবই প্রেমের কবিতা এবং অধিকাংশই সনেট। মনে মনে মতলব আঁটলাম। ঝট, করে পিছন ফিরে ওর খাতাটা টেনে নিলাম। দেখলাম মলাটে কালি দিয়ে ইংরিজিতে লেখা- এফ আহমদ।

ঠিক ধরেছি জেনে মনে মনে খুশি হলাম। পিছন ফিরে আরেকবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ফররুখ আহমদ? আবার সেই রুক্ষ গলার উত্তর ভেসে এল, না। এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হতে পারত এই যে, এরপর দুই অহঙ্কারী কবির মধ্যে বরাবরের মতন নিঃশব্দের একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে গেল।

আসলে হল এর ঠিক উল্টো। কলেজে ফররুখ হয়ে গেল আমার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু।

ফররুখ একদিন ধরে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। যতদূর মনে পড়ে, পূবে রেললাইন পেরিয়ে কাঁচা রাস্তার ঠিক গায়ে। ওপরে টিনের চাল। চারপাশে ঘোপঝাড় ভেতরে বড় উঠোন। একটু পরে এল চা আর বাড়ির মুরগির ডিম দিয়ে বানানো গোলগাল মামলেট। তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আর সেই অমৃতের পর হাতে গুঁজে দিয়েছিল ঝাঁকি রঙের পাতায় জড়ানো কড়ে আঙুল প্রমাণ বিষ। তারপর দেশলাই জ্বলে নিজের হাতেই তার মুখাগ্নি করে আমাদের টানতে বলেছিল। ভদ্রলোকের ঘরে অপাঙক্তের সেই যে বিড়ির মৌতাতে বাঁধা পড়ে গেলাম, তা থেকে আজও ছাড়া পাইনি।

কলেজের পর আমরা দুজন দুদিকে ছিটকে গিয়েছিলাম। এর ওর কাছে খবর নিতাম। শুনতাম ফররুখ কেমন যেন হয়ে গেছে। কখনও কখনও পার্কের বেঞ্চিতেই রাত কাটিয়ে দেয়। পোশাক পরিচ্ছদে বাবুগিরি চুলোয় গেছে। ‘কবিতা’, ‘পরিচয়’ বা ‘চতুরঙ্গ’ ওর লেখাও বড় একটা দেখতাম না।

হঠাৎ একদিন ‘আজাদ’ আপিসে ওর সঙ্গে আমার দেখা। দেখি চিবুকের নিচে একটুখানি দাড়ি। পরনে আধময়লা পাঞ্জাবি আর ধুতির বদলে পাজামা। তেমনি রোগা। তখন ও বিড়ি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে সবসময় ওর মুখে পান আর হাতে চুনসুন্ধ থাকত পানের বোঁটা। আমাদের ইশারায় বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কবিতা লিখছ না?’ বলল, ‘এই চুপ, এখন আমি লীগের পোয়েট-লরিয়েট।’ তারপর দূরে দাঁড়ানো কিছু লীগ ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, ‘ববলে না, ওদের মাথায় হাত বোলাচ্ছি।’

মাঝে মাঝে ডেকার্স লেনে স্বাধীনতা পত্রিকা আপিসে চুপি চুপি এসে আমার খবর নিয়ে যেত । ও আমাকে ভোলে নি দেখে আমার খুব ভালো লাগত । প্রগতিশীল মুসলিম তরুণেরা কেউ দেখে ফেললেই হত মুশকিল । ফররুখের তো মুণ্ডপাত করতই, সেই সঙ্গে আমারও ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিত ।

তারপর স্বাধীনতা । দেশভাগ । এক সময়ে শুনলাম ফররুখ ঢাকায় চলে গেছে । চলে যাওয়ার আগে থেকেই দীর্ঘদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই ।

ভাষা-আন্দোলনের ঠিক পরেই ঢাকায় গিয়েছি সাহিত্য সম্মেলনে । ফররুখের খোঁজ নিলে পরিচিতরা ঠাট্টা উল্টে বলে, জানি না । একদিন গিয়েছি রেডিও আপিসে । কিছু তরুণ লেখককে বললাম ফররুখের সঙ্গে দেখা করতে চাই । একজন বেশ বাঁঝা দেখিয়ে বলল, ওর সঙ্গে আপনার কী দরকার? বাঃ ফররুখ আমার বন্ধু; কলেজে একসঙ্গে পড়েছি । ঐ রকম গৌড়া রিঅ্যাক্শনারি লোক কী করে আপনার বন্ধু হ'ল বুঝি না । না, ওর সঙ্গে দেখা করে কাজ নেই । আমি বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলাম । ফররুখ কাঠমোল্লা-বলে কী ? হতেই পারে না । ও নিশ্চয় চাঁছাছোলা কথা বলে এখানেও লোক চটিয়েছে । এমন সময় একটি বাচ্চা ছেলে এসে একটা চিরকুট দিল । তাতে লেখা, 'আমি পাশের রেস্টোরাঁয় আছি । তুমি টুক করে পালিয়ে এসো-ফররুখ ।' ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওদের ফাঁকি দিয়ে নির্দিষ্ট রেস্টোরাঁয় আসতেই ফররুখ বলল, 'দেখলে তো, আমি জানতাম ওরা তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না । হোঁড়াগুলো কিস্যু লিখতে পারে না । খালি বড় বড় কথা ।' বললাম, 'ওরা তোমার ওপর অত খ্যাপা কেন?' 'আরে দূর, ছাড়ো তো ওসব !'

এরপর বাংলাদেশ হল । তখন সেই এক ব্যাপার । ওর বিরুদ্ধে তখন আরও বড় নালিশ । করেছিল জহির রায়হান । সত্যি বলে মানতে ইচ্ছে করে না তাহলে ও তো অনায়াসে পাকিস্তানে সরে পড়তে পারত । সময় ছিল না এমন নয় । তবে এটা এমনই একটা বিষয়, যাতে আমার হ'লফ করে কিছু বলার হক নেই ।

শুধু একটা কথাই জোর দিয়ে আমি বলতে পারি । আমার কাছে চাপলেও নিশ্চয়ই গৌড়া ইসলাম ধর্ম ওকে প্রবলভাবে টেনেছিল । তারই জোয়ারে লেখা ওর 'সাত সাগরের মাঝি' । ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় ভোল্ পাণ্টে গিয়েছিল ওর লেখার । তারপাশে ওর প্রথম যৌবনের প্রেমের কবিতাগুলো একেবারেই জ'লো মনে হবে ।

কার বাঁশী শুনে উচাটন হয়ে ছুটেছিল জানি না, কিন্তু ওর নৃত্যপর পায়ের নূপুরনিষ্কণ আমাদের কানে চিরদিন লেগে থাকবে ।

দেশ আর কালকে ফররুখ বুঝতে ভুল করেছিল, না ফররুখ বুঝতে ভুল করেছিল দেশকাল- আসামীর মৃত্যুতে রায় বেরোবার আগেই সে মামলা খারিজ হয়ে গেছে ।

# ফররুখ আহমদ ব্যক্তি মানুষ

আশরাফ ফারুকী

কবি প্রসিদ্ধি যাদের রয়েছে এমন বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের সংগে ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে আমার এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে ব্যক্তিমন এবং কবিমন সম্ভবত আলাদা। কেননা তাদের অধিকাংশেরই কবিতার কথায় ও ব্যক্তিজীবনের আচরণে বড় একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাইনি। বেশীর ভাগ কবিরই ব্যক্তি মানসে এবং চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যুত, সমাজে যা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান, কাব্য জগতে তা থেকে ভিন্নতর একটা মানস চৈতন্য বিরাজিত বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। বিশ্বের কোন সেরা কবির সংগে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ পাইনি। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যজীবনের কথা যতটা জীবনীকার ও সমালোচকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, তাতেও এ ধারণাই বলবৎ হয় যে, কবিদের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যজীবনের কথা যতটা জীবনীকার ও সমালোচকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, তাতেও এ ধারণাই বলবৎ হয় যে, কবিদের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যজীবন বহুলাংশে ভিন্নধর্মী। কিন্তু ফররুখ আহমদকে আমার ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়েছে। কেননা তাঁর মধ্যে আমি ব্যক্তিমানুষ এবং কবি মানুষের মধ্যে একটা আশ্চর্য সাজু্য লক্ষ্য করেছি। কবি কাব্যে যে আদর্শ, ধর্ম ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন, ব্যক্তি জীবনেও সে আদর্শবাদকে হুবহু অনুসরণ করেছেন।

পঞ্চাশ দশকের শুরুতে নাজিমুদ্দিন রোডের সাবেক রেডিও স্টেশনের সন্নিহিত আজিজিয়া রেটুরেন্টে একটি লম্বা টেবিলের পাশে উপবিষ্ট কবি ফররুখ আহমদের সংগে আমার প্রথম দেখা। প্রিয় কবির সংগে প্রথম সাক্ষাত পরিচয়। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র। সংগে ছিল সতীর্থ বন্ধু হাসান ইকবাল। কবি তখন আমার একটি মাত্র প্রবন্ধ পড়েছেন। ‘ইকবাল কাব্যে সমাজ দর্শন’- ১৯৫০ সালের দৈনিক আজাদের আজাদী সংখ্যায় বেরিয়েছে। প্রায় আড়াই পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধটি তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। প্রথম আলাপেই সে কথা বললেন। লেখার প্রশংসা করলেন- লিখতে উৎসাহিত করলেন। অনেক দিন পরেও সে প্রবন্ধটির প্রসংগ তিনি আমার কাছে তুলেছেন। প্রবন্ধে ইকবালের ফার্সী কবিতার যেসব অনূদিত উদ্ধৃতি ছিল সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। মওলানা আব্দুল্লাহিল কাফীর অনুবাদ অনুসরণে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল। সে কথা জেনে কবি বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে,



মূল কাব্যের ভাষা না জেনে অনুবাদ অনুসরণে এমন একটি মৌলিক প্রবন্ধ কি করে লেখা যায়। প্রবন্ধটি মৌলিক হোক বা না হোক, সমালোচনামূলক সাহিত্য রচনায় কবি আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন, তা কখন ভুলতে পারব না।

কবির সংগে পরিচয়ের প্রায় দশ বছর পর। আমি তখন বাংলা একাডেমীর কার্যকরী পরিষদের একজন সক্রিয় সদস্য। একাডেমীর বহু উন্নয়ন প্রকল্পের আমি প্রস্তাবক ও প্রণেতা। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার উপসংঘের ছয়জন সদস্যের মধ্যে আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম। কবি ফররুখ আহমদকে তাঁর কাব্যকৃতির জন্য পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংবাদটি পত্রিকায় প্রকাশের আগেই কবিকে খবর দেয়ার উৎসাহে হাজির হলাম তার মালীবাগস্থ বাসায়। খবর শুনে কবির ভাবান্তর বুঝা গেল না। খুশী হওয়ার ন্যূনতম কোন লক্ষণ তাঁর কথায় বা কাজে না পেয়ে আমি কতকটা হতাশ হয়েছি হয়তো। একটা শুকনা ধন্যবাদ পর্যন্ত পেলাম না কবির কাছে থেকে? একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার যে, যে কোন সাহিত্য পুরস্কারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে কথাও কি কবিকে বুঝিয়ে বলতে হবে? কবির প্রতি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম কি সেদিন? অনুভূতিটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনি। না, সেদিন কবি আমার প্রতি কিছুমাত্র কম অন্তরংগ ছিলেন না। চা-নাস্তা না খাইয়ে ছাড়েন নি। সাহিত্যের সীমা ডিঙিয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির আলাপ করেছে আমরা অন্যান্য দিনের মতোই।

ষাটের দশকে একবার ইসলামিক একাডেমীতে কোন এক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে নজরুল-দিবস উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান-মালার আয়োজন করা হয়। তিনদিন ব্যাপী নজরুল-দিবসের অনুষ্ঠানমালা তৈরী করার ব্যাপারে ফররুখ আহমদ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অনুষ্ঠানাদির সাফল্যের জন্য তিনি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করার জন্য ফররুখ আহমদকে মনোনীত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে কবিকে রাজী করানোর দায়িত্ব আমার উপর বর্তে। ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি সভাপতিত্বের দায়িত্ব নিতে কতকটা নিমরাজী হন। তাই দাওয়াতনামায় সভাপতি হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হয়। কবি তালিম হোসেন বললেন, ‘ফররুখ আহমদ যদি অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব বহন করেন, তাহলে সেটি হবে আশ্চর্যের ব্যাপার।’ আমি নবম আশ্চর্য ঘটানোর জন্য বদ্ধপরিকর হই। তখন অনুষ্ঠানের প্রায় এক সপ্তাহ বাকী। প্রতিদিন কবির সংগে দেখা-সাক্ষাৎ অব্যাহত রাখি। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সাফল্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আজাদ, ইন্ডোফাকসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ফলাও করে

অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করে। ফররুখ ভাইয়ের সংগে দেখা করলে তিনি জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য আমাকে মোবারকবাদ জানান। পরদিনের সভাপতিত্বের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেই এবং তিনি হাজির না হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং উদ্যোক্তারা যে বেইজ্জত হয়ে যাব সে কথাও তাঁকে বলি। তিনি বললেন, ‘সভাপতিত্ব আমার মেজাজ বিরুদ্ধ। তুমি আমাকে বিপদেই ফেলেছো।’ অনুষ্ঠানে তাঁর অনুপস্থিতিজনিত সংকট উত্তরণের কোন উপায় নেই জানিয়ে প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁকে ‘নজরুল-কাব্যে ইসলামী ভাবধারা’ বিষয়ে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নেই। পরদিনের কিসসা সংক্ষিপ্ত; কবিকে সভামঞ্চে হাজির করার চেষ্টায় সামগ্রিকভাবে ব্যর্থতা বরণ করি। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান-এর সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সভাপতির দায়িত্ব পালন করে সে যাত্রায় আমাদের উদ্ধার করেন।

কবির উপর অভিমান হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এক সপ্তাহ উত্তীর্ণ হতে পারেনি-কবির আকর্ষণে তাঁর বাসায় হাজির হয়েছি।

কবি ফররুখ আহমদ জনসভা ইত্যাদিতে ভূমিকা নেওয়া পছন্দ না করলেও সংগঠন বা সংঘশক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। দেশের আদর্শবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে তিনি একাত্ম ছিলেন। আদর্শবিরোধী অপসংস্কৃতির হাত থেকে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সর্বদাই অনুপ্রাণিত করতেন। কিন্তু ঐক্যের খাতিরে কিংবা সংঘশক্তির প্রমাণ দিতে গিয়ে ন্যূনতম সত্য-বিচ্যুতিকেও তিনি প্রশ্রয় দিতে রাজী হতেন না।

একবার বাংলা একাডেমীর এক সাধারণ নির্বাচনে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক অঘোষিত জোট তৈরী করা হয়। জোটের মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে শতাধিক লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সুধীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এতে ‘মুফাখখারুল ইসলাম’ নামটি দু’বার সংযোজিত হয়। কবি মুফাখখারুল ইসলাম এ ইশতেহারে তাঁর স্বাক্ষর দানের কথা অস্বীকার করে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। সে অবস্থায় নির্বাচনে আমাদের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিপদ উত্তরণের জন্যে আমরা বাংলা একাডেমীর অপর সদস্য মুহম্মাদ মুফাখখারুল ইসলাম সাহেবের (বর্তমানে শেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যাপক) এক বিবৃতি প্রচার করি। একাডেমী সদস্যদের আমরা ধারণা দিতে সক্ষম হই যে, ইশতেহারে স্বাক্ষরদাতা আসলে মুহম্মাদ মুফাখখারুল ইসলাম- কবি মুফাখখারুল ইসলাম নন। কাজেই কবি মুফাখখারুল ইসলামের বিবৃতিতে বিভ্রান্ত হয়ে আদর্শবাদীদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে এই ভয়ে কিছুটা সত্য গোপন করা হয়েছিলো মাত্র। কবি ফররুখ আহমদ জানতেন যে, আমরা প্রথমে কবি মুফাখখারুল

ইসলামকেই স্বাক্ষরদাতা হিসেবে প্রচার করেছিলাম। কথা ছিল তাঁর স্বাক্ষর নেওয়া হবে, কিন্তু তার আগেই ইশতেহারটি ছাপানো ও বিলি হয়ে যায়। কবি মুফাখখারুল ইসলাম যে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আমাদের নাজুক অবস্থায় ফেলবেন সেটা ধারণা করিনি। নামের পূর্বে ‘মুহম্মাদ’ বিশিষ্ট মুফাখখারুল ইসলামকে দিয়ে আমরা সে যাত্রায় নির্বাচনী প্রচারে উত্রে যাই। কবি ফররুখ আহমদ আমাদের এই প্রচার টেকনিককে সমর্থন করেন নি। নীতি ও সত্যের প্রতি ফররুখ ছিলেন এমনি অকুণ্ঠ। আদর্শ ও নীতির পোষকতাতেও নীতিবিরুদ্ধ প্রচার-কৌশল গ্রহণ করা যাবে না- এই ছিল ফররুখ আহমদের সহজ উপলব্ধির জন্যই ফররুখ আহমদের বকুনি আমরা অবলীলাক্রমে সহ্য করেছি। তাঁকে আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি।

ফররুখ আহমদ যে যুগমানসের প্রতিনিধিত্ব করতেন তা ছিল ব্রিটিশ-ভারতের মুসলমানদের আত্মোপলব্ধির যুগ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলিম স্বাভাবিক উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে জাতিসত্তার অনিবার্য আজাদী সংগ্রাম-এই ছিল তাঁর কবিমানসের পটভূমি। পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মুসলিম জাতির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রতিভুরূপে। মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমিতেই কবি রচনা করেছিলেন ‘সাত সাগরের মাঝি’। ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ কবিমানসের অপূর্ব সৃষ্টি ‘সিরজাম মুনীর’। যৌবনে ও শেষ জীবনে এই কাব্যগ্রন্থ দু’টি আমাদের মননে, মানসে, কর্মপ্রবাহে বিপুল গতিসঞ্চার করে আসছে। কবির কাব্যে যা বিধৃত, কবি সমাজে ও রাষ্ট্রে তার প্রতিফলন প্রয়াসী ছিলেন গভীরভাবে। ‘পাকিস্তান’ নামক নবীন রাষ্ট্রে তাঁর স্বপ্নের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে, এই ছিল তাঁর গভীর প্রত্যাশা। সমাজপতি আর শাসক গোষ্ঠীর দস্যুতায় কবির স্বপ্ন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেনি। এ নিয়ে কবির ছিল সীমাহীন উদ্বেগ। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মীমহলে সে উদ্বেগ তিনি প্রকাশও করতেন নিভীক চিত্তে। তাঁর সে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ‘হাবোদা মরুর কাহিনী’ কাব্যে। কবির ইন্তেকালের পর এ কাব্য প্রকাশিত হয়।

“আমার স্বপ্নে দেখা দেশ

যে দেশ এখান পড়েনি আমার নজরে।

সে দেশ আমি খুঁজে পাই নি

সে দেশ আমার স্বপ্নেই আছে।

আদর্শ বা লক্ষ্যে অবিচল দেশের বাসিন্দা

(একমাত্র আল্লাহর বিধানকেই গ্রহণ করেছে যারা

ঈমানে আর আমলে

যাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনে  
নাই শয়তানের আধিপত্য  
নাই অন্যায় অসত্যের প্রতিপত্তি  
নাই অশান্তির কোন প্রতিচ্ছায়া)  
সকল পুরুষ যেখানে চরিত্রবান  
সকল নারী যেখানে চরিত্রবতী  
সেই দেশই আমার স্বপ্নের দেশ ....”

পাকিস্তানকে কবি সেই স্বপ্নে দেখা দেশ বলে জানতেন। সে স্বপ্ন পাকিস্তানে বাস্তবায়িত হয় নি বলে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু কবিমানসের পাকিস্তান কখন মুছে যায় নি তাঁরস স্বপ্নের জগত-থেকে। পাকিস্তান আমাদের শেষ নভেম্বরে কবির সাথে আমার দেখা (হয়তো শেষ দেখা) তাঁর ইস্কটনের বাসা-সংলগ্ন মসজিদে। আসর নামাজের ওয়াক্ত। নামাজের পর কবি আমাকে তাঁর বাসায় ডাকলেন। স্বাভাবিকভাবেই কথা উঠলো : ‘দেশের ভবিষ্যত কি?’

আলাপ প্রসঙ্গে কবি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, ... “পাকিস্তানের মৃত্যু নেই ... ইসলামের প্রবাহের মতোই এ দেশ চিরঞ্জীব একটি জাতির আবাসভূমি। এ আবাসভূমি আল্লাহ মিটিয়ে দিতে পারেন না। বহু মুজাহিদের জিহাদ, মুজাহিদের সংগ্রাম, শহীদের রক্তদান আর অগণিত মুমিনের দোয়া’র বরকতে অর্জিত এ পাকিস্তান মিটে যেতে পারে না। যে আদর্শের রূপায়নে এর জন্ম, তার বাস্তবায়নের আগে এ দেশ এ জাতি ধ্বংস হবে কি করে? খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, মোজাদ্দের আলফেসানী, সৈয়দ আহমদ বেলভী, ইসমাইল শহীদ থেকে আল্লামা ইকবাল প্রমথ মর্মে মুমিনদের সংগ্রাম ও দোয়া ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না।” শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর নামও উচ্চারণ করেছিলেন হয়তো। সংগ্রাম ও দোয়া উভয়টিকেই হয়তো সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেন জানি আমার মনে হয় তিনি দোয়া’র উপরই বেশী ‘ইমফেসিস’ দিয়েছিলেন। তাঁদের দোয়া কবুল হয়েছিল বলেই মুসলিম মিল্লাত সংগ্রামের তওফিক অর্জন করেছিল। অপরটিও হতে পারে। তাঁরা সংগ্রামরত অবস্থায় দোয়া করেছিলেন বলেই তাঁদের সংগ্রাম ও দোয়া আল্লাহপাকের নিকট কবুল হয়েছিলো। কবির কথার জবাব হয়তো আমার কাছে ছিল। কিন্তু কবিকণ্ঠে উদ্দীপ্ত ‘বাণী’ শোনার পর কোন জবাব দেবার সাধ্য আমার ছিল না। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনি যে এর বাস্তবতাকে কবুল করে নিয়েছিলেন, ‘বাংলাদেশ বেতারে’ তাঁর চাকরি গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই তা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

# আমার ফররুখ ভাই

ফারুক মাহমুদ

কবি ফররুখ আহমদ ! আমার ফররুখ ভাই ! ফররুখ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ১৯৫৩ সালে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ১৯ নম্বর আজিমপুর রোডে। এ বাড়িতেই তখন একটি দীর্ঘ টিনশেডে প্রতিষ্ঠিত ‘আমাদের প্রেস’-এ ছাপা হত ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র সাপ্তাহিক সৈনিক। বাড়ির মূল দালানের সামনের অধিকাংশ জুড়ে ছিল পাকিস্তান তমদুন মজলিসের দফতর আর পেছনের ২/৩টা কামরায় সত্ৰীক বাস করতেন প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, জবাব সানাউল্লাহ নূরী ও জনাব নূরুর রহমান জামালী।

ভাষা আন্দোলনের পীঠস্থান সেই সৈনিক অফিসেই ফররুখ ভাইকে প্রথম দেখি। আমার বয়স তখন ১৫ বছর। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অপরাধে স্কুল তাড়ানো ঘরপালানো নানা মামলার ফেরার আসামী হিসেবে আড়াই বছরে পঞ্চম দফা নাম পরিবর্তনের পর সিলেটে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাংগঠনিক দায়িত্ব শেষ করে মজলিসের সদর দফতরে ফিরেছি। আমি তখন তমদুন মজলিস ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ছাত্রশক্তির সার্বক্ষণিক কর্মী।

পাকিস্তান আন্দোলনের যুগে চল্লিশের দশকে বাংলার মুসলিম তরুর সমাজের বুকের সাধ চোখের স্বপ্ন সোচ্চার ছিল ফররুখ আহমদের কবিতায়। ‘সাত সাগরের মাঝি’ তখন সর্বত্র ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে জলসায় ফররুখ আহমদ তখন একটি অতি আলোচিত নাম। সঙ্গত কারণে দূর থেকেই আমি তাঁর ভক্ত ছিলাম। সৈনিক অফিসে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। স্বনামে বেনামে। প্রচুর লিখতেন। মজলিসের কনিষ্ঠতম-সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে আমার নাম হয়তোবা তিনি কারও কারও কাছে গুনেছিলেন। ১৯৪৯ সাল থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম (২য়) এই নামে আমার কিছু কবিতা সাপ্তাহিক সৈনিকে ছাপা হয়েছিল। ‘৫৩ সালে ফারুক মাহমুদ নামেও বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু কবিতা প্রকাশ পায়। সে সূত্রে প্রথম পরিচয়েই তিনি যেন মোহিত করে ফেললেন আমাকে। তাঁর প্রতি যে একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভীতি জাগরুক ছিল আমার মনে তা যেন অনায়াসেই উবে গেল। পরবর্তী কয়েক দফা সাক্ষাতের পরেই তুমি থেকে তুই হয়ে গেলাম।

এরপর প্রায়ই দেখা হতো ফররুখ ভাইয়ের সাথে। কখনও সৈনিক অফিসে, কখনও 'বিখ্যাত' আবনের রেস্টুরেন্টে, কখনও তাঁর কমলাপুরস্থ কুঞ্জকুঠিতে। কখনও বা তমদ্দুন মজলিসের মাসিক পত্রিকা দ্যুতির সম্পাদনার সাথে জড়িত কবি মোহাম্মদ মাহফুজ-উল্লাহ ও প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম পরে ডক্টর চৌধুরীর সাথে কখনও বা বা সৈনিক সম্পাদনার সংগে সম্পর্কিত অধ্যাপক আবদুল গফুর, কবি মফিজউদ্দিন আহমদ, গল্প লেখক লুৎফুর রহমান চৌধুরী, গল্প লেখক মোয়াজ্জেম হোসেন, মরহুম সোলায়মান ভাইয়ের কারও না কারও সাথে সেখানে যেতাম। আবার কখনও কখনও একলাই যেতাম।

আবনের রেস্টুরেন্টকে বিখ্যাত বললাম এই জন্য যে সেদিনের ঢাকায় এটি ছিল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের প্রধান কেন্দ্র। কেননা, আজকের দিনের বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিল্পকলা একাডেমী, বুলবুল ললিতকলা কেন্দ্র, মহিলা সমিতি মঞ্চ ইত্যাদি মঞ্চ বা কেন্দ্র ধরনের কিছুই তখন ছিল না। টেলিভিশনের নামও তখন এ দেশের সাধারণ মানুষ জানত না। পত্র-পত্রিকার এত ছড়াছড়ি ছিল না। দৈনিক পত্রিকা বলতে ছিল আজাদ, মিল্লাত, সংবাদ, ইত্তেহাদ, মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার, উর্দু দৈনিক পাসবান এবং নামসর্বস্ব পাকিস্তান পোস্ট ও ইনসাফ। ঢাকা শহরে সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল সৈনিক, ইত্তেফাক, যুগের দাবী, পাক সমাচার, কাফেলা, বেগম, নতুন খবর, নতুন দিন ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি আরও মাসিক পত্রিকা সাকুল্যে মোহাম্মদী, সওগাত, মাহেনও, নওবাহার, দ্যুতি দিলরুবা এবং দুইটি মাত্র কিশোর পত্রিকা আলাপনী ও রংধনু। এমতাবস্থায় রেডিও পাকিস্তান ছিল বৃহত্তম গণ-মাধ্যম। সংগত কারণেই নিম্নতলীতে বর্তমান বোরহান উদ্দিন কলেজ ভবনে অবস্থিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রেই ছিল দেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীদের প্রধানতম নৈমিত্তিক মিলন কেন্দ্র। নবীন-প্রবীণ সবাই এখানে আসতেন। কিন্তু এদের বসার জন্যে বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না-ছিল সদর দরজার উল্টো দিকে অবস্থিত আনুমানিক ২০ফুট× ১২ফুট একটি কামরা ও তার পিছনে সংলগ্ন বারান্দা অর্থাৎ আবনের রেস্টুরেন্ট। আর আবনের রেস্টুরেন্টই ছিল কবি ফররুখ আহমদের বৈঠকখানা। রেস্টুরেন্টে ঢোকার আগেই শোনা যেত তাঁর দরাজ কণ্ঠ আর প্রাণখোলা হাসির আওয়াজ। ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়ত ঘরের কোন না কোন কোণে বসে আছেন ফররুখ ভাই এবং তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছেন নানা বয়সের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সংগীতজ্ঞরা।

ফররুখ ভাইয়ের কমলাপুরের বাসাকে কুঞ্জকুঠি বলারও অর্থ আছে। অর্থটা একেবারেই শাব্দিক। সেদিনের ঢাকা শহরের শেষ প্রান্তে ছিল গভর্নর হাউস অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গভবন। মতিঝিলের ঝিল থেকে শুরু হয়েছিল কাঁচা রাস্তা আর বন-বাদাড়ের পল্লী পরিবেশ, বাণিজ্যিক এলাকায় ওয়াপদা ভবনের আশেপাশে গরু হারালেও কেউ একলা খুঁজতে যেত না, ফকিরের পুলের ঘাটে এসে ভিড়ত হাজারমণী বোঝাই নৌকা। সেই মতিঝিল পেরিয়ে কমলাপুরের ভাংগা কাঠের পুল ডিংগিয়ে পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের বিরাট ভবনের পাশ দিয়ে এগিয়ে ডানদিকে গিয়ে বাম অভিমুখী পায়ে হাঁটা পথের প্রান্তদেশে, গাছপালা লতাগুলো আচ্ছাদিত একটি মাঝারি ও একটি ছোট টিনের ঘর- এই নিয়ে ছিল ফররুখ ভাইয়ের বাসা। বড় ঘরটিতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনি বাস করতেন। ছোট ঘরটিতে থাকতেন দীর্ঘ স্বেতশূণ্ণ বিমণ্ডিত তাঁর সহোদর বড় ভাই, জনৈক গৃহশিক্ষক আর ছোট ঘরের বারান্দায় অনিয়মিত ভাবে তাঁর ছোট ভাই চিত্রশিল্পী। বাস-মিনিবাসের রুটের ছড়াছড়ি তখন ছিল না- রিক্সা চড়ার ব্যাপারটি ছিল আমাদের অনেকের কাছে বিলাস-কল্পনা। তাই, পায়ে হেঁটেই তাঁর বাসায় হাজির হতাম আমরা।

ফররুখ ভাই রাজনীতি করতেন না; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক স্রোতকে সাংস্কৃতিক ধারার প্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন। জাতীয় জীবনে কোন অশুভ শক্তির অপচায়া দৃষ্ট হলে উত্তেজিত হতেন। সাংস্কৃতিক ও ছাত্র কর্মীদেরকে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার উপদেশ-উৎসাহ দিতেন। এ কারণে অনেকেই দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে বা রিক্সায় চড়ে তাঁর বাসায় যেতেন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে। আমিও যেতাম। যেতাম মজলিসের আন্দোলন সম্পর্কে, ইসলামী আদর্শের প্রেক্ষিত থেকে জাতীয় ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে এবং পাকিস্তান ছাত্রশক্তির আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে দিক-নির্দেশ নিতে।

সে যুগের স্বল্পসংখ্যক পত্রিকায় লিখে কেউই তেমন কোন পারিশ্রমিক পেতেন না। রেডিও অফিসের কন্ট্রাস্ট সার্ভিসের মাসোহারাই ছিল ফররুখ ভাইয়ের প্রধান, বলা চলে, একমাত্র আয়। তাই, আর্থিক প্রাচুর্য আমি ফররুখ ভাইয়ের বাসায় কখনও দেখিনি। কিন্তু তাঁর প্রবল জ্ঞান-প্রাচুর্য কোন দিনই সেই সত্যটিকে মেনে নেয়নি। নিজের সম্ভানেরা সব সময়েই পুষ্টির অভাবে কঙ্কালসার থাকলেও তাঁর কুঞ্জ-কুঠিতে প্রবেশ করে চায়ের সাথে 'টা' না খেয়ে কেউ ফিরেছেন এমনটি খুব কমই দেখা গেছে। এটা আমাকে কখনও কখনও কিছুটা অবাক করতো যখন ভাবতাম, অন্য এক প্রাসাদবাসী বিখ্যাত কবি নিজে ভোগ-বিলাসিতার সব উপাচার সন্ধ্যাবহার করলেও দেশী-বিদেশী ভক্ত-অনুরক্ত অতিথি-অভ্যাগতদেরকে 'পল্লীবাংলার

বড় আদরের ঐতিহ্যবাহী খাবার' বলে চিড়ামুড়ি খাইয়ে বিদায় দিতেন।

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতা এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সমর্থক ছাত্র ফেডারেশনের শেষ মুহূর্তের নাটকীয় বিরোধিতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়। মুসলিম জনসাধারণের উত্তাল আবেগের জোয়ারের নিচে তলিয়ে যায় তাদের সব প্রচার-প্রচারণা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সব সাংগঠনিক সংযোগ-সূত্র। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকারের কোন কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার মত অনুকূল পরিবেশ তাদের ছিল না। এ কারণেই গোড়ার দিকে, ১৯৪৭-৫০-এ অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক গোলাম আযমের মত ইসলামপন্থীরাই রপ্তিভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ধীরে ধীরে মুসলিম লীগের দুষ্কর্মে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠায় ছাত্র ফেডারেশনের সাবেক নেতারা বিরোধী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। তরুণ সমাজকে দলে টানার জন্য তারাই সিলেটে জনাব মাহমুদ আলীর স্ত্রী হাজেরা মাহমুদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় গঠন করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৫১ সালে। মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের অংগ-সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ১৯৪৯ সালের ১৭ই জুন থেকে প্রতিষ্ঠানিকভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবদান রাখতে থাকে। তাসত্ত্বেও ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীর ছাত্র আন্দোলনেও যে অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। একমাত্র গাজীউল হক ছাড়া তারা সবাই ছিলেন ইসলামী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী। এই পরিবেশে ছাত্র সমাজকে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে গঠিত হয় পাকিস্তান ছাত্র শক্তি ১৯৫৩ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে। আরেকটি ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘও এ সময়েই গঠিত হয়। ছাত্রশক্তির আত্মায়ক ফরমান উল্লাহ খান ও আমি প্রায়ই ফররুখ ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাঁর সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। আন্দোলনের একটুখানি সাফল্যেও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। সংকটের খবর শুনে হয়ে উঠতেন বিচলিত। তাঁর কুঞ্জকুঠিরের উত্তর পাশের চম্বাক্ষেতে (বর্তমান বিআরটিসিস'র টার্মিনালের জমিনে) বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন এটা-সেটা। মাঝে মাঝে তাঁর অভ্রভেদী দৃষ্টিকে দিগন্তে নিবদ্ধ করে থির হয়ে রইতেন কয়েক মুহূর্ত-হয়তোবা একটি আংগুল কামড়ে ধরে ঠোঁটের এক প্রান্ত ঈষৎ বাঁকা করতেন। তারপর একটি কঠিন মন্তব্য ছুড়ে মেরে আমাদের মনকে দৃঢ় করার প্রয়াস পেতেন। বলতেন, নওয়াব-নাইট, খাজা-গজা, জমিদার-জোতদারদের সংগঠন মুসলিম লীগ ইসলামের নাম নিয়ে ইসলামবিরোধী



জুলুমে লিগু। এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু দেশের তরুণ সমাজ আর অশিক্ষিত জনসাধারণ মুসলিম লীগের সাথে ইসলাম ও পাকিস্তানকে এক করে দেখছে। মুসলিম লীগ কয়েম করছে পুঁজিবাদ আর এর প্রতিবাদে প্রসার লাভ করছে কমিউনিজম। এ স্রোতকে রুখতে না পারলে দেশ, সমাজ সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এখানে যা কিছু বলেছি তাতে তাঁর কবিতার কোন উল্লেখ নেই-এটা অনেকের কাছে বেথাপ্পা মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতা তো মানুষের বিশ্বাসে উজ্জীবিত হৃদয় থেকে উৎসারিত উপলব্ধিরই অভিব্যক্তি। যে-কোন কবির কবিতাকে বুঝতে হলে তাঁর হৃদয়কে, হৃদয়ের বিশ্বাসকে, তার মনকে মনোভঙ্গিকে বোঝা একান্ত অপরিহার্য। ফররুখ ভাইকে কাছে থেকে যেভাবে দেখেছি তা এখানে তুলে ধরেছি। এই কারণে যে, তাঁর কাব্যকর্মকে এই পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে বিচার করলে সেগুলোর সঠিক রূপ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। ঈমানে-আমলে মর্দে-মুমিন অকৃত্রিম মানব-দরদী ফররুখ আহমদ ছিলেন নিপীড়িত মানবতার পক্ষে জালিম-জুলুমের বিরুদ্ধে আমরণ আপোষহীন অক্লান্ত সৈনিক। তাঁর সমগ্র কাব্যেই তাঁর সে ভূমিকা সুস্পষ্ট, কখনও সত্য-সুন্দরের অম্লান আভায়, কখনও ন্যায়-নীতির সপ্রশংস ভাষণে, আবার কখনও বা অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কঠিন কষাঘাত হিসেবে।

## ফররুখ আহমদ : কবি

মহাদেব সাহা

ফররুখ আহমদকে আমি প্রথম দেখেছি তাঁর মৃত্যুর পর, শবযাত্রার শুভ্র কফিনে আবৃত। প্রথম ও শেষ দেখা। একজন কবিকে এই একবারই এবং শেষবারই দেখার সংক্ষিপ্ত ও সামান্য স্মৃতি নিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম কবির মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কীভাবে বর্ণনা করা যায়। সে কি কোনও বৃক্ষের পতনের সঙ্গে তুলনীয় কিংবা বর্ণনাযোগ্য কোনও দূর নক্ষত্রালোকের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সহসা খসে পড়ার সঙ্গে? হয়তো তাই, হয়তো তাও নয়। একজন কবির মৃত্যুকে ঠিক কীভাবে বর্ণনা করা যায় আমি জানি না। কিন্তু একজন প্রতিভাবান ও ব্যক্তিশালী কবির মৃত্যু নিশ্চিতভাবেই একটি বর্ণনাযোগ্য বিষাদময় ঘটনা। কবির মৃত্যুতে কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হয় জানি না, তবে একটি কথা সম্যকভাবে জানি একজন কবির মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায় মানুষের জন্যে অনুতাপদঙ্ক একটি মহৎ উদার হৃদয়, মানুষের কল্যাণ ও সুস্থতার জন্যে উদগ্রীব একটি বিস্ময় আত্মা। সেই আত্মা যা পরিশোধিত, কল্যাণকামী এবং শান্তি পিপাসু। পৃথিবীর কোনও কবিই তার রাজনৈতিক মূলদর্শন যাই হোক না কেন, কখনই শ্রমিক নির্যাতন, গণহত্যা কিংবা সর্বহারা শ্রেণীর সর্বনাশের সমর্থন করতে পারে না। কোনও কবিই শ্রমিক শ্রেণীকে নিষ্পেষণের পরামর্শ দেন না, লোক হত্যায় উৎসাহ জোগান না। এজরা পাউণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের সমর্থনের যে দূরপণেরয় অপবাদ শোনা যায় সেই পাউণ্ডেরও মানস সংগঠনের মূল ছিল ইহুদী নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির গভীর ও সদূরপ্রসারী কারণ। এই অর্থনৈতিক কারণসমূহ বিচার করলে কবি পাউণ্ডের মানস বিবর্তনের ধারা উপলব্ধি করা সহজ হবে। হয়তো তখন পাউণ্ডের প্রতি আমাদের বিরূপতাও হ্রাস হবে বহুল পরিমাণে। বহু সাহিত্যিকের গুরু প্রখর ধীসম্পন্ন পাউণ্ডকে মনে হবে হয়তো কিছু পরিমাণে উন্মাদ, বিকারগ্রস্থ ও অস্থির। কিন্তু এই পর্যন্তই, তার বেশী নয়। মনে রাখতে হবে সহসা অর্থনীতির প্রতি সুগভীর মনোযোগ কবি পাউণ্ডের কবি সুলভ অস্থিরতা ও উন্মাদনারই লক্ষণ এবং কেবল কবি বলেই তা সম্ভব। তাই এই একটি মাত্র কারণে এতবড় কবিকে মানব বিদেষী ফ্যাসিবাদী বলে রায় দেওয়া যেমন ঠিক হবে না তেমনি ঠিক হবে না ক্যান্টেসের মত অসাধারণ কবিতারাশির কাব্যমূল্য অস্বীকার করা। ফররুখ আহমদ

প্রসঙ্গে প্রারম্ভেই এসব বিষয়ের আলোচনা থেকে কারও কার মনে হতে পারে কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে আমি অবিসংবাদিতরূপে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যেই এই ভূমিকার সন্নিবেশ করেছি। মোটেই তা নয়। আমার এই আলোচনা কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যু পরবর্তী আমার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। এ আলোচনা কোনো অর্থেই ফররুখ আহমদের মতো প্রতিভাসম্পন্ন কবির মূল্যায়ন কিংবা কাব্যবিচার নয়। তবে কবির সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতার কথা কিছু না কিছু এসে পড়েই। এই সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর রচনার মধ্যেও হয়তো তেমন সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব নয়। কবি ফররুখ আহমদের চরিত্র, কাব্যপ্রতিভা ও কবিমনীষা আলোচনার জন্যে যে মেধা ও বুৎপত্তি প্রয়োজন, প্রয়োজন যে দীর্ঘ শ্রম ও যত্নের-আমার মধ্যে তার সামগ্রিক অনুপস্থিতি ভিন্ন আর কিছুই নেই। তবু যেহেতু একজন কবির মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া আমার নিজের কাছেও নেহাৎ কম মূল্যবান নয়, সেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই মাত্র এ লেখার উদ্দেশ্য।

জীবদ্দশায় আমি কবি ফররুখ আহমদকে দেখিনি এই অনুতাপ আমার গভীর ও সাতিশয়। ফররুখ আহমদকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম তখন তিনি মানবিক সম্পর্কের পরপারে, সাদা কাফনে ঢাকা তাঁর দেহ। যে মানুষকে আমি দীর্ঘদিন থেকে জানি, তাঁর কবিতা পড়েছি প্রথম কৈশোরেই, বলতে গেলে আবাল্য যাঁর নামের সঙ্গে পরিচয়, তাঁকে প্রথম দেখলাম মৃত্যুর পরে। এতদিনের পরিচয়ের প্রথম উন্মোচন হল তাঁরই শবযাত্রায়। তিনি তখন মৃত ও নিষ্পন্দ। এতদিনের চেনা ও ভালোবাসার কবিকে এই প্রথম দেখলাম। কিন্তু তাঁকে না দেখার তো কোন কারণ ছিল না। তিনি এই শহরেই ছিলেন। ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী ফ্লাটেই ছিল তাঁর বাসস্থান। নিযুক্ত ছিলেন বেতারের চাকরিতে। দেখা না হওয়ার তো কোন কথা নয়। তবু কোনোদিনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ঘটনাচক্রেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতে পারত। সে সৌভাগ্যও হয়নি আমার তাই তাঁর মৃত্যুর পর আমার অদেখা ভালোবাসার কবিকে শেষ নমস্কার জানাতে গিয়েছিলাম। অনুতাপ ও দুঃখ সত্ত্বেও আজ মনে হয় কিছু কিছু লোক থাকে যাদের সঙ্গে বরং দেখা না হওয়াই ভালো। তাঁদের সম্পর্কে যে ধারণা থাকে সেটাই মূল্যশালী, পরিচয়টা কখনও তত মধুর মনোরম নাও হতে পারে। শুনেছি ফররুখ আহমদ ছিলেন অতিশয় উচ্ছল প্রকৃতির লোক, অত্যন্ত সহৃদয় ও ব্যবহারে আন্তরিক। তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্যের সৌভাগ্য আমার হয়নি। তা না হোক। দু'একজন মানুষ এমনি ব্যক্তিগত পরিচয়ের লৌকিক মালিন্যের উর্ধ্ব থাকা মন্দ কি !

ফররুখ আহমদ আমাদের সাহিত্যে একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তবে একটি কথা ঠিক যারা তাঁর প্রতি বিরূপ তারাও তাঁর কবি প্রতিভাকে অস্বীকার করেন না। তাঁকে ধর্মবিশ্বাসী, ইসলামপন্থী আর যাই বলা হোক তার সঙ্গে এ কথাও বলা হয়। যে তিনি একজন প্রতিভাধর শক্তিমান কবি। তাঁর অনুরাগী কিংবা বিদ্বেষী কেউই এমন কথা বলেন না যে ফররুখ আহমদের রচনা কাব্যগুণ বর্জিত। আমার মনে হয় একজন কবির জন্যে এই স্বীকৃতিই যথেষ্ট। তিনি ধর্মবিশ্বাসী কি নাস্তিক, গৌড়া কি উদার মতাবলম্বী সেসব প্রশ্ন মানুষ হিসেবে যদিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু কাব্যবিচারে তার মূল্য মাত্র ততটাই যতোটা তার কবিতার জন্যে ব্যক্তিচরিত্র উপলব্ধি প্রয়োজন। ধর্ম বিশ্বাস কি একজন কবির জন্যে ক্ষতিকর? কবির ধর্মবোধ ও ঈশ্বর চেতনা কি কাব্যের পক্ষে অকল্যাণজনক? এসব প্রশ্নের সহজ ও সাবলীল উত্তর দেওয়া যায় না। প্রথমতঃ ধর্মবিশ্বাস, ধর্মবোধ, ঈশ্বর-চেতনা কিংবা ধর্মাদেশ, ধর্ম-প্রবণতা ও ধর্মীয় প্রেরণা এক কথা নয়। কবির ধর্মবিশ্বাস অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এলিয়টও নিজেকে ক্যাথলিক বলে দাবি করেছেন। বলেছেন দান্তে তাঁর গুরু। রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি পর্বের রচনা ঈশ্বর-চেতনাসম্বৃত। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আধ্যাত্মিকতাবোধ সম্পন্ন ঈশ্বর জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের তৃপ্তি দেয়। কাব্যের রসজ্ঞপাঠক মাঝেই এসব কথা জানেন। সুতরাং কবির ধর্মবোধ সব সময়ই যে খারাপ ফলদায়ক হয় এমন ধারণা অবান্তর। বরং কবির মত একজন প্রেমিক ও বিশুদ্ধ রোমান্টিকের পক্ষে ঈশ্বরপিপাসু হওয়াই অধিক স্বাভাবিক। তবে কবির ঈশ্বরবোধ কিংবা ধর্মবিশ্বাস কোন অর্থেই একজন আনুষ্ঠানিক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ধর্মচর্চা নয়। একজন কবিতো স্বাভাবিকভাবেই কখন কখন মরমী। বিশুদ্ধ-নায় মরমী ছাড়া কি। এই অর্থে কবি নিশ্চিতভাবেই ধার্মিক, সব কবিই। ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গে এসব কথা কি খুবই জরুরী?

ফররুখ আহমদের কবিতার সঙ্গে ধর্মীয় ঐতিহ্যের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন। ঐতিহ্যবোধই তাঁর কাব্যের ভিত্তি। তাঁর মানস গঠনও হয়েছে এভাবেই। ঐতিহ্য সংলগ্নতার মধ্যেই তাঁর কবিতা সর্বশক্তি লাভ করেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ঐতিহ্য আসলে কি কোন দেশীয় ঐতিহ্যের সম্পদ না তা দেশীয় গণ্ডী বহির্ভূত কোন দূরাগত ঐতিহ্য? এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্যে বিশেষ কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই, ফররুখ আহমদের প্রায় প্রতিটি কবিতা, তাঁর শব্দ ব্যবহার, চিত্রকল্প এবং এমনকি কবিতার শিরোনামের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে। হতে পারে এ কোন দূরাগত ঐতিহ্য কিন্তু সেই ঐতিহ্যের ব্যবহারে তার শিল্পনির্মাণ ব্যাহত তো হয়নি বরং সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়েছে। ফররুখ আহমদের আদর্শের প্রতি অতিনিষ্ঠা

তাঁর কাব্যের কোন ক্ষতি করেছে কিনা কিংবা এই ধর্মীয় আদর্শের প্রতি পরিশেষে এতবেশি নিষ্ঠাবান ও কোন কোন ক্ষেত্রে অতি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার ফলে এতবড় সম্ভাবনাময় একজন কবির কাব্যবিকাশের ক্ষেত্রে সত্যিই কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল কিনা তার সূক্ষ্ম ও পক্ষপাতহীন বিচারের স্থান এ নয়। সে উদ্দেশ্যও আমার নেই। কৈশোর উত্তরকাল থেকে তাঁর সপক্ষে ও বিপক্ষে এত পরস্পর বিরোধী মতামত এবং কঠিন ও উচ্ছ্বসিত মন্তব্য শুনেছি যে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে তাঁর সম্পর্কে প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই বড় বিকারগ্রস্ত। দু’টিকেই আমার মনে হয়েছে প্রতিক্রিয়া-প্রবণ। যারা তাঁর প্রশংসা করেন তারাও যেমন তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করেন না, যারা তাঁর নিন্দা করেন তারাও তেমনি তাঁর কদর করতে অপারগ। এই দুই আচ্ছন্নতাপ্রস্তু ভক্ত ও বিদ্বেষীদের বাইরে এখন অন্তত তাঁর মৃত্যুর পর সুস্থ ও যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। আশা করি, সেই নির্মোহ ও বিদ্বেষহীন মূল্যায়ন থেকেই একজন শক্তিমান কবি-ব্যাক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠবে।

“ঘনায় তমালে, তালে রাত্রির বিরহ সেই সূর পারি না চিনিতে।”

বলা বাহুল্য, এই ‘তমাল তালে’র পাশাপাশি ‘বাদাম খোবানি আখরোট বন ও খেজুর কুঞ্জের ব্যবহার তো কম নয়ই বরং প্রচুর।

আবার তারই পাশাপাশি ;

“তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে  
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,  
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে  
স্বপ্নের প্রবাল।”.....

এই দুইয়ের মাঝ থেকে কবি ফররুখ আহমদকে চেনা, নির্ণয় ও আবিষ্কার সেও খুব সহজ নয়।

# রাত পোহাবার কত দেৱী পাঞ্জেরী

আলী রিয়াজ

শনিবার (১৯.১০.৭৪) রাতে টেলিভিশনে খবর শুনছিলাম। একটু আগেই শনিবারের ছায়াছবি অনুষ্ঠানে বাংলা ছবির একটা ছোট্ট অংশ প্রদর্শিত হয়ে গেছে, তার সূত্র ধরে ঢাকার ছবি আর পরিচালকদের নিয়ে আমাদের তুমুল বিতর্কের সাথে পাল্লা দিয়ে সংবাদপাঠক ইথারে খবর ছড়িয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটি ছোট্ট খবরে আমাদের সমস্ত যুক্তি-তর্ক থেমে গেলে-কবি ফররুখ আহমদ মারা গেছেন। মৃত্যুসংবাদ স্বভাবতঃই বয়ে নিয়ে আসে এক ধরনের দুঃখ-বিষাদ। সবাই যেন কেমন একটা গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে যায়। মনে হয় সমস্ত দরজা-পাট ভেঙ্গে চারদিকের অনন্ত নৈঃশব্দকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে এ দুঃখজনক সংবাদ সবার চৈতন্যে ঘা দিতে থাকে। প্রলয়ঙ্করী বাঁশী বাজে না, বাজে সাহানা রাগিণী। কিন্তু এ মৃত্যু-সংবাদে সবার আচ্ছন্নতা যেন একটু আলাদা, একটু ব্যতিক্রমী-কোথায় যেন দুঃখের একটা আর্তস্বর ভেসে আসে। কেন যেন মনে হয় একজন আপনজনকে হারিয়ে ফেলছি। মনে হয় আমাদের নৈরাশ্যের অন্ধকারে বিরল দীপগুলোর একটি নিভে গেল, আরেকটু গভীরতর অন্ধকারে আমাদের যাত্রাপথ হারিয়ে গেল।

আমার এইসব নিভৃত-ভাষণের মধ্যে হৃদপতনের মত স্বল্পপরিচিত বন্ধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ফররুখ আহমদ কে? বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে ফুটে উঠছে একটি পরিচিত-অপরিচিত আধো আলো আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ- ফররুখ আহমদ, ফররুখ আহমদ! বন্ধুর শরীত কণ্ঠস্বরে বুকের ভেতর হু-হু করে উঠতে থাকে- সত্যিই কি তিনি এত দূরের মানুষ? কেউ কেউ আবার ফিরে গেলেন পুরোনো আলোচনায়, কেউ কেউ উঠে গেলেন। শুধু আমি বসে রইলাম চুপ-চাপ। পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রতিপক্ষকে আঘাত হানবার কেউ রইল না। আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। কিন্তু আমার বুকের ভেতরের গভীর থেকে বারবার জাগতে থাকল সেই প্রশ্ন, ‘সত্যিই কি তিনি এত দূরের মানুষ?’

অথচ তাঁকে আমি দেখিনি, তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবু তাঁর কাব্যগৃহে থাকার জন্যে দু’একবার যেতে চেয়েছি। সাহিত্যের কবিতা শাখার প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগ থাকার জন্যে আমাকে অন্যান্য কবিদের মত তিনিও কাছে টেনেছেন। ব্যক্তি মানুষটিকে অন্যান্য কবিদের মত তিনিও কাছে টেনেছেন। ব্যক্তি

মানুষটিকে দেখবার কথা ভাবিনি। বারবার ভেবেছি তাঁর কবিতার কথা। কি মোহন ছন্দে পাঠককে নিয়ে দুলতে দুলতে চলতে থাকেন আমার চিরঅচেনা এই নতুন জলের নাবিক সিন্দাবাদ। আমি তাঁর কবিতা সবটাই বুঝেছি, সবটাই আশ্বস্ত করেছি এ মিথ্যে কথা বলার দুঃসাহস কই? পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ পড়া কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি জানি, আমি তা করিনি। তবে কি উৎসাহের অভাব? না, তাও তো নয়। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ হানবার সুযোগ নেই। কিন্তু সত্য যা তা সত্যই।

বয়সের পার্থক্য হিসেবে করলে তাঁর বয়সের এক চতুর্থাংশকে ধারণ করেছি দাবী করতে পারি। কিন্তু অগ্রজদের আনুকূল্যে পুরানো পত্রিকা নেড়েচেড়ে তাঁর কবিতা পড়েছি। কবিতার প্রতি প্রথম আগ্রহে যে কয়জন আধুনিক কবি আমাকে দোলা দিয়েছেন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব ও বেনজীর আহমদ তাঁদের অন্যতম। তাঁদেরই একজন সহযোগী আবুল হোসেন-এর কবিতাকে এড়িয়ে গেছি। পুরানো ‘চতুরঙ্গ’ কিংবা নতুন সাহিত্য পত্রসমূহে প্রকীর্ণ হয়ে থাকা এসব কবিতা নিয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনায় মেতে উঠেছি। হয়তো খণ্ডিত বক্তব্য ছিল তা, তবু তাঁর প্রতি অগাধ আস্থায় সমালোচনা করছি তাঁকে। তাঁর যুগের কবিদের বিরুদ্ধে যারা ধর্মাত্মতার অভিযোগ আনেন, আমি তাদের সমর্থক। অথচ গভীর অভিনিবেশ নিয়ে তাঁদের কবিতাগুলো পড়তে চেয়েছি। হয়তো পারিনি বুঝতে, তাই ভুল ধারণা লালন করেছি। অথবা সিদ্ধান্তে পৌঁছার সময় আসেনি। কিন্তু তার আগেই যে তিনি চলে গেলেন-দূর, কোথাও দূরে ..... দূরে।

আজ মনে পড়ে যায়, বারবার মনে পড়ে তাঁর একটি কবিতা পড়ে কী গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিলাম। শৈশবের সেই সময়ে উত্তেজনায় রক্ত টগবগ করে উঠেছিল, সে কৈশোরের অবুঝ হৃদয়ের জাগরণ হলেও একজন কবি আমাকে দোলা দিয়েছিলেন। আশ্চর্য কণ্ঠস্বরে বারবার উচ্চারণ করতাম-

পাল তুলে দাও, পাল তুলে দাও, মেনো না মানা :

দূরন্তচারী স্বপ্ন এ মনে দিয়েছে হানা।

কা'রা বাধা দেয়? কৃপমণ্ডুক কে ভীরা প্রাণী ?

চার দেয়ালের সীমানার ঘের মোরা না মানি।

মুক্ত ভোরের প্রথম সূর্য চির আশাদ।

পাল তুলে দাও, বাগা ওড়াও সিন্দাবাদ।

শুধু কি আমিই উচ্চারণ করতাম, একা একা রমনার পার্কে হাঁটতে হাঁটতে আবৃত্তি করতাম-না, তিনিও তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে বলে গেছেন, ‘পাল তুলে দাও, পাল তুলে দাও, মেনো না মানা।’ নচেৎ কিভাবে একজন কবি

এভাবে প্রবল বিদ্রোহী হয়ে যান। তাঁর কবিতা জুড়ে যে কথা লেপ্টে আছে, জীবনের রুঢ় বাস্তবের মাঝে কি করে তা টেনে নিয়ে গেলেন - 'চার দেয়ালের সীমানার ঘের মোরা না মানি'। কিংবা 'কি হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর শুনে?' তাই তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন 'নতুন সফর'-এ। সাথে সাথে নিয়ে গেছেন আমাদের, মোহন ডাক দিয়ে গেছেন-

‘বন্দী যেখানে বহু শতকের ক্লান্ত শ্বাস

আবার সেখানে দিয়ে যাও তুমি প্রাণোচ্ছ্বাস।’

অথচ কোথায় সেই প্রাণোচ্ছ্বাস? এবার তো তিনি চলে গেলেন।

কে এই চলে যাওয়া মানুষটা? আমি তাঁর কি পরিচয় দেব? বন্ধুবরের মত আমিও কি বলব ফররুখ আহমদ কে? কিন্তু সব পরিচয় শেষ করে তিনি যেন বলে গেলেন-‘নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিদ্দাবাদ।’ সাত সাগরের মাঝি’র কবি, মুসলিম রেনেসাঁর কবি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সনেটের রচয়িতা-ফররুখ আহমদ। আমি জানি এভাবেই তাঁর পরিচয় আমার কাছে। ব্যক্তিগত মানুষটিকে আমি জানি না, চিনি না। অথচ বারবার স্মরণে উঠে আসে তাঁর লাল কবিতা। অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এই কবি-শিল্পীর অকাল মৃত্যুর চেয়ে আজ আমার কাছে দু’টি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

একজন কবি, যাঁরবহু পঙ্গক্তি উচ্চারিত হবে, আলোচিত হবে বিভিন্ন কাব্যপিপাসুদের মুখে মুখে, কিভাবে তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন? চিরচেনা এই ঢাকা শহরেই বাস করতেন তিনি। অথচ বিস্মৃতির ধূলোর আস্তরণে তিনি ঢাকা পড়েছিলেন। ভুলে যাচ্ছিলেন সবাই ফররুখ আহমদ নামে একজন কবি দারিদ্র্যের সাথে ঘর বেঁধে বেঁচে আছেন। কাব্য-সংসার তাঁর যতই চমৎকার আর উজ্জ্বল হোক সংসারের তীব্র টানাপোড়েনে তাঁর শরীর নিঃপেষিত হয়েছে, আস্তে আস্তে তিনি মৃত্যুকে সাথী করে পানিতে ‘নতুন সফরে’ বেরিয়ে পড়লেন। অথচ একবারও আমাদের চোখে ধরা দিল না এ দীনতা এ দারিদ্র্য। অথচ একবারও আমাদের চোখে ধরা দিল না এ দীনতা এ দারিদ্র্য। তাঁর দীর্ঘ রোগভোগের সময় কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন নি, সমবেদনার কোন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়নি। এ দুঃখ কোথায় রাখব? এ লজ্জা কি দিয়ে ঢাকবো? তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদকীয় লেখা হবে, হচ্ছে। উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ রচিত হচ্ছে, আমি নিজেও কলম তুলে নিয়েছি। অথচ কেউ তো ভাবিনি : এতদিন আমরা কোথায় ছিলাম? রেডিওতে ছোট্ট একটা চাকরীকে সম্বল করে সংসারকে টেনে নিয়ে গেছেন। অথচ আমরা তা দেখেও দেখিনি। এই অবহেলার শেষ কবে হবে? এমনি ভাবেই তো সবাইকে হারাচ্ছি।



প্রতিবারই আমরা এই অন্ধকার রাতের অবসান হোক-এই প্রতিজ্ঞা করি, প্রতিশ্রুতি দেই। অথচ রাত আর শেষ হয় না, শুধু মাঝি সিন্দাবাদেরা নতুন পানিতে সফরে চলে যান। তাই প্রশ্ন রাখতে হয় -

‘রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?’

বন্ধুবরের অর্বাচীন প্রশ্নের উত্তর দেইনি, তাকেও যেন একই কথা বলতে ইচ্ছে করে : ‘রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?’ ইচ্ছে করে আরেকবার ফররুখ আহমদ-এর অবিদ্যাবাদী পঙ্ক্তিকে ইথারে ছড়িয়ে দিতে, বলে দিতে ইচ্ছে হয়-

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি,

জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরী ;

দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী ॥

# ফররুখ আহমদ : কবির প্রতিকৃতি

আতা সরকার

তাঁর চোখের গল্প শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম তাঁর মেজাজের কথা। স্তাবকদের তিনি সোজাসুজি দেখিয়ে দেন খোলা দরজা। তাঁকে যখন প্রথম দেখি, তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎকালে, তাঁর তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব আবিষ্কৃত করে আমাকে এবং তাঁর সহজ আন্তরিকতার উষ্ণতা আমাকে তাঁর সরল জীবনচর্চার প্রতি করে তোলে কৌতুহলী। তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা তাঁর অন্তর্গত জীবন-দর্শন থেকে উৎসারিত, শুধুই প্রতিভার দীপ্তিতে নয় ভাস্করিত। এই জীবন-চর্চায় তিনি আশা করেছেন তাঁর সহযাত্রী কোন ভক্ত, স্তাবক নয়। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ তাঁর চলার পথে নিঃসঙ্গই থেকেছেন।

তিনি, তাঁর জীবন দর্শন ও কবিতা সূত্রাবদ্ধ, -বিচ্ছিন্ন নয় কোনটি কোনটির থেকে। দর্শন থেকে তাঁর যে জীবন-চর্চা ও জীবন স্বপ্ন, সে থেকেই কবিতায় উৎসারণ। তাঁর কবিতা মানবিক আকৃতি প্রকাশ করে মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক মুক্তির। এ আকৃতির মাধ্যমেই তিনি বাংলা কবিতায় আপোষহীন যোদ্ধা ও শহীদ হিসেবে আধুনিক কাল-ফলকে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন।

কবি ফররুখ আহমদ পুরোপুরি ভিন্ন স্রোতধারার স্বাপ্নিক হয়েও বাংলা কবিতার ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার নিয়েই নির্মাণ করেছেন আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপট। পাশ্চাত্যের ভাব-প্রবাহে আধুনিক কবিরা যখন অতি-বাস্তবতার রোমান্টিকতায় পশ্চিমা কবিদের ঐতিহ্যের অনুকরণে শাশান-ঘাটা করোটিতে উত্তরাধিকার অনুসরণ করছিলেন এবং পঙ্কিলতায় খুঁজছিলেন কবিতার উপকরণ, ফররুখ সেখানে জীবনবাদী মানবিক উপলব্ধিকে সঞ্চারিত করেছেন এবং বাংলা কবিতার হারানো যোগসূত্রকে করেছেন উদ্ঘাটন। কবিতার উপকরণ হতে পারে মানুষ এবং তার মুক্তির স্বপ্ন। এই বোধ থেকেই তিনি কাব্য-ঐতিহ্যের হারানো সূত্রটির প্রতি নির্দেশ করেন : 'পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান মানুষের আর্তি : মানবতা/উজ্জ্বল হীরার মত, দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে।' (হাতেম তা'য়ী)

কবি ফররুখ নতুন জীবন উত্থানের প্রত্যাশী, এই উত্থান দর্শনগত ঐতিহ্যের লালিত ভূমিতে। যে নৌকা একদিন ছুটেছে দূরন্ত বেগে, সে যদি থাকে ঘাটে বাঁধা, তার ভেতর আবার গতির সঞ্চার করতে হলে তাকে মনে করতে হয় অতীতের

গতির কথা, তাকে আবার বাঁধন খুলে নতুন উদ্যমে পাল তুলে দিতে হয়। এই পেছনে তাকানোটা কখনই হতে পারে না পশ্চাৎগামিতা। উক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত তাঁর ‘শিল্পলিপি’ গ্রন্থে লিখেছেন : ‘এই পুনরুজ্জীবিত শিল্পকে একটু ভাল করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস, সর্বত্রই দেখিতে পাইবেন, এই পুনরুজ্জীবনের ভিতরেও শিল্প শুধু নতুন দেহ নয়, প্রাণও নতুন করিয়া লাভ করে।’ কবি ফররুখ জ্বার কবিতায় পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে নতুন দিনেরই সন্ধান করেছেন : ‘কারো অচেতন প্রাচীন তণ্ডুতে/পুনর্গঠন নতুন মন/ করো রাত্রির উষ্মর মরুতে/ মুক্ত ভোরের বীজ বপন।’ (আজ সংগ্রাম : সিরাজাম মুনীরা)

ফররুখ আহমদের নতুন ভোরের সন্ধান মানুষের মুক্তিবোধ থেকে উৎসারিত। ফররুখ জন্ম নিয়েছিলেন একটি মহাসমরের মাঝখানে। ঔপনিবেশিক শাসন কবলিত পিতৃভূমির লাঞ্ছনা তিনি দেখেছেন। দেখেছেন বিবেক-বর্জিত ধনবাদী সমাজের বিকাশ। সভ্যতার ভুঙ্গে অবস্থানরত জাতিগুলোর বর্বরতা ও শোষণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি। দ্বিতীয় মহাসমরের তাণ্ডবলীলা দেখেছেন। তাঁর চোখের সামনেই ঘটে গেছে সর্বগ্রাসী মন্বন্তর। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিষময় ফল হিসেবে মানুষ লুটিয়েছে ফুটপাথে, মানবতা পরিণত হয়েছে বোধ-বর্জিত লাশে। তিনি মনে করেছেন জড়বাদী সমাজের সারাৎসারই হল এই অধঃপতন। এ-জন্যই তাঁর ভেতরে প্রশ্ন আলোড়িত হয়েছে : ‘এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্ত্বাকে/করে পরিহাস?/কোন ইবলিস আজ মানুষের ফেলি মৃত্যুপাকে/করে পরিহাস?/ কোন আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?/জিভায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসরে/ কোন প্রেত অট্টহাসি হাসে?/ মানুষের আত্ননাদ জেগে উঠে আকাশে আকাশে।’ এক্ষেত্রে তিনি চিহ্নিত করেন ধনবাদী জড় সভ্যতাকে এবং তার প্রতিই তাঁর কবিতার সকল অভিষাপ : ‘হে জড় সভ্যতা/মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক-সমাজ।/মানুষের অভিষাপ নিয়ে যাও আজ।/তারপর আসিলে সময়/বিশ্বময়,/তোমার শৃংখল-গত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি’/নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি’/আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ঘ নিখিলের অভিষাপ হও,/ধ্বংস হও,/ তুমি ধ্বংস হও।’ (লাশ : সাত সাগরের মাঝি)

কবি ফররুখ মানুষের মুক্তির ও মানবিক বিকাশের পথ সন্ধান করেছেন ইসলামী আদর্শবোধ থেকে। এ বোধ থেকেই তিনি ‘হেরার রাজতোরণ-’এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি মানুষের সাম্যের স্বপ্ন দেখেন ইসলামী আদর্শে ; ‘যে পথে তীরে/বেদুইন পায় খুঁজে পরিচিত ডেরা,-/ যে পথের ধূলিমাঝে পতাকা সাম্যের/উঠায়েছে উর্ধ্বশির, সে-পথে আমার /আরদ্ধ জীবন।’ (সিন্দাবাদ : সাত সাগরের মাঝি)

মূলতঃ একজন কবি কখনই শুধু তার শিল্প-সাধনায় ও সৌন্দর্যের রংধনু রচনায় নিমগ্ন থাকতে পারেন না, যেমন পেরেছিলেন সম্রাট নিরো-যিনি জুলন্ত রোমকে পেছনে রেখে বাঁশীর সুর রচনায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। মানুষকে অতিক্রম করে কখনই শিল্পসত্ত্বার বিকাশ ঘটতে পারে না। এ জন্যে প্রত্যেক কবিরই প্রয়োজন দার্শনিক ভিত্তি ভূমি। শিল্প ছাড়া কোন দার্শনিক কবিতা যেমন শ্লোগানসর্বস্ব হয়ে ওঠে, তেমনি দর্শনবিমুখ কবিতা আকাশের বিলীয়মান রংধনু হয়ে ওঠে। এ ধরনের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো : ‘সুন্দর কবিতায় এমন এক মাধুর্য থাকে যা অতি সহজে হৃদয় স্পর্শ করে। এ কারণেই কবি যখন কোন যুদ্ধকৌশল, জুতো-নির্মাণ বা অন্য কোন বিদ্যার কাব্যিক চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেন, তখন সাধারণ শ্রোতা তার প্রশংসা না করে পারে না। এখন এসব কবিতায় সুন্দর ও ছন্দের যে কাব্যিক রং চড়ানো হয়েছে তা মুছে দিয়ে তাকে যদি সাদামাটা গদ্যে রূপান্তরিত কর তবেই তার বিকৃত চেহারাটি দেখতে পাবে। তখন হয়তো বলবে : কই এ চেহারা কখন সুন্দর ছিল বলে মনে হয় না তো ! বরং এ তো সেই চেহারা যা থেকে নব-যৌবনের স্নিগ্ধতা পুরোপুরি চলে গেছে।’ প্লেটো কবিতার ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে : ‘আমরা চাই আমাদের নাগরিকরা হবে স্বাধীনচেতা, যারা দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করবে। কবিতার ভূমিকা হবে এ বাক্যেরই প্রণিধান করা।’ (প্লেটোর রিপাবলিক/সরদার ফজলুল করিম অনুদিত)

আধুনিককালের দার্শনিক কার্ল মার্কসও প্রতিধ্বনি করেছেন এ ধারণার। তিনি নির্ধারণ করেছেন খোদ দার্শনিকেরই ভূমিকা। তিনি বলেছেন : ‘দার্শনিকরা কেবল বিভিন্নভাবে জগৎটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আসল কাজ হ’ল এটিকে বদলে দেয়া।’ (থিসিস অন ফয়েরবাক/কার্ল মার্কস)। কবির ভূমিকাও এর থেকে ভিন্ন কিছু হতে পারে না।

কবি ফররুখ আহমদের সারা জীবনের কাব্য-সাধনার মূলে চালিকা ভূমিকা পালন করেছে এই বদলে দেয়ার আকাঙ্ক্ষাই। তিনি মানুষের মুক্তির ও মানবতার বিকাশের জন্যে ইসলামের আদর্শে নিয়োজিত হয়েছিলেন এক নিরন্তর সংগ্রামে। এক্ষেত্রে তিনি যেন তাঁর কবিতার ডাহক : ‘তুমি মুক্তপক্ষ নিভৃত ডাহক/পূর্ণ করি বুক/রিক্ত করি বুক/অমন ডাকিতে পার।’ এবং এ কথাও স্বীকার্য, এ পথে তিনি একক ও নিঃসঙ্গ। যেমন তিনি ডাহকের ডাক শুনে জেগে থাকেন একা : ‘রাত্রিভর ডাহকের ডাক/এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির/ দীঘ রাত্রি একা জেগে আছি।’ (ডাহক : সাত সাগরের মাঝি)

অনেক সময় তাঁকে আমার মনে হয়েছে, তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার হাতেম তা'য়ী, যেভাবে তিনি ঐ চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন, এবং মানবিক আকৃতিকে করেছেন প্রকাশ : 'কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়, - শুধু সে মানুষ/নিঃস্বার্থ, ত্যাগী কর্মী ও সেবাব্রতী,- পারে যে জাগাতে/ সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ : ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ।/জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়ক্ষুণ্ণ অন্ধকার রাতে।' (নৌফেল ও হাতেম)

ফররুখ আহমদ আধুনিক বাংলা কবিতায় ইসলামী ঐতিহ্যের নব-রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এই ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অনেকের রয়েছে উন্মাসিকতা। অথচ তাঁরা ভুলে যান, ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্যই দাঁড়াতে পার না, ঐতিহ্যই হল তার ভিত্তিভূমি। দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় থাকতে পারে মত-পার্থক্য, সেই দর্শনের আলোকেই ঘটে নব-রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্রাহ্ম হয়েও হিন্দুদের লোকায়াত ঐতিহ্য এড়িয়ে যেতে পারেননি, তেমনি বিষ্ণুদে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কসবাদী হয়েও পুরাণ ঐতিহ্যকে দিয়েছেন দার্শনিক তাৎপর্য। মীর মোশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম ঐতিহ্যের প্রভাব-বলয়ে সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। ফররুখ আহমদ আধুনিক কবিতায় ঐতিহ্যের নতুন মাত্রা দিয়েছেন তাঁর দার্শনিক চেতনায়। ঐতিহ্যের অনুগমন করেই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন : 'গড়ে তোল সেই ডেরা-পৃথিবী নুতন/প্রশান্তি, সুষমাময়, পরিপূর্ণ প্রেম ও সেবায়।'

ফররুখ কখনই স্বদেশ ও স্ব-কালকে এড়িয়ে যাননি। বরং তিনি স্বদেশের ঘটনাপ্রবাহে ও স্ব-কালের স্রোতধারায় আলোড়িত হয়েছেন। তাঁর কবিতায় বার বার এসেছে দেশের চিত্র, কালের প্রতিচ্ছবি। স্বদেশ ও স্ব-কালে ঐতিহ্যের সংযোগ তাঁর কবিতাকে কাল ও ভূখণ্ড উত্তীর্ণ করে ধ্রুপদ করে তুলেছে।

ফররুখ কাব্যের ভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। 'বাংলা' ও 'মুসলমানী' শব্দের শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলিম বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রচলিত শব্দগুলোকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করার একটা কুট প্রবণতা রয়েছে। বিশেষ করে ফররুখ কবিতার ঐতিহ্যনুগমনের ফলে যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এসব শব্দমালাই ফররুখের কবিতার আবহকে কাব্য মেজাজ দিয়েছে এবং রসগ্রাহী করে তুলেছে। এ সম্পর্কে মোতাহার হোসেন চৌধুরীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'আমাদের মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সমস্যা রস ও রূপের সমস্যা-শব্দ ও ব্যাকরণের সমস্যা নয়। আরবী-ফারসী শব্দবহুল হয়েও যদি রচনা রস ও রূপের দিক দিয়ে নিখুঁত হয়, তবে তা সার্থক রচনা, আর সংস্কৃত শব্দবহুল হয়েও যদি তাতে রস ও রূপের দৈন্য থাকে, তবে তা মূল্যহীন। এই মনোভাব নিয়ে সাহিত্য-বিচারে ব্রতী হলে অনেক গোলমালের হাত থেকে রক্ষা

পাওয়া যাবে এবং সাহিত্য মল্লভূমিতে পরিণত না হয়ে মিলন ভূমিতে পরিণত হবে।' (বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানী শব্দ : সংস্কৃতি কথা)। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণই যথেষ্ট- মাইকেল মধুসূদন দত্তের সংস্কৃত শব্দ বহুল 'মেঘনাদ বধ' কাব্য-রসিক পাঠকের বিরাগভাজন হয়নি কখনও।

একজন মৌলিক কবি কখনই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না তাঁর কবিতা থেকে। যে বোধ থেকে উৎসারিত হয় কবিতা, সে বোধ থেকে কি করে বিচ্ছিন্ন থাকেন একজন কবি? কিন্তু কবি ও কবিতার মধ্যে বৈপরিত্য সাম্প্রতিক সাহিত্য-অঙ্গনে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থ সাহিত্যিকদেরকে বিচ্ছিন্ন করে তুলছে তাদের সৃষ্টকর্মের চারিদিক থেকে। ফররুখ ছিলেন দৃঢ়চেতা আদর্শবাদী। তাঁর দর্শন, জীবন ও কবিতা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। স্বার্থের কাছে কখন তিনি অবনত হননি। আর এটিই তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল দুর্ভোগ, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত। আমাদের সমক্ষে এমন উদাহরণ তো বহু রয়েছে যারা দেশের নেতা বদলের সাথে সাথে জীবনীগ্রস্থের মলাট বদলেছেন, কায়েদে আযমের স্থানে লিখেছেন বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে হাওয়া বদলের সাথে সাথে লিখেছেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবন, মৌলিক গণতন্ত্রের উপর গল্পলেখক দেশের পটপরিবর্তনের সাথে সাথে পালিয়েছেন বাইরে, আবার ফিরে এসে গ্রহণ করেছেন সরকারী স্বর্ণপদক।

এ ধরনের কোন বৈপরীত্য নেই ফররুখ জীবনে। তিনি তাঁর কাব্যাদর্শে ছিলেন অবিচল। তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছিল : একজন কবির ক্ষমতাদর্পীর হাত থেকে নেয়ার কিছুই নেই।

কবি ফররুখ বলেছিলেন : 'মুমিনের মৃত্যুই চেয়েছি/দীর্ঘদিন এ জীবনে-আল্লাহর দরগাহে। অসত্যের/অন্যায়ের পদপ্রান্তে চাই নাই আত্মসমর্পণ/পৃথিবীতে।' (নৌফেল ও হাতেম)।

এ ধরনের মৃত্যুই কবি ফররুখ আহমদকে মহিমান্বিত করেছে।

# কোলাহলের বাইরে দাঁড়াতে বলি

আবদুল হাই শিকদার

ফররুখ আহমদকে নিয়ে বেশ একটা মজার নাটক ইদানিং জমে উঠেছে। নাটকের সংগঠক একদল বুদ্ধিজীবী। ‘বিশেষ করে’ সাহিত্য-ঘনিষ্ঠ একটি মহল। ‘বিশেষ করে’-কথাটা বলবার একটা উদ্দেশ্য আছে। আর তার কারণ এই মহলটির বাইরে যে সবুজ সমতল বাংলাদেশ-তাতে বাস করেন যে মানুষজন, তাদের এ নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। একেবারে নেই বলাটা আবার মুশকিল। মাথা থাকলে ব্যথা থাকবে, তা থাকাই স্বাভাবিক-তবে তাদের সাথে আমাদের ‘বিশেষ মহল’টির মৌলিক পার্থক্য ঢের -তাদের কাছে মাথাটাই মূখ্য। মাথা যে আছে, এ নিয়েই তারা সন্তুষ্ট -কিন্তু আমাদের কথিত মহলবাসীদের কাছে মাঝে-মধ্যে মাথার চাইতে ব্যথাই অধিকার করে বেশী আয়তন। ব্যথার ভারে এরা পারলে মাথাও কেটে ফেলতে রাজী।

এই মহলবাসীরা আবার দু’ভাগে খণ্ডিত। তাঁরা আর অনেক ভাগে। তবে দুটোই মুখ্য। এক ভাগ নিজের গায়ে প্রগতিশীলতার তকমা এঁটে নিজেরাই নিজেদের চরকায় তেল দিয়ে - তেল জুগিয়ে বেশ আছেন বুক চাঁগিয়ে। এঁরা অন্য ভাগীদের আখ্যা দিয়েছেন প্রগতির পরিপন্থী বলে। চাঁছাছোলা বাংলায় তাদেরকথার মানে দাঁড়ায়ে ওরা প্রতিক্রিয়াশীল। কথিত প্রগতিশীলদের সাথে তাদের ভাষায় আখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীলদের ফারাক-প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার এই অভিধায় নিজেরা নিজেদের ডাকতে অগ্নিশর্মা। তারা বলেন, আমরা খাঁটি দেশজ।’ অকৃতিমভাবে এদেশের জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্র তুলে ধরার পক্ষে।

যা বলছিলাম। প্রথম দলের লোকজন ফররুখের নাম নেন, অনেক সময় না নিয়ে পারা যায় না বলে। যাও একটু আধটু নেন তাও যথেষ্ট তুচ্ছতা আর ত্যাগের মনোভাব ষোলআনা বজায় রেখে। এদের ভাষায়, ফররুখ আহমদ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। এখন ‘ইসলাম- পছন্দ’ ওয়ালাদের হাতের পুঁজি। আমাদের তিনি কেউ নন।

একাংশ যখন এসব বলে বেড়ান অন্যদল তখন ফররুখ আহমদকে ‘ইসলামী রেনেসাঁসের কবি’ বানাতে বেহুঁশ।

নাটক জমাট বাঁধে এখানেই। এমনিতে এই দুই দল পরস্পরের মুণ্ডপাত করতে উদযান্ত, লবেজান। অন্যদল যদি দক্ষিণে বাঁক নেন অন্যদল উত্তরে এমনভাবে

ছুটতে থাকেন যে স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান থাকে না। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই একটি- ‘ফররুখ আহমদ’। তাঁকে নিয়ে নিজেদের জানতে হোক অজান্তে হোক দুই গোষ্ঠী একই কথা বলছেন। একটি জায়গায় তারা সমস্ত ‘ফররুখ ইসলামী কবি’।

অথচ অনাকাজিফ নাটকের দুঃখের দিক হল, টোটাল সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে পাথেয় করে এঁরা কেউ ফররুখকে দেখছেন না। সাহিত্যের সমগ্র মানচিত্র থেকে ফররুখকে বিচ্ছিন্ন করে, খণ্ডিত করে নিন্দিত ও নন্দিত করার ছলে, বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান কবি-পুরুষকে তাঁরই নির্মিত বিশাল ও বর্ণাঢ্য কবিতাভবনকে ধূলিমলিন ও পাশ কাটিয়ে, আসলে ধূলোময় করছেন বাংলা সাহিত্যকে, বাংলা কবিতার পাঠককে ভাঙছেন দু’ভাগে। চোখের জ্যোতিকে করতে চাচ্ছেন ঝাপসা।

কোন্দলে কালো হয়ে গেছে সাহিত্যে তাঁর সিঙ্কিলাভের প্রসঙ্গ। আড়ালে পড়ে যাচ্ছে তাঁর কবিকৃতি। শিল্পের সাফল্য মূখ্য না হয়ে এঁরা কবির ভাবকল্প, বিশ্বাস আর আদর্শ নিয়ে হচ্ছেন তোলপাড়।- আর এই অনভিপ্রেত কাছি টানাটানিতে কবি ফররুখ আহমদের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে দূরে কোথাও নির্বাসিত।

সমকালের উত্তেজনা এঁরা আক্রান্ত। কোন না কোনভাবে ক্ষীণকায়। বিচারেরব্যারোমিটারও সে আনুপাতিক। অথবা ‘জেগে থেকে ঘুমাই’- এর পর্যায়ভুক্ত। এটা এক প্রকার সাহিত্যিক ভগ্নমী। নইলে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের বাইরে যে বিশাল নিখিল সেদিকে চোখ যেতই এঁদের। আর চোখ গেলে দেখা যেতো কত পাহাড়-প্রমাণ স্ববিরোধিতায় এঁরা কপট। বাইরের পৃথিবীকে দেখছেন একভাবে ঘরের বেলায় টানছেন ভিন্ন উপসংহার-যদি বিষয় একও হয়, তথাপি। আমাদের ভাষায় এটা পরিষ্কার আত্মহনন ও অবমাননার দিক।

লেনিনের জীবনী যারা পড়েছেন তারা জানেন, তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন টলস্টয়। রুশ বিপ্লবের কেউ না হয়েও কি করে টলস্টয় একজন সামন্ত প্রভু গোষ্ঠী মায়কোভস্কিকে ডিসিয়ে লেনিনের ভেতরে এতবড় সম্মান ও প্রীতির সত্ত্বাধিকারী হতে পেরেছিলেন? কি দিয়ে? যদুর জানি, টলস্টয় তো লেনিনের কোন নিকট আত্মীয়ও ছিলেন না। তাহলে? এইখানেই আসে সাহিত্যের সার্বজনীনতার কথা। এইখানে আসে সাহিত্যের অন্তরাত্মায় বাস করে যে অমিত স্পর্ধা-তার কথা। আসে মহত্বের কথা। কাউকে ছোট বা বড় করবার কিছু নয় এটা। আসে মহত্বের কথা। কাউকে ছোট বা বড় করবার কিছু নয় এটা। এটা খানিক ছলকে ওঠা সাময়িক হাততালি পাওয়ার বিষয়ও নয়। এটা রসোত্তীর্ণের ধারা-অন্তরায়তনের সাফল্য কতটুকু-তার ব্যাকরণের বিধাতা এটা। শিল্প সমীক্ষায় কার বাণী কত প্রসারিত, গভীর এবং কালোত্তীর্ণ তাই এখানে বিচার্য। চিরকালের মানুষের জন্যে কবি সমকালের



পেয়ালা উপঢিয়ে কতটুকু প্রাচুর্য ও সুবাস রেখে যেতে পারছেন তাই হয় বিবেচনাধীন। সেখানে কে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা কে রেনেসাঁর কবি সেটা কোন বিষয়ই নয়।

ফররুখ বিশ্লেষকদেরও ভাবতে বলি তাই নিয়ে। কবি হিসেবে ফররুখ কতদূর পৌঁছেছেন, কেমন তাঁর চলার গতি, কালের সূতো ছিঁড়ে কতটুকু তিনি কালাতীত; তাঁর সংযোগ ও স্বাতন্ত্র্যের ঐশ্বর্য আছে, না নাই-থাকলে তার আচার-ভূষণ কেমন, চিরকালের মানুষের জন্যে মহাকালের দেয়ালে কত গভীর করে তিনি করেছেন নিজেকে খোদাই-তর্ক হোক তা নিয়ে। অন্যকোন আয়তনেই উৎসাহ অভিপ্রেত নয়-যদি কবি ফররুখ হন আমাদের অন্বিষ্ট।

কাব্যকৃতির প্রধান আকর সৃষ্টিশীলতার আবেগ। এ কোন অপরাধ নয়, এ হল লক্ষ্যে পৌঁছার নিছক একটা অবলম্বন মাত্র। কবিতা নিয়ে যুগে যুগে যে আলোড়ন ও আন্দোলন হয়েছে তার এই-ই অন্তঃসার। প্রাসঙ্গিকভাবে ধরিয়ে দেওয়াই এর ভূমিকা কেবল। কেননা সমকালের হৈ-চৈ স্তিমিত হলে, ফেনার স্তর নিচে নেমে এলে-কবি ও কবিতার স্থান হবে যখন অপারেশন টেবিলে তখন বুদ্ধিমান পাঠক তো তাড়িত হবে না উচ্ছ্বাস-আবহাওয়ায়। আর তা সম্ভবও না। হাজার বছরের সেপারে সে পাঠকের কানে কানে কে গিয়ে বলে আসবে ভাই এসব পড়ো না। এ এক প্রতিক্রিয়াশীল কবির কাজ, ওটা হল নাস্তিক লেখকের বই-এসবে তোয়াক্কা তো তার করবার কথা নয়। তিনি তো খুঁজবেন বা খুঁজে নেবেন সেই অংশ, যে অংশ কবি তাকে স্পর্শ করেছেন।

নইলে তো এদিনে মরে ভূত হয়ে যাওয়ার কথা এজরা পাউণ্ডের। তিনি তো ফ্যাসিবাদী ছিলেন। মুসোলিনীর সাথে তো সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথের। হিন্দু মেলার জন্যে তো লিখেছেন তিনি। শিবাজী উৎসবের মত কবিতাও তো তাঁরই। জীবনানন্দ তো শ্রমজীবী মানুষের জন্যে একছত্রও লেখেননি-আরও দূরের কথা বলি, ইমরুল কায়েস তো ইসলাম পূর্ববর্তী। তাই বলে আরবী সাহিত্য কি অস্বীকার করেছে তাকে? ওমর খৈয়াম তো শরাব আর সাকীর কথা বলেছেন-তাই বলে কোন ধর্মীয় নেতা নিষেধ করেছেন খৈয়াম চর্চার? গোর্কী-নেরুদা এঁরা তো মার্কসবাদী। তাতে কবিতার আসে যায় কতটুকু।

সুকান্ত কিংবা জীবিত সুভাষ মুখুজ্জের কথাই ধরি, এঁদের কবিতা তো পুরোটাই মতবাদের প্রতিফলন। যারা মার্কসবাদী নন, তারা কি কখনও পরাঙমু থেকেছেন এঁদের কাব্য পাঠে। কিংবা তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কবিতা? বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা কৃষ্ণ কি কাব্য আন্বাদনে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় কখনও?

কথা হল, এগুলো কোনটাই কাজের কথা নয়। এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বোকা এবং উদ্দেশ্য বাজরা।

ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নতুন মাত্রা যোজনায় কথাই বলি আর ধারা নির্মাণের বা টেকনিক প্রবর্তনের কথাই বলি-মোটকথা আমাদের অন্বেষণ যদি হয় টোটালিটির, তাহলে সেখানে অবিনশ্বর ফররুখ আহমদ। খণ্ডিত করে, বিচ্ছিন্ন করে কিংবা পরিত্যাগ করে সেখানে পার পাবার উপায় নেই।

এই প্রবণতার ধারক যারা তারা যে বেহুদা পরিবেশ কর্দমাক্ত করেছেন; সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন সাহিত্যের- তার একটা উদাহরণ দেই : একবার আমার এক তরুণ কবি বন্ধুকে (নামটা ইচ্ছে করেই বলছি না) বললাম, ফররুখ কেমন পড়ছে? সে আমাকে বলল, আমি ফররুখ পড়ি না। আমি বললাম, না পড়ার কারণ? বলল, ওঁতো ইসলামী কবি।

বললাম, ইসলামী কবি হোক আর যাই হোক তাতে তোমার কি? তোমার আহত হবে যে, সে তো কবিতা?

সে আমাকে বললো, তা হোক। আমি ফররুখের কাব্য পাঠ করে একটি বিশেষ বলয়ের খপ্পরে পড়ে অন্যদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজের লেখার বারোটা বাজাতে চাই না। বললাম, লেখার বারোটা, সে আবার কি জিনিস? উত্তরে সে যা জানাল তার সারমর্ম হল, এতে কোন কোন কাগজের সম্পাদক চটে গেলে, এই সব কাগজে তার লেখা ছাপা হবে না। আরও একটা বিষয়, তার তরুণ বন্ধুরা এ নিয়ে তাকে বিব্রত করতে পারে। এর কোনটাই তার কাজিত নয়।

অনেকে ক্ষেপে যেতে পারেন। অনেকে বলতে পারেন, আপনার তরুণ কবি বন্ধুটি একটি আস্ত কাপুরুষ। কিংবা হো হো হাসবেন এই উদ্ভট উক্তি শ্রবণ করে। তা যাই করুন এটাই নির্মম বাস্তবতা। এই অপ্রিয় বাস্তবতার সামনে দাঁড়াতে হবে- ভেতরে যত উন্মাদ বা উদ্বেগ যাই থাক। কারণ এত কেবলমাত্র একজন তরুণ কবির উক্তি নয়-এ একটা পুরো সময়ের চরিত্র। এই চরিত্রাধিকারীগণ কাপুরুষ হতে পারে। হতে পারে বেকুফ। হতে পারে ফাঁদে বন্দী। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অবস্থাটা তৈরী করে দিয়েছে আমাদের কৌন্দল এবং অপরিণামদর্শিতা ও হীনমন্যতাবোধ।

সাহিত্য বিচার শিকেয় তুলে, মূল্যায়নের কষ্টিপাথর ঝোলায় রেখে, আমরা হাওয়ায় দিচ্ছি তুড়ি। ফলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অবিচার- আর অবিচারের তো কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না। এ পতন ও পচন চলতে দেয়া যায় না। অবসান চাই কোলাহলের, কোলাহলে কাদা আর হীনমন্যতার জন্ম হয়। অতএব উত্থান চাই

নিজস্ব আত্মার ও আত্ম-মর্যাদার। এই জেনারেশনকে ঘরমুখে করবার কাজ তড়িঘড়ি চাই। নইলে সর্বনাশ ঠেকাবো কি দিয়ে ?

কবি হাসান হাফিজুর রহমান পশ্চিম বাংলার বাংলা সাহিত্যের প্রতি তুলনায় বলেছিলেন, “আমাদের সাহিত্য নিঃসন্দেহে দৃঢ়ভাবে বাস্তবের উপর নির্ভরশীল একটা স্বতন্ত্র ধারা। আমাদের সাহিত্যের সাথে ওপার কিংবা বাংলা অন্য যে-কোন দেশের সাহিত্যের রয়েছে একটা মৌলিক দূরত্ব। আমাদের জীবনযাত্রা-আমাদের সংগ্রামের ধারাও আলাদা। আমাদের এখানে ভাষা আন্দোলন হয়েছে, ৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান-’৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, মুসলিম লীগের সাথে আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব হয়েছে এখানেই, এখানে সামরিক শাসন এসেছে বার বার। ওখানে এসব নেই। ওখানে অন্য সমস্যা। এজন্য আমাদের সাহিত্য পৃথক সাহিত্য। যে-কোন দেশের সাহিত্যের ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন এক ভাষাভাষী হয়েও আমেরিকান সাহিত্য ব্রিটিশ সাহিত্য থেকে ভিন্ন।”- এ উদ্ধৃতি টানবার একটা বড় কারণ, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা যে, ফররুখ আহমদ আমাদের সেই স্বতন্ত্রধারার সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। যে-কোন কূটতর্কে এই সত্য যেন না হই বিস্মৃত। সেই নিরিখেই আত্ম-আবিষ্কারের মোহনায় উদ্ভাসিত হয়ে বিভ্রান্ত পাঠককে বলি।

“ভাঙে দরিয়ার আকীক তুফানে জীর্ণ প্রাচীন মন,/সবুজ ঘাসের শিয়রে বাতাস বয়ে যায় অনু’খণ/ভাঙে না নিত্য গড়ে নেয় মন নতুন মাটির ঘর-/কিশতীর মুখ খুঁজে ফেরে তার আশ্রয় বন্দর-

হাজার আঘাত গায়ে টেনে তাই বেসাতি করেছে পুরা।

কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার দরিয়ার বন্ধুরা।

কিশতীর মুখ ঘোরাও এবার দরিয়ার বন্ধুরা ...

## সংবর্ধনা

[ কবি ফররুখ আহমদকে ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' প্রদান করা হলে কবির অনুরাগীরা তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল তৎকালীন ঢাকা হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের একটি তথ্যবহুল বিবরণী প্রকাশ পেয়েছে দৈনিক সংগ্রাম-এ প্রকাশিত কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ'র ধারাবাহিক স্মৃতিচারণমূলক লেখা 'পুবালীর দিনগুলি'তে। সেই বিবরণীটি সংবর্ধনা শিরোনামে এখানে প্রকাশিত হলো। -প্রকাশক ]

আইয়ুব আমলে সরকারীভাবে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীদের স্বীকৃতি দান এবং তাদের পুরস্কার ও খেতাবে ভূষিত করার বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় এবং এ উদ্দেশ্যে নেয়া হয় বিভিন্ন ব্যবস্থা। রাইটার্স গীন্ডের প্রতিষ্ঠা এবং 'আদমজী', 'দাউদ' ও ই সেন্টেম্বর ইত্যাদি ভিন্ন ধরনের পুরস্কার প্রবর্তন সে আমলেরই ব্যাপার। অনেকক্ষেত্রে 'পুরস্কার' নিয়ে 'প্রহসন' হলেও দল-মত-নির্বিশেষে বহু প্রতিভাবান এবং খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবিও আইয়ুব আমলে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স', 'আদমজী', 'দাউদ' ইত্যাদি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন, বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হন। তবে অনেকেই প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পেলেও ষাটের দশকে এ ধরনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের জন্যে কবি ফররুখ আহমদকেই আনুষ্ঠানিকভাবে 'সম্বর্ধনা' দেয়া হয়। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিক ইতিহাসে এই 'সম্বর্ধনা' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা।

মনে পড়ে, ফররুখ আহমদ 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পেয়েছেন- এই খবর আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে বেশ আনন্দের সঞ্চার করে। দল-মত-নির্বিশেষে সবাই খুশী হন এই ভেবে যে, একজন প্রকৃত প্রতিভাবান ও কৃতী কবিকেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পুরস্কার দেয় হল। নাজিমুদ্দীন রোডের রেডিও অফিসে কিংবা আবন মিয়ার রেস্টোরাঁয় যারা ফররুখ আহমদের চারপাশ ঘিরে আসর গুলজার করে বসতেন, সেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেকেই ছিলেন ভিন্ন মতাদর্শের লোক। কিন্তু ফররুখ আহমদের উদর অভ্যর্থনা ছিল সবার জন্যেই অব্যাহত। এমন যে ফররুখ আহমদ তার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভে সবাই খুশী হবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক। তাই 'ফররুখ'

সম্বর্ধনার আয়োজনের পেছনে তমদ্দুন মজলিসের কিছু কর্মী এবং ‘ইসলামী’ পছী কবি-সাহিত্যিকদের উদ্যোগী ভূমিকা থাকলেও, অন্যদেরও তাতে শরীক হতে সেদিন বাধেনি। মনে পড়ে ফররুখ সম্বর্ধনা ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (বিমান দুর্ঘটনায় নিহত) ডক্টর মাহফুজুল হক, অধ্যাপক সিরাজুল হক চৌধুরী, ফারুক মাহমুদ এবং আরও অনেকে।

কবি ফররুখ আহমদকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা দেয়ার প্রস্ততি নেয়া হচ্ছে- এ কথা শুনে অনেক শিল্প-সাহিত্যিকই বিশেষ আনন্দিত হন, তারা সম্প্রাসরিত করেন সহযোগিতার হাত। এই সম্বর্ধনা প্রস্ততির ব্যাপারে আমরা কয়েকজন মিলিত হই কবি সিকান্দার আবু জাফরের তারাবাগের বাসায়- ‘সমকাল’ পত্রিকার অফিসে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম এবং আমরা আরও কয়েকজন। ব্যাপারটা নিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের সাথে আলাপ করি। ফররুখ সম্বর্ধনার কথা শুনে জাফর ভাই আনন্দে উল্লসিত হন, তিনি বিনা পয়সায় ‘সমকাল’ প্রেস থেকে মানপত্র ইত্যাদি মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দেন। যতদূর মনে পড়ে মানপত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজও তিনি বিনামূল্যে সরবরাহ করেছিলেন। আর এই মানপত্রটি লিখেছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বলাবাহুল্য, ‘সমকাল’ পত্রিকার সাথে ফররুখ আহমদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি এই পত্রিকায় লিখেননি বললেই চলে। নীতি ও আদর্শগত দিক থেকে সিকান্দার আবু জাফরের সাথেও ছিল তাঁর অনেক মত-পার্থক্য। কিন্তু এর কোন কিছুই এই দুই কবির গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সৌহার্দ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ফররুখ আহমদ ও সিকান্দার আবু জাফর শুধু ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকর্মীই ছিলেন না। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাঁরা ছিলেন অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রামের সহযাত্রী।

দল-মত-নির্বিশেষে শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ফররুখ-সম্বর্ধনা’ সেদিন সর্বতোভাবেই সফল হয়েছিল। যদিও অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে আমরা এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যেও পড়েছিলাম। অনুষ্ঠানের জন্যে নির্ধারিত সময় অনেকক্ষণ আগেই পেরিয়ে গেছে, ঢাকা হলের মিলনায়তন ভরে গেছে, দর্শক-শ্রোতা ও শিল্পী সাহিত্যিকদের আগমনে নির্ধারিত বক্তা এবং গায়ক শিল্পীরাও সবাই উপস্থিত। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদেরই দেখা নেই। যাঁর জন্যে এত আয়োজন তিনিই তখন পর্যন্ত গরহাজির। কিন্তু ফররুখ আহমদকে বাদ দিয়ে ‘ফররুখ-সম্বর্ধনা’ অনুষ্ঠান হবে কিভাবে? উদ্যোক্তারা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, মনে সন্দেহ জাগলো: ফররুখ ভাই হয়ত শেষ পর্যন্ত আসবেন না, তিনি অনুষ্ঠানটি পণ্ড করেই ছাড়বেন।

এই আশংকা মনে মাথাচাড়া দিতেই ডক্টর মাহফুজুল হক, ফারুক মাহমুদ এবং আরও কয়েকজন ছুটলেন ফররুখ আহমদের বাসায়। ফররুখ ভাই তখন থাকতেন কমলাপুর। অনুষ্ঠান শুরু হতে দেড়ী হচ্ছে দেখে দর্শক-শ্রোতারাও কিছুটা অস্থির হলেন, মঞ্চে ফররুখ আহমদকে দেখতে না পেয়ে অনেকেই হলেন বিস্মিত। এই বিস্ময়ের ঘোর কাটতেও বহুক্ষণ কেটে গেল। অনেকটা আকস্মিকভাবেই ফররুখ ভাইকে নিয়ে মাহফুজুল হক, ফররুখ মাহমুদ ও অন্যরা হলে প্রবেশ করলেন। কবিকে দেখেই দর্শক-শ্রোতারা করতালিতে মুখর হয়ে উঠলেন, ঢাকা হলের মিলায়তন যেন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে লাগল। আমরা দুশ্চিন্তা ঝেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, ফররুখ ভাই অনুষ্ঠানে আসার ব্যাপারে বেকে বসেছিলেন, তাঁকে রাজি করাতে ডক্টর মাহফুজুল হক ও অন্যান্যের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

ঢাকা হলে ফররুখ আহমদের এই ‘সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠান’ কোন বিরাট জমকালো ব্যাপার ছিল না। তবে ছোট্ট ও পরিচ্ছন্ন এই অনুষ্ঠানটি ছিল শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী দর্শক-শ্রোতা ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের আন্তরিক এবং সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার সফল। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে ‘পূবালী’র ‘সংস্কৃতি সংবাদ’ বিভাগে আমি যে দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখেছিলাম তার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে :

গত ১৫ই এপ্রিল (১৯৬১) ঢাকা হল মিলনায়তনে কবি ফররুখ আহমদকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানটি নানা দিক থেকে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্য সাধনার জন্যে সম্ভবতঃ এককভাবে এই প্রথম একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে দল-মত-নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠানগতভাবে কোন কোন সাহিত্যসেবীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলেও সার্বজনীন ঐক্যমতে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই সর্বপ্রথম একজন কবিকে সম্মানিত করা হল।

সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠান ফররুখ আহমদের সাহিত্য-সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক ডিরেক্টর জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, কবি আহসান হাবীব ও কবি আবুল হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই।

কবিকে অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া ও মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রটি পাঠ করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ফররুখ আহমদের ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কবি

শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বদরুল হাসান, সালমা চৌধুরী ও শবনম মুশতারী। ফররুখ আহমদ রচিত সঙ্গীতের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশিত গীতি-বিচিত্রায় অংশগ্রহণ করেন ফরিদা ইয়াসমীন, আবদুল লতীফ, আফসারী খানম, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, রওশনারা বেগম, ফজলে নিজামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আবদুল আহাদ। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক, শিল্পী ও সুধীবৃন্দসহ পাঁচ শতাধিক লোক যোগদান করেন। ফররুখ আহমদকে প্রদত্ত মানপত্রটি এখানে মুদ্রিত হলো :

## কবি ফররুখ আহমদ

আপনাকে সম্বর্ধনা জানানোর সুযোগ পেয়ে আজ আমরা একাধিক কারণে আনন্দবোধ করছি।

আপনি সেই মুষ্টিমেয় সাহিত্যসেবীদের একজন, যাদের সাহিত্যিক অভিনিবেশ ঐকান্তিক নিষ্ঠার বিশিষ্ট। সমকালীন সাহিত্যের পাঠক মাঝেই জানেন সেখানে যার রাজত্ব তার নাম নৈরাজ্য। নিরাসক্ত সাহিত্যসেবীর সংখ্যা অল্প। নিরঙ্কুশ আদর্শবাদ সর্বত্র সঙ্কুচিত। সাহিত্যিক মূল্যবোধে আস্থাও আজ ক্ষীয়মান। কোলাহল হয়ত বা আছে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সাধনা নেই। আসলের সঙ্গে নকল, খাঁটির সঙ্গে মেকির মিশ্রণে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে অল্প ক'জন সাহিত্যসেবী যারা মূল্যবোধের বুনিয়াদকে দৃঢ় করার সাধনায় অবিচলিত থেকেছেন, যাদের নিষ্ঠায় আমরা আমাদের ভবিষ্যতের আশাকে আলোকিত দেখেছি, আপনি তাঁদের একজন নন, আপনি তাঁদের অগ্রপথিক।

আমাদের সাংস্কৃতিক রুচিকে আর যা-ই হোক পরিশীলিত বলা কঠিন। সে রুচি একদিকে স্থবির গ্রাম্যতায় আচ্ছন্ন, অন্যদিকে উৎকেন্দ্রিক স্থূলতায় প্রকট। রুচিকে সংস্কৃত করার দায়িত্ব সাহিত্যসেবীর। সে দায়িত্ব পালনে সকল সাহিত্যিক সক্ষম হননি, অনেকে হয়ত তাকে দায়িত্ব বলেই মনে করেননি। আপনার সাধনায় আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক রুচিকে পরিশীলিত তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস দেখেছি। যে পথে এ সংস্কার সম্ভব বলে আপনি মনে করেছেন, যে পথে আপনি আলো ধরে চলেছেন তার বৈশিষ্ট্য বুঝি সকল সাহিত্যসেবীর পক্ষে প্রণিধানযোগ্য। ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞানের, উত্তরাধিকারের সঙ্গে নতুন অর্জনের সমন্বয়ে সে পথটি গঠিত। প্রবাহমান ঐতিহ্যধারাকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে আপনার সাহিত্য চর্চা নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিগন্ত খুঁজছে। স্থবিরতা নয়, উৎকেন্দ্রিকতার দুঃসহ দাহে যারা পীড়িত তাদের কাছে এ আত্মস্থ অবস্থা এক আশার খবর।

এ দেশের মননশীল পাঠক মহলে আপনার প্রতিভার স্বীকৃতি নতুন নয়, তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির সমন্বয় নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। আপনাকে সম্বর্ধনা জানাতে এসে আজ আমরা গৌরব বোধ করছি। কেননা, আপনার সম্মান তো আমাদের আশার সম্মান; আপনার সম্বর্ধনা তো আসলে আমাদের অগ্রসর চেতনারই সম্বর্ধনা।

আপনার জীবন দীর্ঘ হোক, নতুন নতুন সাফল্যে সমৃদ্ধ হোক-এই আমাদের কামনা।

ঢাকা

২রা বৈশাখ, ১৩৬৮

আপনার-

গুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও গুণগ্রাহীবন্দ



## শেষ অভিবাদন

[কবি ফররুখ আহমদের ইন্তেকালের পর জাতীয় পত্র-পত্রিকায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে-সকল সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সেগুলো এখানে ‘শেষ অভিবাদন’ শিরোনামে পত্রস্থ করা হল উল্লেখ্য, এর বাইরেও ‘The people’ সহ সে সময়ে প্রকাশিত একাধিক সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় সংগ্রহ করতে না পারায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। -প্রকাশক ]



## পরলোকে ফররুখ আহমদ

দৈনিক আজাদ

অকস্মাৎ শরতের সুনীল আকাশের বুক চিরে বজ্রপাত হল। আমরা জানলাম বাংলার কাব্যঙ্গন থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপটি নিভে গেল। কবি ফররুখ আহমদ চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। সাত সাগরের মাঝি বহু ক্লাতির সমুদ্র পার হয়ে এসে অনন্ত বিশ্বামের নিবিড়ে আচ্ছন্ন হলেন। হয়তো একদিন ‘আবার’ পর্দা পেরিয়ে ভোর হবে, নারাংগী বনে সবুজ পাতা কাঁপবে প্রাণরসে থির থির করে। সাত সাগরের উত্তাল কলরোল এসে আঘাত হানবে দুয়ারে, কিন্তু মাঝির ঘুম আর ভাঙ্গবে না। ফররুখ আহমেদ আজ নেই। অন্ধকার এসে গ্রাস করেছে আলোকের উদ্দাম বিহঙ্গকে। যে বিহঙ্গের কণ্ঠে নিয়ত ধ্বনিত হয়েছে গান কবিতা ছড়া আর সনেট। যে কণ্ঠে শুনেছি শিশুর মত সরল হাসি, সে কণ্ঠ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর কোনদিনও কাকলীমুখর হয়ে উঠবে না।

একথা সবাই জানেন, কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর প্রবক্তা। সত্যি বলতে কি কাজী নজরুল ইসলামের পর মুসলিম কবি হিসাবে ফররুখ আহমদই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দাবীদার। তিনি ইসলামিক ভাবধারার অনুসারী হলেও তাঁর মতাদর্শ কখনই তাঁর কবিসত্ত্বকে সর্কীর্ণতায় আবদ্ধ করতে পারেনি। সেই জন্যই তাঁর কবিতায় মানবতার বাণী হয়েছিল সোচ্চার। দুর্ভিক্ষের বছর তেরশো পঞ্চাশ। সেই মহামনুষ্যের পটে লেখা তাঁর লাশ কবিতা আজকের এই চুয়াসত্তরের বাংলার পটে উচ্চারিত হয়ে উঠেছে পুনর্বীর-

“পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে শাসনে সাক্ষ্য তার

রাজপথে জমিনের পর।

সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অস্তিম কবর।

পড়ে আছে মৃত মানবতা

তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে

আকাশ অদৃশ্য হল

দাস্তিকের খিলানে গম্বুজে

নিত্য স্ফীতদর এখানে মাটিতে এরা

মুখ গুঁজে মরিতেছে ধরণীর পর।”

পঞ্চাশের মননস্তর আর চূয়াস্তরের দুর্ভিক্ষের শবের মিছিলে সেই কবির বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছে; পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ এবং অনাচারের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ।

কবির ‘সিন্দাবাদ’, ‘ডাহুক’, ‘সাত সাগরের মাঝি’ ও ‘পাঞ্জেরী’ এগুলো বাংলা সাহিত্যের প্রথম পঙক্তির অনুপম কবিতাগুলিরই মাঝে আসীন আপন কাব্যগুণ ও সৌন্দর্য্যে।

ছাত্রজীবন থেকেই এই কবি পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ‘পরিচয়’, ‘চতুরঙ্গ’ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাময়িকী-গুলোতে একনাগাড়ে তাঁর অজস্র কবিতা ও সনেট প্রকাশিত হয়ে চলেছিল। প্রায় এক হাজারেরও বেশী সনেট তিনি রচনা করেছেন। উভয় বাংলায় এই একটি ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু সংখ্যাতেই নয় কাব্যগুণেও তাঁর সনেট তুলনাহীন। সর্বোপরি রচনাভঙ্গী অত্যন্ত মৌলিক ও সৃজনশীলতার পরিচয়ে সমৃদ্ধ। নতুন নতুন শব্দ উপমার ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। গেটের মহাকাব্যের আঙ্গিকশৈলীতে সজ্জিত করে তিনি রচনা করলেন ‘হাতেম তা’য়ী। শিশু-সাহিত্যেও তাঁর দান রয়েছে অসীম। তিনি লিখেছেন এবং লিখেই চলেছিলেন। এখনও তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে বাইশখানা।

ফররুখ আহমদ একজন বড়কবি একথা যেমন সত্য, তার চেয়েও অধিকতর সত্য তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। সেই ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্য্যাদা বোধকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে তাঁকে আত্মত্যাগ দুঃসহ দারিদ্র্য হতে হয়েছে নিষ্পেষিত। কিন্তু কখনও ওপর তলার দাক্ষিণ্যের দুয়ারে হাত পেতে নিজেকে তিনি খাটো করেননি এতটুকু। ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে ক্ষমতার রোষানলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। আবার আইয়ুব শাহীর শেষ পর্য্যায়ের একটি সরকারী খেতাবও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সে পারিতোষিক তিনি গ্রহণ করেননি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমরা তাঁর এই মহৎ ত্যাগকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তাঁকে রেখেছিলাম কোণঠাসা করে। চরম অবমাননা ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আবর্তের মধ্যে নিপতিত কবি বুঝি সেই অভিমানেই এমন নীরবে বিদায় নিলেন। দারিদ্র্যক্লিষ্ট কবি দীর্ঘকাল রোগে-অনাহারে জর্জরিত হলেন। কিন্তু আমরা নির্লিপ্ত ঔদাসীণ্যে দূরে সরে রইলাম। আর আত্মমর্য্যাদাশীল কবি তিলে তিলে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর দিকে। সবার অলক্ষ্যে খসে পড়লেন জীবনের বৃত্ত থেকে। আজ আমরা ক্ষমা চাইব কি সেই মহান ব্যক্তিত্বের কাছে? কিন্তু কোন্ মুখে? মাত্র ছাপান্ন বছর বয়সে যে অনন্য প্রতিভা হারিয়ে গেলেন আমাদেরই সবার অবহেলা ও সহানুভূতিহীনতার বিষ কণ্ঠে ধারণ করে। কিন্তু সেই

নীলকণ্ঠ নিঃসৃত অমৃত আমরা প্রতিনিয়ত পান করে চলেছি অঞ্জলিভরে?

আর একবার ধৃষ্ট স্পর্ধায় তবু ক্ষমা চাই  
আর একবার বলি শাপিত হোক তোমার  
লেখনী । ধ্বনিত হোক তোমার কণ্ঠে-

“হে জড় সভ্যতা !

মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষণক সমাজ  
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ  
তারপর আসিলে সময়  
বিশ্বময় তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে

পদাঘাত হানি

নিয়ে যাব জান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি,  
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু দীর্ণ  
নিখিলের অভিশাপ বও  
ধ্বংস হও । তুমি ধ্বংস হও॥”

[ ২২ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধ ]

# কাব্যলোকে তিনি মৃত্যুহীন

দৈনিক বাংলা

ফররুখ আহমদ আর নেই। কবিতার আকাশ থেকে ঝরে পড়ল উজ্জ্বল একটি জ্যোতিষ্ক। তমিস্রা হনন করল আলোর সেই শিখাকে, বাঁকা তলোয়ারের মত ছিল যার তেজ এবং প্রভা। আলোর সেই বিহঙ্গ আর গান গাইবে না, যার সুর, ছন্দ এবং কবিতা আনন্দের আপন একটি ভুবন সৃষ্টি করেছিল বাংলা সাহিত্যের বাগানে। হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হলেন ‘সাত সাগরের মাঝি’র সেই অসামান্য শক্তিমান কবি, যার অস্থি ছিল মুক্তির আলোকিত একটি বন্দর। যেখানে ক্ষুধিত কোন মুখ হানবে না নীরব দ্রুপদ। যেখানে কালো পীচ-ঢালা পথে পড়ে থাকবে না ক্ষয়িত কোন লাশ। মানুষের অস্তিম কবর রচনা করবে না যেখানে ধনিকের গর্বিত সম্পদ। দারিদ্র্য এবং মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে যে কবি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠ, তারই নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় ক্ষয়িত হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন তিনি নিঃশব্দে। এ দুঃখ অর্নিবার। এই শ্রেষ্ঠ কবির মৃত্যু গোটা বাংলা সাহিত্যকেই দরিদ্র করে দিয়ে গেল না, সেই সঙ্গে এই সাহিত্যের কবিকুল, লেখক আর পাঠকদের আকীর্ণ করল এমন এক আত্মগ্লানিতে যা কখন স্থালন করা যাবে না।

একথা সত্য, কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর প্রবক্তা। কিন্তু তাহলেও তাঁর মতাদর্শ তাঁর কবিস্বপ্নাকে আবদ্ধ করেনি ক্ষুদ্রতার গণ্ডিতে। গ্রাস করেনি তাঁর কাব্যলোকের সৌন্দর্য এবং শিল্পচেতনাকে। সবকিছুর ওপর তিনি ছিলেন একজন কবি। মহৎ এবং খাঁটি সৃজনশীল কবি। তাঁর কবিতার বাণী ছিল মানবতার বাণী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ওপর লেখা তাঁর ‘লাশ’ কবিতা পুঁজিবাদী পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তাড়িত শহরের রাজপথে মৃত শিশুর লাশ এবং ক্ষুধিত মুখের নীরব যন্ত্রণা রক্তাক্ত করেছিল কবির মানবিক বোধ আর বিবেককে। কবির ‘ডাঙ্ক’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পঙ্ক্তির উচ্চারিত অনুপম কবিতাগুলির একটি। তাঁর সাত সাগরের মাঝি, পাঞ্জেরী, শতাব্দী, রাত্রিশেষের কাহিনী, ফেরদৌসী প্রভৃতি কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে একজন সমাজ-সচেতন কবির প্রবল প্রত্যয় আর সুগভীর মানবিক মূল্যবোধ।

ছাত্রজীবনেই একজন প্রতিভাধর কবি হিসেবে অবিভক্ত বাংলায় প্রখ্যাত হয়েছিলেন ফররুখ আহমদ। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ মাসিকপত্র, প্রগতিশীল

সাহিত্য পত্রিকা ‘পরিচয়’, হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত ‘চতুরঙ্গ’ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাময়িকীতে একনাগাড়ে প্রকাশিত হচ্ছিল তাঁর সনেট এবং উচ্চাংগের কবিতাগুলি। তাঁর সনেটের সংখ্যা এক হাজারের বেশী। উভয় বাংলায় এই একটি ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিতার আঙিনায় নতুন নতুন শব্দের এবং শৈল্পিক প্রয়োগ নিরীক্ষা ফররুখ চিহ্নিত অবদান। পুঁথি সাহিত্যের জগৎ এবং গ্রাম্য কথকতা থেকে সুনির্বাচিত শব্দমালা উদ্ধার করে অসাধারণ পারঙ্গুতার সঙ্গে ব্যবহার করেন তিনি কবিতায়। উপমার ব্যবহারেও তিনি পরিচয় দিয়েছেন অসামান্য সৃজনশীলতার এবং মৌলিকত্বের। গ্যেটের মহাকাব্য ‘ফাউন্টের’ আঙ্গিকশৈলীতে বাংলা ভাষাকে তিনি উপহার দিলেন ‘হাতেম তা’য়ী’ মহাকাব্য। ব্যঙ্গ কবিতা, সঙ্গীত, ছড়া, রূপক নাটক এবং শিশু-সাহিত্যেও এই কবির অবদান সুপ্রচুর। তাঁর বাইশখানি পাণ্ডুলিপি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

ফররুখ আহমদের কবি-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। আমৃত্যু তিনি বাস করেছেন দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু কখন তিনি ওপরতলার দাক্ষিণ্য, লোভ কিংবা প্রাপ্তিযোগের মোহের কাছে নিজের কবিসত্তাকে খাটো করেননি। ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপাশ্রয় কবিতা লিখে ক্ষমতার রোমানলে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। একষট্টি সাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রকাশনা। ওই সময় ছদ্ম-নাম নিয়ে কাব্যচর্চা করতে হয় কবিকে। আইয়ুবী আমলের শেষ পর্যায়ে একটি সরকারী খেতাব দেয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সেই পারিতোষিক নিতে অস্বীকার করেন তিনি। ভাষা আন্দোলনের সময়ে তাঁর কবিসত্তায় সঞ্চারিত হয়েছিল বিদ্রোহ। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে পরিবর্তন আসে ফররুখ আহমদের চিন্তার বলয়ে। তিনি হন ধর্মনিষ্ঠ এবং একান্ত আদর্শব্রতী। তাঁর ভাবনার সঙ্গে অনেক কবিরই স্পষ্ট মতপার্থক্য ঘটে। কিন্তু তাহলেও কোন সুবিধে লাভের মোহে নিজের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি তিনি। ইচ্ছে করলে ঋতুর পাখির মত ভোল পাল্টিয়ে সুখের নিরাপদ নীড় রচনা করতে পারতেন কবি। কিন্তু এ সুখের বদলে নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্যকেই তিনি নিলেন বরণ করে। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। এমন চরিত্রবান কবি এ যুগে বিরল। এই একটি কারণে মতনির্বিশেষে সকল মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় নন্দিত হবেন কবি।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ, এমন একজন ব্যক্তিত্বশালী শ্রেষ্ঠ কবিকে বাংলা সাহিত্য হারাল অকালে। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে। রোগশয্যায় মাইকেল মধুসূদনের মত আমাদের সবার অলক্ষ্যে চরম দুর্গতির মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সারা

বাংলার এমন এক জন মহান কবিশিল্পী। এ দুঃখ রাখবার ঠাই নেই কারো। নিজের জীবনে কবি আমাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হলেও এ অনুদারতার কিছুমাত্র স্থালন হতে পারে তাঁর পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনে।

কবি বলেছেন শেষ আছে সকলের ; শুধু একা অন্তহীন কাল, তিনি নিজে আজ সে অনন্ত লোকের যাত্রী। কিন্তু তাঁর কবিতাকে স্পর্শ করতে পারবে না মৃত্যু-এটাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। অনন্ত শান্তি লাভ করুক তাঁর আত্মা (ইন্সালিল্লাহে ..... রাজেউন)।

[২১ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয় নিবন্ধ।]



## লোকান্তরে ফররুখ আহমদ

### দৈনিক সংবাদ

বিশিষ্ট কবি ফররুখ আহমদ লোকান্তরিত হয়েছেন।

চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে প্রথমে একজন প্রখর আধুনিকতাবাদীরাপে এবং পরে ইসলামী জীবনদর্শনের প্রবক্তারূপে কবি ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতায় আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন যশে এবং কৃতিত্বে। তাঁর বক্তব্যে ছিল দুই পর্যায়েই তীব্রতা, শক্তি এবং প্রবলতা। ষাটের দশকে তিনি বয়সে এবং লেখার ধারায় প্রবীণদের মধ্যে গণ্য হতে শুরু করেন। তবে সমসাময়িক জীবনের পটে তাঁর উপস্থিতির তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেলেও তাঁর লেখনী থামেনি। প্রায় চার দশক ধরে লেখা তাঁর কবিতা একে একে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছিল ষাটের দশকে। কবির কাজের এটা অংশ মাত্র। কবির মৃত্যুর পরে জানা গেল, তিনি যে পাণ্ডুলিপি রেখে গিয়েছেন তাতে ২২টি কবিতাগ্রন্থ হতে পারে।

দ্বন্দ্বাত্মক গতিময় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বেরিয়ে আসা যে বাংলা কবিতার ধারা, তার মধ্যে কবি ফররুখ আহমদ যে বিতর্কমূলক অবস্থান নিয়েছিলেন, আমরা সেটিকে দেখব জঙ্গম বিচার পদ্ধতিতে। এভাবে তাঁর সৃষ্টিকে আমাদের কাব্য-জগতে মণিমঞ্জুর মধ্যে রাখতে হবে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূল্যায়ন দ্বারা। কবি ফররুখ আহমদ মহাকাালের প্রতীককে শেষের দিকে বেশী ব্যবহার করতেন।

আমরা আমাদের দৃষ্টিতে একে বলব অগ্রসর কাল। আজ লোকান্তরিত কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা বলব, অগ্রসরকালের কষ্টিপাথরে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাই বহমান জীবনের কবিতা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

এই প্রসঙ্গে আজ যে কথা অনেকেই বলছেন, আমরাও সেই কথাই বলবো। প্রথম যৌবনের আধুনিকতাবাদী কবি হিসাবে তিনি যা লিখেছিলেন, তাই আমাদের অগ্রসরকালের কাছাকাছি।

এই ধারাটিকে তাঁর পরিণত জীবনেও ফাল্গুনধারাররূপে পাওয়া যেতে পারে। এই ফল্গুনধারাকে বার করে আনার জন্যেও প্রয়োজন হবে সামগ্রিক মূল্যায়নের।

আমরা কবির বিয়োগবিধুর পরিবার-পরিজনকে জানাই সমবেদনা ও সান্তনা।

[২২ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধ।]

## ফররুখ আহমদ

### দৈনিক পূর্বদেশ

কবি ফররুখ আহমদ আর ইহজগতে নেই (ইন্না লিল্লাহ ..... )। মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত এই শক্তিমান কবির সমগ্র কাব্য আলোচনার সময় এবং স্থান এটা নয়। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, কাজী নজরুল ইসলামের পরে বাংলা সাহিত্যে যে ক'জন সত্যিকার প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব ঘটে ফররুখ আহমদ ছিলেন তাঁর অন্যতম। ১৯৪৩-৪৪ সালে তাঁর অমর কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতাগুলো রচিত হয় এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংগে সংগে তিনি বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে তাঁর খ্যাতি তৎকালীন বাংলায় শুধু নয় সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 'তেরোশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পরিবেশে রচিত তাঁর 'লাশ'-এর তুল্য সরল ও সোচ্চার কবিতা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় একটি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সিন্দাবাদ, ডাহক প্রভৃতি কবিতায় কলুষকালিমায়ুক্ত পুতিগন্ধময় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে দুঃসাহসের সাথে বর্জন করে কর্পুরের সুগন্ধবহ সুস্থ সবল নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে যে উদাত্ত আহ্বান তিনি সে সময়ে জানান আজকের দিনেও তা সমান অর্থবহ। 'ডাহক' শেলীর বিখ্যাত কবিতা স্কাইলার্ক এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অসংখ্য সনেটেরও লেখক ফররুখ আহমদ। যদিও কবিরূপেই সমধিক পরিচিত তবু সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি। তাঁর 'মৃত বসুধা' নামক গল্প, 'রাজ-রাজড়া' নামক প্রহসন নাটক এবং হায়াত দরাজ খাঁ ছদ্মনামে লিখিত শ্রেষ্ঠাত্মক কবিতাবলী বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। শিশুদের জন্যে কবিতা রচনায়ও ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন পরম আদর্শ নিষ্ঠা পুরুষ। খ্যাতি ও নিন্দা উভয়ের প্রতিই তিনি ছিলেন পরম উদাসীন। আদর্শ ও বিশ্বাসের সাথে কখনও এক চুল পরিমাণ আপোষ করেননি। তাঁর এই আদর্শনিষ্ঠা ছিল বিস্ময়ের বস্তু। দারিদ্র্যকে তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টান্ত তিনি। অর্থ, বিত্ত, সম্মান প্রভৃতির প্রতি ছিল তাঁর সজ্ঞান উপেক্ষা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর বিশ্বাসে ছিলেন অটল। সদা হাসিমুখ এই কবির মুখ হতে কখনও ব্যক্তিগত অভিযোগ শোনা যায়নি, কিন্তু সর্বপ্রকার

সামাজিক অনাচার এবং ভণ্ডামি মোনাফেকির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আজীবন সমান সোচ্চার। ১৯৪৩ সালে তিনি লিখেছিলেনঃ

হে জড় সভ্যতা

মৃত সভ্যতার দাস স্বীতমেদ শোষক সমাজ,

মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ,

তারপর আসিলে সময়

বিশ্বময়

তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি,

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি,

আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ঘ নিখিলের

অভিশাপ লও ॥

ধ্বংস হও

তুমি ধ্বংস হও।

আমরা গভীণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর লেখার উদ্ধৃতি দিয়েই তাঁর লোকান্তরিত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি।

[ ২১ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ ]

# কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুতে

দৈনিক জনপদ

কবি ফররুখ আহমদ আর ইহজগতে নেই। গত শনিবার রাত্রে তিনি ঢাকার ইসকাটন গার্ডেন রোডস্থ তাঁর বাসভবনে ইস্তেকাল করেছেন (ইন্না ..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। গত কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসায় তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির পরিবর্তে ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে। শনিবারের দিকে স্বাস্থ্যের এই ক্রমাবনতিই এক গুরুতর রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পরলোক গমন করেন।

কবি ফররুখ আহমদ মারা গেলেন। কিন্তু রেখে গেলেন সাহিত্য সাধনা, বিশেষ করে কাব্য-সাহিত্যের সাধনার ক্ষেত্রে এক অমর স্বাক্ষর। নজরুল-পরবর্তী যুগে তিনি ছিলেন অন্যতম মৌলিক প্রতিভা। সনেট, ছড়া, গীতি-বাংলা সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে তাঁর এই প্রতিভার নিদর্শন। বাংলা ভাষা তাঁর চাইতে এতবেশী সনেট আর কেউ লেখেন নি। সাহিত্য সাধনা করতে গিয়ে তিনি বুদ্ধদেব বসু, হুমায়ুন কবীর, সুধীন দত্ত প্রমুখ সাহিত্যরথীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁদের সম্পাদিত পত্রিকায় তাঁর অবদান রাখেন। আজকের এই যুগের নিরিখে এক স্বতন্ত্র ভাবাদর্শের কবি হলেও তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্য ও কবিতা পাঠক মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পঞ্চাশের মনস্তরকে নিয়ে লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাবাদর্শ যাই হোক, তিনি যে যুগ ও সমাজ-সচেতন কবি ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হল, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা এবং কামনা করি তাঁর আত্মার জন্যে চিরশান্তি।

[২১ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে দৈনিক জনপদে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ।]

# একজন কবির মৃত্যু

দৈনিক গণকণ্ঠ

গত শনিবার বিকেলে হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ায় কবি ফররুখ আহমদ লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের এই কৃতি কবির পরিচয় নতুন করে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্যের কাব্য-সম্ভার যে ক'জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর লেখনীস্পর্শে সম্বীর্ণিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে ফররুখ আহমদ ছিলেন তাঁদেরই একজন। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়স হয়েছিল এই কবির। এই মৃত্যুকে আমরা অপরিণত বয়সের মৃত্যুই বলতে চাই। তাঁর কাব্য-সম্ভার যদিও রূপণ ছিল না, তবুও কাব্যমোদীদের প্রত্যাশা ছিল, তিনি আমাদের কাব্য-সাহিত্যকে ফল সম্ভারে আর সমৃদ্ধ করে যাবেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আর একটি শূন্যতা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এতবড় একজন কবি। অথচ সাংসারিক জীবন-যাপনে তাঁকে অনেক দুঃখ সহিতে হয়েছে। তিনি যখন মারা যান, তাঁর ইস্কাটনের সরকারী ফ্ল্যাট বাড়ীতে জন্মে ওঠে অসংখ্য অনুরাগীর ভীড়। বেশ কিছুসংখ্যক কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীও শোক জ্ঞাপন করতে গিয়েছিলেন সেই অনাড়ম্বর কবিগৃহে। কিন্তু ফররুখ আহমদ বেঁচে থাকতে তাঁর দুঃখ-কষ্ট ও তাঁর প্রতি সরকারী উদাসীনতার প্রতিবাদ কারর মুখেই তেমন শোনা যায়নি।

ফররুখ আহমদকে কেউ কেউ বলেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি। এ কথাটি আংশিক সত্য হলেও স্বীকার করতে হবে যে, শুধু একটি মাত্র অভিধায় তাঁর প্রতিভা যাচাই করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ কাজী নজরুল ইসলামের পর যে ক'জন শক্তিশালী কবি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। ইসলামী রেনেসাঁর প্রবক্তা বলে উল্লেখিত হলেও তাঁর মতাদর্শ কখনও অতিক্রম করেনি তাঁর কবি-সত্ত্বাকে। তাঁর এই সংবেদনশীল মানবতাবাদের প্রতিফলন রয়েছে পঞ্চাশের মনস্তরে রচিত কতিপয় উৎকৃষ্ট পঙ্ক্তিমালায়। তাঁর লাশ কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় পুঁজিবাদী অন্ধতার অভিষাপকে তিনি কি রকম ঘৃণা করতেন। তাঁর সাত সাগরের মাঝি, ডাহুক, পাঞ্জেরী প্রভৃতি কবিতায় একজন খাঁটি কবির মনোভাবই শিল্পময় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়, তাঁর একাধিক পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্তও প্রকাশিত হয়নি। যেখানে 'খাতা মানেই বই' এবং সাক্ষর অর্থ 'লেখক' সেই

ফররুখ আহমদ ১৩৩

দেশে একজন বড় কবির সৃষ্টির প্রতি প্রকাশকদের উৎসাহহীনতা অবশ্য স্বাভাবিক।

মর্যাদাবোধ অটুট ছিল কবি ফররুখ আহমদের। তাই সস্তা প্রচারের লোভে কখনও লালায়িত হননি। তৎকালীন পাক-শাসক চক্র এই কবিকে আদৌ সুনজরে দেখতেন না। তাঁর রচনা একদা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নিষ্ঠুর অর্থাভাবে তিনি বিপর্যস্ত ছিলেন, তবুও আইয়ুবী আমলের পারিতোষিক ও পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনি হয়। নির্লোভ ও সততাসম্পন্ন মানুষই এমন অকালে চলে যায়।

আমরা কবি পররুখ আহমদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

[২২ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ।]

## Poet Farrukh Ahmed

### The Bangladesh Observer

Poet Farrukh Ahmed prematurely bade fareWell to his own self. The end came unexpectedly at the age of 56 creating a Void which will not be filled.

It is not 'a journey to oblivion' A major poet, the Warm glow of his poetic genius will continue to shine long after the brief glitter of negligible poetry has faded away.

He first attracted attention with the publication of his poems in such highbrow magazines like 'Kabita' edited by Buddhabeu Basu, 'Arani' edited by Premendra Mitra, 'Chaturanga' edited by Humayun Kabir and 'Parichoy' edited by Sudhin Dutta. Widely respected as a poet of Muslim renaissance in the post-Nazrul period, he was also a prolific Writer of songs and nursery rhymes and composed the largest number of sonnets in Bengali, Never content with the prevailing way of seeing and expressing ideas he tried innovations with the result that his language and form of expression gave the impresion of something entering literature.

He did not seem to believe in art for art's sake. He let it serve a great purpose- regeneration of values.

[ ২১ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে দি বাংলাদেশ অবজারভার-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ]

# জীবন সাগরের সিন্দাবাদ

সাপ্তাহিক চিত্রালী

এ ঘুমে তোমার মাঝি-মান্নার  
ধৈর্য নাইকো আর  
সাত সমুদ্র নীল আক্রোশে  
তোলে বিষ ফেনভার  
এদিকে অচেণা যাত্রী চলেছে  
আকাশের পথ ধরে  
নারঙগী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা  
বেসাতী তোমার পূর্ণ করে কে  
মারজানে মরমরে ।  
ঘুমঘোরে তুমি শুনছো কেবল  
দুঃস্বপ্নের গাঁথা  
তবু জাগলে না?  
তবু তুমি জাগলে না ?

আহা ! যে মানুষটি এই পঙ্কজিগুলোর উদ্গাতা, যে মানুষটি লেখনী ধারণ করেই তাকে মানবতার সপক্ষে মসিরূপে ব্যবহার করেছেন অনবরত এবং যে মানুষটি সর্বদা ঘুম ভাঙ্গার গন গেয়েছেন তিনিই কিনা আমাদের অগোচরে চিরদিনের ঘুমে ঘুমিয়ে গেলেন মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে । কোনো অনুযোগ রেহে গেলেন না-কোন উচ্চারণে কর্ণ বিদীর্ণ করলেন না । যেন যেমন নীরবে একদা পৃথিবীতে এসেছিলেন তেমন নীরবেই চলেও গেলেন ।

জীবনভর দারিদ্র্য আর অভাব অন্তর্জ্বালা আর অবহেলার শিকার হয়ে মরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কবি ফররুখ আহমদ প্রমাণ রেখে গেলেন জাগতিক হলাহল আর ক্ষুদ্রস্বার্থের কালিমা স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর অন্তরাঙ্গা ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বেগবান স্রোতধারায় ফররুখ আহমদ ছিলেন সিন্দাবাদ । জীবনসাগরের দুর্দান্ত মাঝি । ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে তাই তাঁর অবেশা মুক্তির আলো উদ্ভাসিত বন্দরের দিকে । অক্লান্ত, অকুতোভয়, আদর্শবাদী । আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা যে কোন মতাবলম্বী শিল্পীর জন্যে শ্রদ্ধাবহ প্রেরণা । বন্দরে বন্দরে



সমৃদ্ধির নানা পোশাক পরে পবন অনুযায়ী তরী বহাতে পারতেন কবি। কিন্তু চরিত্রিক দৃঢ়তার জন্যে নির্মলতার কারণে ফররুখ আহমদ তুচ্ছজ্ঞান করলেন সহজ সুখ আর সহজ সমৃদ্ধিকে। তাই তো সরকারী খেতাব অগ্রাহ্য করবার সাহস তাঁরই হয়। ফররুখ আহমদের মৃত্যু তাদের জন্যে কি নয় চাবুক, যারা বুদ্ধিকে মূলধন করে বেসাতীর পক্ষে অবগাহন করে?

একালের এই মহৎ সংস্কৃতিসেবী কবিকর্মীর কাব্য কালাতীত- মৃত্যুহীন এই কবি কাব্যসাগরে। জীবনসাগরের এই দুরন্ত সিন্দাবাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

[২৫ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে সাপ্তাহিক চিত্রালী পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ।]



# আমাদের কথা

ঢাকা ডাইজেস্ট

মানুষ মরণশীল। মৃত্যু মাত্রই বেদনাদায়ক কিন্তু চুয়াস্তরের দুর্ভিক্ষ পীড়িত এই বাংলায় মৃত্যুর মিছিল আমাদের সে বেদনার অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। কারণ, এক কালজয়ী কবি-প্রতিভা ফররুখ আহমদকেও শেষ পর্যন্ত শরীক হতে হয়েছে এই মৃত্যুর মিছিলে। এতবড় একজন কবির প্রতি আমরা যে অবহেলা ও ঔদাসীন্যতার পরিচয় দিয়েছি তা জঘন্য অপূরাধের শামিল। একটা জাতীয় প্রতিভার প্রতি এহেন অবমাননা কি আমাদের জাতীয় চরিত্রেরই জঘন্যতার পরিচায়ক নয়?

যুগে যুগে দেশে দেশে যারা মৌলিক প্রতিভা নিয়ে জন্মান তাঁরা নিজেদের সৃষ্টির মাধ্যমেই বেঁচে থাকেন অনাদিকাল। কোন প্রতিকূলতাই তাঁদের সৃষ্টির লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করতে পারে না। কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন এমন এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তিনি ছিলেন মানবতার কবি। আর মানবতাবাদ সকল দল-মত পার্থক্যের উর্ধ্বে এক চিরন্তন আদর্শ। কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন সেই আদর্শেরই স্বার্থক রূপকার।

কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বেদনামখিত প্রাণে শুধু এই জিজ্ঞাসাই বারবার মূর্ত হয়ে ওঠে; একটি কালজয়ী প্রতিভাকে মৃত্যুর হিমশীতল পথে তিলে আমরা যারা ঠেলে দিলাম, তারা কি অনুরূপ একটি প্রতিভার স্মরণ ঘটাতে পারব? যদি না পারি তবে প্রতিভার প্রতি এমন ক্ষমাহীন অনাদর কতকাল-আর কতকাল?

[ দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭৪ এর মাসিক ঢাকা ডাইজেস্ট-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ]

## আমাদের কথা মাসিক মদিনা

মুসলিম রেনেসাঁর নকীব, সাত-সাগরের স্বাপ্নিক সিন্দাবাদ কবি ফররুখ আহমদ আর নাই। দুঃসহ দারিদ্র্য ও কৃচ্ছতার জীবন তাঁহাকে রেহাই দিয়াছে। এখন তিনি এমন এক জগতের বাসিন্দা, যেখানে সত্য সাধনার ‘অপরাধে’ কাহাকেও কারবালা ময়দানের বুকফাটা হাহাকার বরণ করিতে হয় না। আদর্শদৃষ্ট চির উন্নত শির হোসাইনের মত কলিজার তণ্ড খুন ঢালিয়ে যেখানে সত্য-ন্যায়ের চির উত্তম রাজপথটি যুগে যুগে সিক্ত করিয়া পথ চলিতে হয় না। আদর্শের ক্ষেত্রে, এমনকি ধর্মনির শিরায় শিরায় ফররুখ আহমদ ধারণ করিতেন হোসাইনী রক্তেরই প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই শহীদানে-কারবালার চিরপরিচিত পথে জীবন দান করিয়া তিনি সেই পবিত্র রক্তের মর্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ঢাকার ইবনে জিয়াদেরা তাঁহার সেই আত্মদানে তৃপ্ত হইয়াছে কিনা, সেই খবর আজ আমরা নিতে পারিব না। তবে, আমরা যাহারা আদর্শের প্রতি আনুগত্য পোষণ করিয়াও সংগ্রামের ময়দানে মৃত সৈনিকের ভূমিকায় তুষ্ট আছি, ফররুখ আহমদের আত্মদানের খবরে তাহাদের অসহায় দুই চোখে কয়েক ফোটা তণ্ড অশ্রু উঁকি দিয়াই হয়ত ত্রাসে আতঙ্কে শুকাইয়া গিয়াছে। সত্য বলিতে গেলে, প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করার হিম্মৎটুকুও যেন আজ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

ফররুখ আহমদ চলিয়া গিয়াছেন। ইসলামের বিপ্লবী আলেখ্য অঙ্কনে সদাব্যস্ত তাঁহার সেই বলিষ্ঠ কলম চিরদিনের মত থামিয়া গিয়াছে। মাহবুব খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই পরম ভক্তের কণ্ঠে আর কোনদিন ‘সিরাজাম মুনীরা’র আবগেভরা আবৃত্তি উচ্চারিত হইবে না। ‘হেরার রাজ-তোরণ’-এর দিকে এমন দরাজ কণ্ঠে বুকি আর কেহ কোনদিন আহ্বান জানাইবে না।

ফররুখ আহমদ চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই শার্দূলসম জ্বলন্ত দুইটি চোখের তীব্র আলোক-রশ্মি আর কোনদিন আদর্শ চেতনায় ঝলসিয়া উঠিবে না। অন্যায়-অনাচার আর স্বল্প-পতনের মুকাবেলায় তাঁহার সেই নাক্সা তলোয়ারসম লেখনী আর বিদ্যুৎ ছড়াইবে না। সাত সাগরের সেই ক্লাস্ত সিন্দাবাদ আজ গভীর ঘুমে অচেতন। শেষ রময়ানের সাধনার রাতগুলিতে ‘আশেক প্রাণে দহন জ্বালা’ নেভানোর সেই সুতীব্র প্রতীক্ষার শেষে ঈদুল ফিতরের পরের দিন তিনি চিরশান্তির ক্রোড়ে

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

ফররুখ আহমদ আর নাই। মাসিক মদীনার পাঠকগণের জন্য প্রতিমাসে নামে-বেনামে যিনি অমৃতের পেয়ালা পরিবেশন করিতেন, তাঁহার সেই স্নেহের দান হইতে আমরা চিরতরে বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার আদর্শসচেতন সাধক অন্তরের পূর্ণস্পর্শে একদিন আমরা আর আমাদের ন্যায় অনেকই সমবেত এবং তাঁহার সেই হেরার পথিক কাফেলার শরীক হইয়া জীবন-সাধনার মঞ্জিল পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সকলের জন্যই অগ্রপথিক সিপাহসালার ফররুখ আহমদের অকাল তিরোধান বজ্রাঘাতের চাইতেও ভয়াবহ বিপর্যয়ের সংবাদ। মহান পরওয়ারদিগারের ফয়সালাই চূড়ান্ত সত্য। এ অমোঘ সত্যের বাস্তবতা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তো কাহারো নাই, তবুও আজ প্রশ্ন জাগে, এরপর কাফেলার ভগ্নপ্রাণ অনুবর্তীগণের সম্মুখে আলোর মশালবাহী সিপাহসালারের শূন্য আসন কে পূরণ করিবেন?

[ ২২ নভেম্বর ১৯৭৪ এর মাসিক মদীনায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ]

## স্থান-কাল-পাত্র

লুপ্তক

গত ঈদসংখ্যা ইত্তেফাকের স্থান-কাল-পাত্রের এক জায়গায় লিখে ছিলাম, ‘কোথায় ফররুখ আহমদ-“লাশ”-এর মত অনবদ্য কবিতা আর দেখি না কেন?’ আর আজ, -মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে ফররুখ আহমদের লাশ কবরে শুইয়ে রেখে এসে এই লেখাটি লিখছি। মরণশীল মানুষের নিকট মৃত্যু কোন বড় কথা নয়। তবুও কোন কোন মৃত্যু এত বড়, এত বিরাট মনে হয় যে, তার নিকট জীবনও তুচ্ছ হয়ে পড়ে। ফররুখ আহমদের মৃত্যুতে আজ শুধু এই সান্ত্বনাই আমি খুঁজছি যে, মরণেও তাঁর মুখে হাসির একটা আভা ছড়িয়েছিল। ‘মোমিনের মৃত্যুর প্রধান লক্ষণ এই যে, মরণেও তাঁর মুখে হাসির ঝলক লেগে থাকবে।’

কিন্তু এ সান্ত্বনার পরেও একটা দুঃখ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ফররুখ আহমদের নিকট থেকে ‘লাশ’-এর মত কবিতা আমি পেতে চেয়েছিলাম বড় অসময়ে। মনে পড়েছে, ৬৭ অথবা ৬৮ সালের দিকে কবির সঙ্গে ঘটনাচক্রে একবার সাক্ষাৎ হয় অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় সে সময়ে কবির নিকট বসা ছিলেন। শুনে প্রথমটাতে খুবই অবাক হয়েছিলাম যে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কবির উপরে আলোচনাগ্রস্থ রচনা করবেন। পরে সে বই যথাসময়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সে সময়ে তিনি ঝড়, বৈশাখ, পদ্মা প্রভৃতি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা লিখছিলেন। ঝড়কে সমুদ্রের দূরন্ত হিসেবে আখ্যায়িত করতে গিয়ে তাঁর মনে কিছুটা খটকা লেগেছিল। কার কাছে যেন তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, শেলীর কমপ্লিট ওয়ার্কস আমার কাছে রয়েছে। আর তাই শব্দের প্রয়োজনে-বয়সে তাঁর অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমাহেন অজ্ঞাত অখ্যাত জনের নিকট তিনি দ্বিধাহীন চিন্তে ছুটে এসেছিলেন। সেদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর সাথে কাব্যালোচনা হয়েছিল। শেলীর কমপ্লিট ওয়ার্কস নাড়াচাড়া করতে করতে সেদিন এক সময়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন আসলে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র।

এরপর যখনই সুযোগ পেয়েছি, তখনই ফররুখ আহমদের কবিতাকে ইংরেজী সাহিত্যের ভাবধারার আঙ্গিকে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি। ফলে, তাঁর সাত সাগরের মাঝি থেকে শুরু করে অপরাপর অনেক কবিতার নতুনতর তাৎপর্য আমার নিকট ধরা পড়েছে। তাঁকে ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এই

রেনেসাঁ যে রিভাইভালিজম নয় বরং জাতীয় পুনরুজ্জীবনেরই ভাবানুষ্ঙ্গ তাও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধুনা স্যুররিয়ালিজম সম্পর্কে ইতস্ততঃ আলোচনা দেখতে পাই। কেউ যদি নিষ্ঠার সাথে ফররুখ আহমদের কাব্য-প্রতিভা আলোচনা করেন তবে তিনি দেখতে পাবেন, বাংলা সাহিত্যে স্যুররিয়ালিজমের সার্থক স্রষ্টা হচ্ছেন ফররুখ আহমদ।

বাংলার জাতীয় ঐতিহ্য পুঁথি-সাহিত্যের পাশাপাশি গোটা পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যের সুইনবার্ন থেকে শুরু করে টি.এস.এলিয়ট পর্যন্ত কবি-মনীষীদের কাব্যধারায় ফররুখ আহমদ গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর নিকটই শুনেছি, প্রথম কাব্য-জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত বাস্তববাদী। এই বাস্তববাদিতার রেশ ধরে তিনি ক্রমশঃ রোমান্সিসিজম-এর জগতে উন্নীত হন। স্যুররিয়ালিজমের সঙ্গে সম্মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ‘হাতেম তা’য়ী মহাকাব্য গ্যাটের ফাউন্টের আদলে রচিত। হাজারের উপর সনেট রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর ‘নৌফেল ও হাতেম’ যেকোন বিচারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেরা নাট্যকাব্য। এসব বিষয়ে তাঁর সার্থকতা কাব্যসমালোচকদের আলোচনার বস্তু। সে আলোচনায় আমি যেতে চাই না। সে যোগ্যতাও আমার নাই।

আজ আমি মানুষ ফররুখ আহমদ অথবা আদর্শবাদী কবিকর্মী ফররুখ আহমদ সম্পর্কেও আলোচনা করব না। শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হব যে, ১৯৬৮ সালের আগে বা পরের কোন সময় কলিকাতা বেতার থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ফররুখ আহমদের উপর সারগর্ভ এক আলোচনা করেছিলেন। এরও অনেক আগে, ৪৭-এর স্বাধীনতারও আগে, তদানীন্তন অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে নবীন কবি ফররুখ আহমদের উপরে আলোচনা সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের পর একমাত্র ফররুখ আহমদই সেদিন এ দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

শুনেছি, ‘লাশ’-এর কবি ফররুখ আহমদ মৃত্যুর আগে নিজেই লাশে পরিণত হয়েছিলেন। এটা কতটা অনাহার অপুষ্টি ও রোগজীর্ণতা তার বিচার এখন নিরর্থক। নজরুল পরবর্তী যুগস্রষ্টা কবি ফররুখ আহমদ একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন।

এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক প্রতিভাধর শিক্ষক আজ পথে-প্রান্তরে ঘুরে মরছেন। অফিস-কারখানায় বহু দক্ষ কুশলী আজ শুধু রাজনীতির রাসকেলের কারসাজিতে চাকরিচ্যুত অথবা বিতাড়িত। এর ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

শুধু এই নয়, দেশের আজ যারা নেতা উপনেতা ও হর্তা-কর্তা এবং সমাজের আজ যারা পরিচালক-তাদের সবার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা করে : ‘ওকি বাতাসের হাহাকাহ, ওকি রোনাজারি ক্ষুধিতের! / ওকি দরিয়ার গর্জন, ওকি বেদনা মজলুমের! / ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী !/ পাঞ্জরী! / জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি, / জাগে অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি ;/ দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেৱী, কত দেৱী॥ ’

এই প্রশ্ন, এই জিজ্ঞাসা আজ গোটাজাতির। অনেকের মত আমিও এই প্রশ্ন, এই জিজ্ঞাসাই করতে চাই, পারি না। কেননা সে প্রশ্ন তুলবার বা জিজ্ঞাসা রাখবার যোগ্যতা আমার নেই। যাঁর যোগ্যতা ছিল, সেই ‘লাশ’-এর কবি ফররুখ আহমদ আজ নিজেই লাশে পরিণত হয়েছেন। নতুবা হয়ত আবার তাঁর মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো : “মধুর ভাষণে, / পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে/ সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের পর/সাড়ে তিনহাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর। /... পড়ে আছে মৃত মানবতা, / তারি সাথে পথে মুখ গুজে/ আকাশ অদৃশ্য হল দাষ্টিকের খিলানে, গম্বুজে/... একোন সভ্যতা মানুষের চরম সত্ত্বাকে / করে পরিহাস ?/ কোন্ ইবলিস আজ মানুষের ফেলি মৃত্যু পাকে/করে পরিহাস?/ কোন্ আজাজিল লাথি মারে মানুষের শবে?/ ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসবে/কোন্ প্রেত অট্টহাসি হাসে ?/ মানুষের আত্ননাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে।”

[২১ অক্টোবর ১৯৭৪ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের উপ সম্পাদকীয় নিবন্ধ।]

## সাক্ষাৎকার

[কবি ফররুখ আহমদের সাক্ষাৎকার বিরূপতা সম্পর্কে তাঁর জীবৎকালে অনেকেই ছিলেন জ্ঞাত। বিশেষ করে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অনেককে তখন বিস্মিত করেছে। এ খবর অনেককে মুগ্ধ করলেও তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে ইচ্ছুক অনেকেই যে বিফল মনোরথ এবং সেই সাথে কিছু তিক্ত কথা শোনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে এমন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই আজও বর্তমান আছেন।

নিচের বিস্তৃত ও ঘরোয়া সাক্ষাৎকারটি আমাদের দেশের দীর্ঘায়ু প্রতিষ্ঠান তৎকালীন ন্যাশনাল বুক সেন্টার-এর (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) মানসম্পন্ন মুখপত্র ‘বই’-এর জুন, ১৯৬৮ সংখ্যায় (৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) ‘কেন পড়ি’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট উপন্যাসিক সরদার জয়েনউদ্দীন সম্পাদিত ‘বই’ পত্রিকায় গৃহীত এ সাক্ষাৎকারটি কে গ্রহণ করেছিলেন সে তথ্য আমরা জানতে পারিনি। তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ভাগ্যের ও হিম্মতের তারিফ করতে হয় বৈকি !

পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নোটে বলা হয়, “ফররুখ আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি; যাঁর কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্য ও চেতনা বাঙময় রূপ লাভ করেছে। সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ সাধনার জন্যে তিনি ১৯৬১ সালে ‘প্রেসিডেন্ট পুরস্কার’ লাভ করেছেন এবং ‘হাতেম তা’য়ী’ কাব্যের জন্যে ১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে আদমজী পুরস্কার পেয়েছেন। ফররুখ আহমদ বর্তমানে রেডিও পাকিস্তানে চাকুরিরত রয়েছেন। থাকেন ইস্কাটনে সেখানেই এক সকালে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে বই পড়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে আলোচনা হয়, তা আমরা হুবহু ছেপে দিলাম।”- সম্পাদক]

দীর্ঘকাল যাবত আপনি কবিতায় নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। আপনার সদ্য পুরস্কার পাওয়া ‘হাতেম তা’য়ী’ কাব্যও এই রকম পরীক্ষার ফল বলে সুধী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই খুব পড়াশোনা করেন। তাই না ?

আমি যদি বলি যে, পড়াশোনা চিন্তা-ভাবনার পাট এখান থেকে প্রায় উঠেই গেছে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বিস্মিত হবেন।

তা হব বৈকি !

কথাটা বিস্ময়কর হলেও মর্যাদাসিকভাবে সত্য।



আপনি বড় অদ্ভুত কথা বলছেন দেখি!

অদ্ভুত কথা নয়। কাজের পরিচয় ফল দেখেই পাওয়া যায়।

কি রকম?

দুনিয়ার আরও দশটা উন্নত দেশের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক অথবা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অবদানের তুলনা ক'রে দেখুন, খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আমাদের পড়াশোনার বহর আর বিদ্যার দৌড় কতটুকু। আমাদের চিন্তা ভাবনার পরিধি কতটুকু সে কথা বুঝতেও দেয়ী হবে না।

পড়াশোনার সঙ্গে আপনি কেন বারবার চিন্তা-ভাবনার কথা বলছেন।

আমি স্বাধীন চিন্তার কথা বলছি।

কেন?

স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন, হজম, বদহজমের যোগ আছে বলেই। বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমাদের পড়াশোনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে সায়্য দিতে পারছি না।

কেন?

অনেকেই আমাকে একথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে না পড়লে তাঁদের ঘুম হয় না। একথা কি মিথ্যে?

ডাহা ভাঁওতাবাজি। ঘুমানোর জন্য কেউ পড়াশোনা করে না। সত্যিকারের জ্ঞানান্বেষী পাঠক তো নয়-ই।

তবে কি মানুষ না ঘুমানোর জন্য পড়াশোনা করে?

যে মানুষ পড়াশোনা করে সে শুধু নিজেই জেগে থাকে না, অন্যকেও জাগায়, তাতে জাতি জগ্নত হয়ে ওঠে। যারা ঘুমানোর জন্য পড়াশোনা করে তারা পাঠকই নয়।

তা হ'লে আপনি আমাদের পাঠক সম্প্রদায়কে সত্যিকারের পড়ুয়া মনে করেন না?

যারা ঘুমানোর জন্য পড়ে তাদেরকে আমি পাঠক মনে করি না।

আর লেখক সম্প্রদায়কে?

যে সব লেখকের স্বকীয়তা আছে, যাঁদের চিন্তাভাবনায়, প্রকাশ ভঙ্গীতে মৌলিকতা আছে তাঁদেরকে আমি সত্যিকারের লেখক বলে মনে করি।

আমাদের দেশে কি এরকম লেখকের সংখ্যা বেশী?

কোন দেশেই এরকম লেখকের সংখ্যা বেশী নয়।

তা হলে আপনি আমাদের দেশের সাধারণ লেখক অথবা পাঠক সম্প্রদায়কে বাজে ব'লে মনে করেন?

কোন মানুষকেই আমি বাজে ব'লে মনে করি না, শুধু হামবড়া দাঙ্গিক প্রকৃতির মানুষকেই আমি বাজে মনে করি।

আপনি আমাদের লেখক ও পাঠকদের সম্পর্কে চিন্তা করেন কি?

নগণ্য হলেও নিজে যখন এক-আধটু লেখার চেষ্টা করি তখন ও বিষয়েও কিছু চিন্তা করি বৈকি।

আপনি যেভাবে চিন্তা করেন, জানাবেন কি?

উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে এই সব সাধারণ পাঠকই হয়ে উঠবে অসাধারণ পাঠক, নকল নবীশ হবে সত্যিকারের ভাল লেখক।

এটা কি আপনার কাব্যিক উচ্ছ্বাস?

না। প্রাজ্ঞল গদ্যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি।

সর্বসাধারণের পড়াশোনার জন্য আপনি কি রকম পরিবেশ চান?

সাধারণ পাঠাগার।

পাঠাগার কি আমাদের নাই?

আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। এত কম যে বলতেও লজ্জাবোধ হয়।

আপনার কথা মেনে নিলাম। মনে করুন, কোন অলৌকিক উপায়ে রাতারাতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাগার স্থাপিত হ'ল কিন্তু তাতেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

না। নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

কিসের সমস্যা?

বইয়ের। লেখকের। প্রকাশকের।

সেটা কি রকম?

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পাঠক সম্প্রদায়কে পরিচিত করতে হ'লে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে চেষ্টা করতে হবে, এক্ষেত্রে বইয়ের অভাব কেন হবে আশা করি তা আপনাকে খুলে বলতে হবে না।

কিন্তু লেখকের অভাব হবে কেন?

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা এই যে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না কাজেই লেখকেরও অভাব হবে না কোনদিন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। তৈরী কাক অনেক পাওয়া যায়। বিশেষ করে শহরে অনেক কাক মৌজুদ থাকে। কিন্তু তৈরী লেখক অতটা সহজে পাওয়া যায় না, শহরেও খুব বেশী লেখক মৌজুদ থাকে না। কাজেই মৌলিক রচনার কথা বাদ দিলেও তরজমা করার মত যোগ্য লোকেরও তখন অভাব হবে। আর যে সমস্ত বই লেখা বা তরজমা করা হবে, তারও প্রকাশক

খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আপনার শেষের কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এখনও কি আমাদের সমাজে প্রকাশনা একটা বড় সমস্যা?

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজের এটা চিরন্তন সমস্যা। এই সমস্যার জন্যই ছোট একখানা বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে বিশ্বকোষ জাতীয় বিরাট গ্রন্থের ব্যাপারে আমাদের পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছে।

আগেও কি সমস্যা ছিল?

আগেও ছিল। আপনারা বোধহয় জানেন-যে নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমরা এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি সেই নজরুল ইসলামের প্রায় সব বই-ই প্রকাশ করেছিলেন অমুসলিম প্রকাশক; তা'ও শেষ অবস্থায়।

নজরুল ইসলাম কি তাঁদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্য পেয়েছিলেন?

তা আমি জানি না।

এটাতো দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেরকার ঘটনা।

হ্যাঁ।

তখন হয়তো মুসলিম প্রকাশকদের অবস্থা খারাপ ছিল।

ধরে নিলাম আপনার কথাই ঠিক। এখন আর সে অবস্থা নাই। অনেক প্রকাশকই এখন বিত্তের অধিকারী। ধন-দৌলতের মালিক। অকে বাড়ী, গাড়ী, মোটা ব্যাল্কন, ব্যালাস এখন তাঁদের সৌভাগ্যের খবর দিচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য লেখকদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। লেখকদের অর্থনৈতিক সমস্যার মত সংগ্রহ প্রকাশের সমস্যাও প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

আপনি কি শুধু লেখকদের দিকটিই তুলে ধরছেন না? আমার তো বিশ্বাস যে প্রকাশকেরাই এখন লেখকদের সবচাইতে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন না নিজেরা পরিপুষ্ট হচ্ছেন?

লেখক সম্প্রদায় কি একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছেন?

পুরাপুরি বঞ্চিত হচ্ছেন বললে হয়তো বাড়াবাড়ি হবে কিন্তু অধিকাংশ লেখকই যে তাঁদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন না এ কথা ঠিক। তার প্রমাণ বই-এর ব্যবসা করে প্রকাশক বড় হলে তার সঙ্গে লেখকেরও ও তো হওয়া উচিত, কিন্তু কোন লোকই তেমন ইননি আজ পর্যন্ত।

প্রকাশনা একটা নতুন শিল্প হিসেবে এদেশে গড়ে উঠছে, দেনা পাওনার ব্যাপারে প্রকাশকের ক্রটি-বিদ্যুতি কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু লেখক প্রকাশক সম্পর্ক উন্নয়নের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি।

দেখুন এই প্রসঙ্গে ছেলেবেলায় পড়া একটা ফার্সী গল্প ইঠাৎ মনে পড়ে গেল।  
মুখতাসার গল্পটা বলব।

বলুন।

ইরানে এক দরবেশ ছিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আধমণ রুটি খেয়ে সারারাত  
এবাদত বন্দেগী করতেন।

আধমণ?

হ্যাঁ আধমণ। গল্প লেখক এই আধমণ রুটি খাওয়ার উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে,  
আধমণ রুটি খেয়ে সারারাত এবাদত বন্দেগীতে না কাটিয়ে দরবেশ যদি আধখানা  
রুটি খেয়ে সারারাত ঘুমিয়ে কাটাতেন তাহ'লে কি চমৎকার ব্যাপারই না হ'ত।  
অর্থাৎ বিশ-তিরিশ জন লোক খেয়ে বাঁচতো।

আধমণী দরবেশের যে কাহিনী আপনি শোনালেন সে কথা আমাদের সকল  
প্রকাশকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। প্রকাশকেরা শুধু নিজেদের উদরপূর্তিই করেন  
না। পৃষ্ঠপোষকতা ও সংকাজও করে থাকেন।

তা হয়তো করে থাকেন। কিন্তু লেখকদের ন্যায্য পাওনা গণ্ডা ঠিক সময়ে  
মিটিয়ে দিলেই লেখক সম্প্রদায়ের সঙ্গে গোটা সমাজেরও উপকার করা হ'ত।  
লেখকরাও নিশ্চিত মনে লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন।

লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আপনি এত আগ্রহশীল কেন?

পেশা হিসেবে গ্রহণ না করলে এ যুগে লেখকের এবং লেখার অস্তিত্ব রক্ষা প্রায়  
অসম্ভব বলেই আমি লেখাকে স্বাধীন সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

দুনিয়ার সব দেশেই কি খবর আমি বলতে পারিনা, তবে অধিকাংশ উন্নত  
দেশের লেখকেরাই লেখাকে স্বাধীন, সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

দুনিয়ার সব দেশেই খবর আমি বলতে পারি না, তবে অধিকাংশ উন্নত দেশের  
লেখকেরাই লেখাকে স্বাধীন, সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এর তো খারাপ দিকও আছে?

আছে। লেখক যদি নিজের বিবেক বিক্রী করে অর্থপিশাচের ভূমিকায় নেমে  
লিখতে বসেন তাহলে সেটা ব্যক্তির জন্যেই নয়, সমাজের জন্যেও মারাত্মক ক্ষতিকর  
হবে। কিন্তু খারাপ দিকটার কথাই আপনি আগে ভাবছেন কেন?

না, ও কথা আমি ভাবিনি। আমি এমন কয়েকজন লেখককে দেখছি যারা  
বিশ্বশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন।

আমাদের দেশে লিখে বিশ্বশালী হয়েছে?

না, লিখে নয়। নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে।

‘তাই বলুন। তা’ উত্তর তো আপনি নিজেই দিলেন।

একজন বয়স্ক পত্রিকা সম্পাদকও কিছুকাল আগে আমাকে বলেছিলেন যে, যতদিন লেখক দরিদ্র থাকেন ততদিন নাকি তিনি ভাল লিখতে পারেন। কথাটা কি সত্য?

কথাটার উত্তর সরাসরি নিজে না দিয়ে আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করব দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকাতে। সচ্ছল অবস্থার দরুন সে সব দেশের লেখকেরা ভাল লিখতে পারছেন, বেশী লিখতে পারছেন-না আমরা পারছি।

পত্রিকা সম্পাদকের কথার উপর আমি কোন গুরুত্ব দিইনি।

না দিয়ে ভালই করেছেন। কারণ অভুক্ত অবস্থায় থাকলে পত্রিকা সম্পাদকের যে ঐ দারিদ্র্যবিলাস থাকত না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে এটি তাহলে আপনার বড় যুক্তি?

লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার সবচাইতে বড় লাভ এই যে, লেখক লেখাপড়ায় সবসময় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। রুজী-রোজগারের ধান্দায় লেখককে যদি অকারণে ঘুরতে না হয় তাহলে সত্যিকারের প্রতিভাবান লেখক অনেক বেশী কাজ করতে পারেন বা পারবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উন্নত মানের লেখার জন্য এই পরিবেশ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যতদিন এই পরিবেশ সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন কি লেখক সম্প্রদায় লেখাপড়া বাদ দিয়ে ব’সে থাকবেন?

তা যে থাকবেন না তা’ আপনি নিজেও জানেন। কিন্তু বিনা চাষের ফসল যে কি হয় তার নমুনা তো আপনারা আমাদের লেখা থেকেই পাচ্ছেন।

আচ্ছা একটা কথা আবার আপনাকে জিগ্গেস করব, যদি কিছু মনে না করেন।

অত সঙ্কোচবোধ করছেন কেন, সরাসরি বলে ফেলুন।

আলোচনার শুরুতে আপনি ও কথাটা বল্লেন কেন, লেখাপড়া চিন্তা ভাবনার পাট এখন থেকে প্রায় উঠেই গেছে। কথাটা আমার কাছে যেন কেমন বোধ হচ্ছে।

অর্থাৎ অপ্রিয় সত্যকে মেনে নিতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্যকে না মেনে উপায় কি বলুন। একটা স্বাধীন, গতিশীল জাতির লেখক হিসাবে যেভাবে পড়াশোনা করা দরকার সেভাবে যে আমরা পড়াশোনা করি না, করছি না অথবা করতে পারছি না সেটা তো আমাদের কাজের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। নিজেদের ব্যর্থতার কথা আর কিভাবে বলব?’

আমরা যাঁরা লেখাপড়াকে দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করছি তাঁরা যদি না পড়ে তাহলে এদেশে সাধারণ পাঠক জন্মাবেই না। অতএব সেদিক চেয়ে দেশের ও বিষয়টা একবার চিন্তা করুন।

এ কথা বলতে গিয়ে আপনি অত মনমরা হয়ে গেলেন যেন? আমার বরং আমাদের দেশের একশ্রেণীর পাঠকের খবর দিতে পারি-যাঁরা বয়সে প্রাচীন আর উচ্চশিক্ষিত তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সারা জীবন পড়ছেন এমনকি ডিটেক্টিভ নভেল কি ঐ ধরনের অন্যান্য বই পড়ে কাটাচ্ছেন। এসব পাঠক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

গদ্যে আর কি উত্তর দেই, এর উত্তর দিতে হয় পদ্যে।

তাই দিন।

অবাক হলাম দাদুর হাতে  
দেখে চুম্বি কাটি,  
ঘোরেন তিনি মারবেল আর  
নিয়ে দুধের বাটি।

কেমন, হ'ল তো? এই যে চির নাবালক দাদুর পড়াশোনা দেখলে অবাক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

নাবালক কেন, যোয়ানও হতে পারেন।

তা পারেন, তবে এ বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এ কথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎ পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

আপনার কথা সত্য হোক এটাই দোয়া করি। তবে এ কথাটাও আমাদের জানা আছে যে আজাদী পাওয়ার পর আমরা এমন এক উৎকট ভব্যতার শিকারে পরিণত হয়েছি; যেখানে কার্পেট বিছান ড্রয়িং রুমের একপাশে দামী শেলফে রেক্সিনে বাঁধানো অনেক বই সাজানো থাকে। কোনদিন সে সব বইয়ের পাতা খোলা হয় না। সেখানে শুধু আলোচনা হয় হাল ফ্যাসানের বাড়ী, গাড়ী আর শাড়ী সম্পর্কে।

কিন্তু ঐ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে লেখকদের কি সম্পর্ক?

লেখকদের উপরেও এখন ঐ তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করছেন, যার ফলে কঠিন শ্রম-সামনার পথ ছেড়ে অনেক লেখক বাড়ী গাড়ীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন!

আপনার বুঝি এখনো বাড়ী-গাড়ী কিছুই হয়নি।

আমার নয়, আমাদের কথা বলছিলাম।

আশা করি এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও কথা হবে।

তবে সেটা যেন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে না হয়।

কেন?

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আমার পেশা নয়।

# কবির লেখা





## উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী

“দূর দারাজের রাহা কি ডর আমার ।”

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার  
উঠে আসে দিখলয়ে, ওয়েসিস নিস্তরু, নির্জন,  
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে  
তখননি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে বিগত দিনের  
দীর্ঘশ্বাস । আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে  
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা  
রাত্রির অস্পষ্ট পাখি দেখি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে ।

আশ্চর্য সে অনুভূতি । দুনিয়ার দুঃখ-সুখ থেকে  
বিদায় নিয়েছে যারা, তাদেরি সে হারানো কাহিনী  
জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোকে ফোটে লক্ষ বুদ্ধদের মত ।  
সিতারা চেরাগ যত নেভে-জ্বলে রাত্রির ডেরায় ।  
দৃষ্টির সম্মুখে এসে ঘুরে যায় আদম সুরাত  
অতন্দ্র প্রহরী ! ... খতিয়ান করি আমি জিন্দেগীর  
লাভ, লোকসান, ক্ষয়, কামিয়াবি কিম্বা বিফলতা,  
উদ্দেশ্য অথবা অর্থ খুঁজি আমি পূর্ণ জীবনের ।  
স্রষ্টা ও সৃষ্টির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সব ।  
বিস্মৃত আত্মার কথা । ছিল যারা কিন্তু আজ নাই,  
টুকরো খড়-কুটো যত মিশে গেছে দিগন্তের পারে  
ঝড়ের সংঘাতে, আর সংখ্যাহীন জাতি ও জনতা  
উড়েছে বালুর মত লু' হাওয়ার মুখে ; অন্ধকারে  
অস্পষ্ট ছায়ার সাথে ভাসে যেন নিশানা তাদের ।

রাত্রি ঘন স্তরুতায় তারা ঘেরা গম্বুজের নীচে  
হারানো অতীত মনে ভেসে ওঠে । মনে হয় কালো  
অন্ধকার পটভূমি বিস্মৃতির আন্তরণ শুধু ।

ডুবে গেছে সে আঁধারে ফেরাউন, কারুন, শাদাদ  
কিন্মা যারা অত্যাচারী ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সত্ত্বাকে;  
জ্বালায়েছে পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল শুধু ।  
নিষ্ঠুর, নিখর রাত্রে মনে পড়ে ব্যর্থতা তাদের,  
মনে পড়ে সেই সাথে- পেল যারা পূর্ণতা জীবনে,  
মুক্ত হিলালের মত জাগে আজও তাদের ইশারা  
গুরা পূর্ণিমার পথে বাঁকা রেখা রূপালি ইঙ্গিতে ।

রাত্রিভর শুনি আমি অন্তহীন আলো-আঁধারের  
আশ্চর্য রহস্যময় পরিবেশে ব্যর্থতা অথবা  
সাফল্যের দুই সুর পাশাপাশি বয় খরস্রোতে ;  
ধ্যান-মৌন গিরি শৃঙ্গে ছিটে পড়ে নক্ষত্র রাত্রির ;  
জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে ভাবি সে কাহিনী ।

তারপর আসে দিন, মুক্ত ভোরে আলোর প্লাবনে  
জেগে ওঠে আফতাব দিগ্বিজয়ী সেনানীর মত  
নিঃসংশয় । রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে মুহূর্তের মাঝে ।  
কাফেলার ঘন্টা ধ্বনি, মিনারে মিনারে মুয়াজ্জিন  
তখন ঘোষণা করে মহিমা আল্লার; ডাক দেয়  
খোদার বান্দাকে তারা ইবাদত বন্দেগীর পথে ।

শুনেছি আমি সে ডাক, শুনেছি সে ভোরের আজান  
রাত্রিশেষে, বজ্র আওয়াজের মত বলিষ্ঠ তাকিদ  
পলকে জাগায়ে গেছে স্বপ্নালস সত্ত্বাকে আমার  
কর্মময় পৃথিবীর পথে । বুঝেছি তখন আমি  
রাত্রির প্রশান্তি, স্বপ্ন-প্রস্তুতির প্রথম অধ্যায়  
খোলে দ্বার কর্মের প্রবাহে । যে হয় পশ্চাদগামী  
অথবা চায় না নিতে সুমহান দায়িত্ব শ্রমের  
সেই যাত্রী অন্ধকারে হারায় পলকে । ব্যর্থতার  
নিষ্ক্রিয় শূন্যতা মাঝে দেখি তার হীন পরিণতি  
ঘৃণ্য আত্মপ্রতারণা মাঝে । সুকঠিন দায়িত্বের  
গুরুভার বয়ে তাই যেতে চাই শান্তিহীন প্রাণে ।  
রাত্রি ও দিনের দীপ্ত দুই রঙা পটভূমিকায়

জীবন-মৃত্যুর ধারা বয়ে যায় তীর-তীর বেগে  
এক সাথে। শোনে না কখনও কারো আহাজারি  
চলন্ত প্রবাহ থেকে টানে মৃত্যু যাত্রীকে যখন  
অকম্পিত। যে চলে পূর্ণতা খুঁজে জিন্দেগীর স্রোতে  
কর্মের প্রবাহে তীর আঘাতে অথবা প্রতিঘাতে  
থামে না সে হতাস্বাস; সংগ্রামী সে করে অতিক্রম  
পথের দুরূহ বাধা, প্রতিরোধ আপ্রাণ প্রয়াসে।  
আসন্ন মৃত্যুর মুখে দেখি সে প্রাণে সার্থকতা।  
তারকা-উজ্জ্বল !

কিছু যারা নির্ধারিত সময়ের  
বোঝে না কিম্বৎ, অথবা হারিয়ে ফেলে অর্থময়  
কর্মের গ্রহর শুধু অফুরন্ত আলস্য-বিলাসে  
পলায়নী বৃত্তি নিয়ে; কিম্বা যারা হয় পলাতক  
মরে তারা অসম্পূর্ণ প্রাণে। জানি আমি অর্থহীন  
অসার্থক সেই জিন্দেগানি। অপূর্ণ আমার সত্ত্বা  
এ প্রাণ-প্রবাহ চলে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সন্ধানে।

শাহী দৌলতের মাঝে শান্তি আমি পাইনি কখন,  
তাইতো দুঃসহ দিন; স্বপ্ন-রাত্রি দুঃসহ আমার  
এ বালাখানায়। পাই না প্রাণে স্পর্শ। মানুষের  
আনন্দ-বেদনা থেকে নির্বাসিত রঙ্গমঞ্চে আমি  
চাই নি এ প্রবঞ্চনা জীবনের মিথ্যা অভিনয়ে।  
অথচ এখানে এই মহলের কক্ষে কক্ষান্তরে  
অর্থহীন জৌলুসের মাঝে দেখি কৃত্রিম ছলনা  
প্রাণহীন। কৃত্রিম সৌজন্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।  
পাই না সহজ শান্তি কোনখানে। অন্ধ অহমিকা  
এখানে চেনে না প্রেম, পণ্ডিতের ভ্রান্ত অহংকার  
হৃদয়ের রাখে না সন্ধান। নাই সমবেদনার  
অশ্রুক্ষণা এ মহলে। অন্ধ এরা স্বার্থের জিজিরে  
ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ ইব্লিসের কারা বন্দী যেন।  
ঘৃণ্য এ জিন্দা থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই আমি  
প্রমুক্ত জ্ঞানের পথে ; - ইনসানের খিদমতের পথে।

আল্লার আলম আর মখলুকাৎ আশ্চর্য সুন্দর,  
সুন্দর পৃথিবী, ফুল, রাত্রির সিতারা, মাহ্‌তাব,  
ভোরের আফতাব। সুন্দর বর্ষার মেঘ- সারি বাঁধা  
কালো কবুতর। কিন্তু যা সুন্দরতর-সে মানুষ,  
বান্দা এলাহির। দিনরাত্রি ঘুরি সেই ইনসানের  
খিদমতের পথে। অতৃপ্ত আমার আত্মা খুঁজে ফেরে  
শুধু মানুষের সঙ্গ। নিকটে অথবা দূর দেশে  
চলি তাই অন্তহীন জনপদে কিংবা মরু-মাঠে  
অজ্ঞাত সে আকর্ষণে ব্যথাতুর মানুষের খোঁজে  
রাত্রিদিন। দেখেছি অভাব, দুঃখ, দেখেছি বেদনা  
মানুষের এ সংসারে। পারি নাই মেটাতে, তবুও  
থামে না আমার মন, ছুটে চলে আরবী তা'জীর  
চেয়ে ঢের দ্রুতগতি দিগন্তের পানে। জানি না যা  
জানি আমি সেই সাথে।

এই পথে ঝড়ের প্রস্থাসে  
সাইমুমের পক্ষচ্ছায়ে আসে দেও কোহে-কাফ থেকে  
জনপদে, পলকে যায় সে পিষে শান্তি ও সুখমা।  
আসে পরী যৌবনের অফুরন্ত পান-পাত্র নিয়ে।  
সব ছেড়ে যেতে হয়, তুচ্ছ ক'রে দৈত্যের শাসন  
মৃত্যু কাল; অথবা ছলনা-জাল সুন্দরী পরীর।  
'য়েমনের শাহজাদা' পরিচিত আমি এই নামে  
পৃথিবীতে, শুনি নকীবের মুখে স্বর্ণ সিংহাসন  
প্রাপ্য সে আমারি; প্রাপ্য শাহী তাজ। কিন্তু হাস্যকর  
অর্থহীন মনে হয় সেই বিড়ম্বনা; মনে হয়  
মানুষের ঘৃণ্য অপমান। কে রাজা এ পৃথিবীতে?  
ইনসানের মাঝে কোন প্রতারক, প্রভুত্ব-পিয়াসী  
মিথ্যা পরিচয় দিয়ে করে তিক্ত শাসন, অথবা  
শোষণের যাঁতা-কলে ধ্বংসে করে সত্ত্বা মানুষের?

অশান্তি দেখেছি যত স্বপ্ন দুনিয়া জাহানে,  
অকল্যাণ, অপমান যতবার দেখেছি, বিস্ময়ে  
দেখেছি স্বার্থের চক্রে সংগোপন রয়েছে অলীক

স্বপ্ন প্রভুত্বের। তামাম জাহানে জানি মালিকানা  
 কেবলি আল্লার। আশ্চর্য পিপাসা তবু প্রভুত্বের  
 দেখি পৃথিবীতে ! ধ্বংস হ'ল নমরুদ, ফেরাউন,  
 ধ্বংস হ'ল আত্মঘাতী পভুত্বের যে মিথ্যা দাবীতে  
 সে অলীক অহঙ্কারে দেখি আজও ইবলিসের চর  
 খোদার বান্দাকে চায় ক্রীতদাস বানাতে নিজের।  
 মানি না কখনও তাই বলদীর্ঘ ঘৃণ্যের বিধান,  
 মানি না কখনও আমি অত্যাচার।

হাতে তা'য়ীর

যতটুকু অধিকার পৃথিবীতে রয়েছে বাঁচার  
 পথচারী মজলুমের তিল মাত্র নাই তার কম  
 দুনিয়ায়। লোহুতে পার্থক্য নাই বনি আদমের।  
 শিরায় শিরায় আর ধমনীতে দেখি বহমান  
 এক রক্তধারা, তবু দেখি আমি শংকিত বিস্ময়ে  
 মিথ্যা আভিজাত্য নিয়ে কৌশলীরা গড়েছে এখানে  
 বিভেদের কী মৃত্যু দুঃসহ ! সীমাহীন বঞ্চনায়  
 গড়েছে প্রলুব্ধ পাপী জুলুমের কী কাল জিজির !  
 কী কাল প্রাচীরে ওরা অপরূদ্ধ করেছে সত্ত্বাকে !

তাই ছেড়ে চলি আমি তাজ-তখত্ অনায়াসে, আর  
 ছেড়ে চলি সালতানাত বেদনার অন্তহীন পথে,  
 দুর্গত সত্তার খোঁজে চলি আমি উত্তরাধিকারী  
 মানুষের। আমাকে ব'ল না আর ফিরে যেতে সেই  
 স্বার্থের সঙ্গীর্ণ কূপে, -লুব্ধ প্রাণ যেখানে আঁধারে  
 অপরূদ্ধ। আমি এক বেদুইন, জীবন আমার  
 ভ্রাম্যমান। ঘুরেছি অনেক তপ্ত মরু পথে, আর  
 ঘুরেছি নির্জনে কিম্বা অসংখ্য শব্দিত জনপদে,  
 দেখেছি, -জেনেছি আমি মানুষের আশ্চর্যকাহিনী;  
 রয়েছে অজানা তবু জীবনের রহস্য বিপুল  
 -শীতের প্রথম সূর্য কুহেলিতে আচ্ছন্ন যেমন।  
 তাই জেনে যেতে চাই যে রহস্য অজানা আমার

জিন্দেগীতে ; মর্মমূলে পেতে চাই বিস্মৃত প্রাণের  
সে মুক্ত প্রবাহ । আমার সন্তায় সুপ্ত যে সমুদ্র  
আবর্তিত হয় নিত্য তাকে আমি জেনে যেতে চাই  
আত্মার আলোকে ।

খিজিরের অনুবর্তী এই পথে  
চলে গেছে মঞ্জিলের দূর যাত্রী, থামে নি কখনও  
সংকটে, সংঘর্ষে কিম্বা প্রবৃত্তির লোভে । চলি তাই  
তাদের ইশারা খুঁজে পৃথিবীর সকল সড়কে  
শ্রান্তিহীন, চলি আমি খুঁজে তাই অজানা অধ্যায়  
জীবনের; চলি সংখ্যাহীন বাধা-বন্ধন পেরিয়ে ।

যার আমি এই ভাবে দূর হতে দূরে, দূরান্তরে  
সম্পূর্ণ অচেনা পথে, অজানা সৃষ্টির মাঝখানে  
অপরিচয়ের বাধা দীর্ঘ ক’রে যাব আমি একা  
বনি আদমের মুক্ত বিচিত্র মিছিলে; দেশে দেশে  
যাব আমি মানুষের অফুরন্ত আত্মীয়তা নিয়ে  
অগণন আত্মার দাবীতে । পাব খুঁজে এই পথে  
পূর্ণ মনুষ্যত্ব, জ্ঞান,-জীবনের অভীষ্ট আমার;  
দূরত্বের নাই ভয়, চাই শুধু মদদ খোদার ॥  
( হাতেম তা’য়ী থেকে কবি কর্তৃক নির্বাচিত অংশ)

## শেষ কথা

বিদায়ের শেষ রাত্রে মুনাজাত করিল হাতেম  
(আত্মজিজ্ঞাসার মুখে পেয়েছিল যে পথ-নির্দেশ),  
মুনাজাত করিল সে সারা রাত্রি আল্লার দরবারে  
সৃষ্টির কল্যাণে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যে পথিক  
জেনেছিল জীবনের গূঢ় অর্থ সফরের পথে  
মুনাজাত করিল সে অশ্রুভরা চোখে

ঃ হে মহান

রহমান, রমি, রব-স্রষ্টা তুমি কুল মখলুকের  
সহজে পূর্ণতা দাও অসম্পূর্ণ সত্তাকে, রাত্রির  
ঘন অন্ধকার থেকে নিয়ে যাও দিনের রোশ্নিতে।  
যা কিছু অসত্য, মিথ্যা ব্যর্থতার ঘুরাবর্ত যত  
সেই মত দীর্ণ করে নিয়ে যাও সত্যের মঞ্জিলে;  
সব ব্যর্থ প্রাণে তুমি দাও কামিয়াবি। তোমারি তো  
এ বিশ্ব আকাশ আর তারার মহফিল, তোমারি তো  
মালিকানা তামাম আলমে। তুলে নাও, তুলে নাও  
সঙ্কীর্ণ এ গণ্ডি ভেঙ্গে সম্পূর্ণ সৃষ্টির মাঝখানে,  
প্রজ্ঞার বিশাল রাজ্য খুলে দাও সম্মুখে সবার,  
সফলতা দাও তুমি সব প্রার্থী প্রয়াসী জীবনে।  
জড়তা, স্থাণুত্ব ভুলে হয় যেন আদম সন্তান  
জীবন্ত নদীর মত গতিমান, উদ্দাম, চঞ্চল  
মাজারের মৃত্যু-ধুম যত দিন না আসে ঘনিয়ে  
মর্ম-ক্রান্ত দুই চোখে। নারী নর একাত্ম প্রয়াসে  
প্রবাল কীটের মত গড়ে যেন মানবিকতার  
এ মঞ্জিল এক মনে, যেন জানে সকল ইনসানে  
শ্রমের মর্যাদা; আর রক্তপায়ী যত প্রতারক  
ধ্বংস হয় যেন তারা এখানে সম্মুখে। খান্দানের  
মিথ্যা অহমিকা যেন দেশে দেশে না জ্বালে আগুন

অশান্তি । মিথ্যা শরাফত আর কৌলিন্য কুহক  
বর্ণের বৈচিত্র্যে যেন দাবানল না পারে জ্বালাতে ।  
মানুষের এ সংসারে ভ্রাতৃত্বের পরিপূর্ণ সুর  
বাজে যেন একতানে, পায় যেন ইজ্জৎ ইনসান  
হে মহান ! কেবল তোমারি বন্দেগীতে ।

অসত্যের,

অশান্তির মূল যেন উৎপাটিত হয় পৃথিবীতে,  
সকল আঘাত আর ক্ষত থেকে যেন নিরাপদ  
থাকে মানুষের প্রাণ, শান্তি ও সম্মম । মুসাফির  
ঘোরে যেন পৃথিবীতে নির্বিরোধ ভ্রাতৃত্বের তীরে  
বিলায়ে অকুণ্ঠ প্রেম, দুনিয়ার সব বন্দরের  
সকল জাহাজ যেন যায় সব দেশে; মানুষের  
প্রেম, প্রীতি অবরুদ্ধ যেন আর না থাকে জিন্দানে ।  
সকল কৃত্রিম বাধা, সকল মিথ্যার অন্তরাল  
লুপ্ত হয়ে যায় যেন মুমীনের দীপ্ত প্রাণাগ্নিতে ;  
সকল মজলুম যেন মুক্তি পায় সব জালিমের  
সঙ্গীন, শৃঙ্খল থেকে, শোষণের কারাবন্ধ থেকে ;  
তাসনের মৃত্যু-মাঠ থেকে । আর আত্মা, সব প্রাণ  
যেন পায় পৃথিবীতে পূর্ণ বিকাশের অধিকার,  
বিশাল সংসার যেন পূর্ণ হয় মাধুর্যে প্রাণের ।  
জ্ঞানের দিগন্ত যত আবিষ্কৃত হয় নাই আজও  
শান্তি ও প্রেমের রাজ্যে খোলে যেন রহস্য-নেকাব !  
সকল অপূর্ণ সত্ত্বা পায় যেন পূর্ণতা জীবনে ।  
প্রতি দিন মানুষের হয় যেন মুবারক আর  
প্রতি রাত্রি হয় যেন রাত প্রশান্তির ।

ঃ অনাগত

সন্ততির, -আসে নাই যারা আজও পৃথিবীর বুকে  
(অস্পষ্ট আলোর মত দেখি আমি নিশানা যাদের  
দূর নীহারিকা লোকে), মুক্তি যেন পায় সে আউলাদ  
সকল বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার, অবিচার থেকে ।  
বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত মানুষের বিচ্ছিন্ন সমাজে



সকল বিভেদ মুছে করে যেন শান্তির আবাদ  
সকল বিশ্বাসী প্রাণ- ইনসানে কামিল । আর যারা  
পড়ে আছে লুপ্তিত ধুলায়, নির্যাতিত সেই সব  
মজলুমান পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার ;

সব মানুষের সাথে জীবনের পূর্ণতার পথে  
চলে যেন সে মিছিল কেবলি সম্মুখে । ( এই ভাবে  
মুনাজাত করি সে অতন্দ্র নিশাঁথে) ।

[হাতেম তা'রী-এর শেষ খন্ডের 'শেষ কথা' অধ্যায় থেকে  
অংশ বিশেষ গৃহীত ]

## ব্যঙ্গ কবিতা বিদায় অভিনন্দন

এবার তা' হলে ছেড়ে যাবে জমিদারী ?  
কোন মুখে বল বন্দনা গাবো তারি ।

আসতো যা' কিছু লগ্নি কাণ্ডে  
জ'মতো সে সব পুঁজীর ভাণ্ডে  
ধনতন্ত্ৰের মহিমা উঠতো জোর গলায়  
ফুটপাত ছিল ভালো আমাদের তুমি ছিলে খাসা সাত তলায় !

জানি তুমি নিতে সিংহের ভাগ তবু  
তলানিটা দিতে দেৱী কর নাই কভু,  
তাতে অবশ্য কৃতার্থ প্রাণ  
ক'রেছে তোমার গুণ ব্যাখ্যান  
জেনেছে সবাই তুমি কত বড় কত মহৎ  
তোমার উপর কতটা দেশের ভবিষ্যৎ!  
তোমার হাতেই ছিল সব ক্যাপিটাল  
এদিকে আমরা তিলকে করেছি তাল ।  
আজ ছেড়ে যাবে গরম বাজার?  
কা'রা নেবে ঐ চালু কারবার?  
জনগণ? আহা পঞ্চাশেরি সে ছুঁচোর দল  
ভাগাড়ে ম'রেও হারায়নি তবে বুকের বল !

কী ক'রব তবে? কিসে মহারাজ হবেই প্রীতি ?  
ক'রব শিল্প জাতীয়করণ বিলম্বিত?  
যার ফাঁকে তুমি পারবে চিনতে ধনতন্ত্ৰের পথ সঠিক

কী হ'ল দেশের লোকগুলো হ'ল কী বেল্লিক  
পুঁজীর সীমানা বেঁধে দিতে চায় ধনতন্ত্ৰের শেকড় উপড়ে  
অতি বিজ্ঞানী কঠিন চিন্তা হৃদয় পদ্ম দিচ্ছে ঠুকরে

আহা ফেরাউন মরছে দুঃখে হয় কারুণ্যের স্বপ্ন ভঙ্গ  
পাকিস্তানের ঝাণ্ডা ওড়িয়ে ছেলেরা দেখায় বিষম রঙ্গ।  
যত বদমাস করে থাকে আশ (ভালো ছিল পরাধীন সে বঙ্গ)

(স্বাধীন হবার মজার বোঝা মন  
হায় জমিদার হায় মহাজন  
হায় পুঁজীপতি সামলাও গতি, রোধ কর এই অসৎ সঙ্গ॥  
[প্রথম প্রকাশ : নওজোয়ান, ১০ই বৈশাখ, ১৩৫৫]

# আনারকলি (গীতিনাট্য)

## প্রথম দৃশ্য

ইরান : উৎসবের দিন

[সমবেত কণ্ঠের গান]

ইরারেন গুলশান হল উচ্ছল

মেলে আঁখি নার্গিস : জাগে শতদল ॥

পাতায় পাতায় ঘাসে

শিশির কণিকা হাসে,

নিশীথের শবনম

হ'ল উচ্ছল ॥

গুরু হ'ল খোশরোজে খুশীর খেলা,

গোলাবের পাঁপড়িতে রঙের মেলা ॥

শোনে মন উন্মাদ

মৌমাছি গুঞ্জন ।

এ খুশীর খোশরোজে

চির চঞ্চল ॥

সেহেলি ॥ কি কথা বলিস ? শোন সেহেলি

সকলে যখন উঠেছে মেতে,

খোশরোজে তোর বাধা কি যেতে?

আনার ॥ লক্ষ বিপদ ঘিরেছে যারে

যেতে হবে যাকে এ দেশ ছেড়ে

এ খুশীর হেলা সাজেনা তার ।

সেহেলি ॥ কোন দূর দেশে যাবে সেহেলি

সে দেশে কি হয় দুঃখ নাই?

আনার ॥ কি আছে উপায় মজলুমের

আলোর ইশারা খুঁজে না পাই ।

সেহেলি ॥ কাফেলার পথ নাই তো জানা,

ফররুখ আহমদ ১৬৪

তবু শুনবে না তুমি এ মানা  
আমিও তোমার সঙ্গে যাব ।  
আনার ॥ দূর সুদূরের পথে কাফেলা  
ডেকেছে আমাকে অন্ত বেলা,  
বিদায় ইরান । - হোদা হাফেজ ॥  
(উভয়ের প্রস্থান)

[দুই : কাফেলা ]

[গান ]

দিন রজনীর পথে চলে এই কাফেলা  
নিত্য ভাসি আঁখি জলে এই কাফেলা ॥  
দুঃখ রাতের বেসাত নিয়ে চলছে হায়  
চলবে নিতুই পলে পলে এই কাফেলা ॥  
রাতের ছায়া নামলে কাল দিন শেষে  
খুঁজবে কি সুর তারার দলে এই কাফেলা ॥  
চলার তালে হাজার পথের বাঁক ঘুরে  
পাবে কি ভোর ফুল ফসলে এই কাফেলা ॥  
কেউ জানে না কোন্ সে বিজন দূর দেশে  
ঠাই পাবে কোন্ আকাশ তলে এই কাফেলা ॥

[ তিনঃ সীমান্ত রক্ষী ফৌজের ছাউনি]

প্রথম রক্ষী ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও কাফেলা-সালার !

হিসাবের শেষে

যেও দূর দেশে

হয় নাই শেষ গিরি-কান্তার ।

কাফেলা-সালার ॥ দূরে যাও, দূরে যাও ...

এ কাফেলা নয় পণ্যের

এ কাফেলা নয় স্বর্ণের,

এ কাফেলা চলে তকদির সন্ধানে ।

দ্বিতীয় রক্ষী ॥ কে ঐ রূপকুমারী

কেন নিয়ে যেতে চাও

বুঝিতে না পারি ;  
ফিরে যাও কাফেলা সালার ।

কাফেলা-সালার ॥ আছে আছে গিরি -কান্তার  
পথ রেখা নাই ফিরিবার  
যে নারী চলেছে সাথে  
নিয়ে আঁখি নীর  
তার দূরাশায় জাগে  
তার তক্দির ।

প্রথম রক্ষী ॥ চ'লে যাও কাপেলা সালার ।  
দুঃখের কালো মেঘে  
হয়তো বা দেখা দেবে  
ক্ষণিকের সুখ স্বর্ণাভা ।  
[কাফেলার প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য  
[এক : হিন্দুস্তান]  
[বাজার]

প্রথম সওদাগর ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও থেমে  
কাফেলা-সালার উট ছেড়ে এস নেমে ।  
দ্বিতীয় সওদাগর ॥ ইরানের কোন্ সওদা এনেছ সাথে?  
গালিচা ?  
শারাব ?  
খঞ্জর?

শামশির ?  
আনো নাই বাঁদী হাসিন খুব সুরাত?  
কাফেলা-সালার ॥ দূরে যাও, দূরে যাও .....  
এ কাফেলা নয় পণ্যের  
এ কাফেলা নয় স্বর্ণের,  
এ কাফেলা চলে তক্দির সন্ধানে ।

প্রথম সওদাগর ॥ সুন্দরী নারী কে ঐ পরীর মত  
ওর পরিচয় দিয়ে যাও অন্তত ।  
কাফেলা-সালার ॥ হৃদয় যদি না চিনে নেয় হৃদয়েরে  
পারবে না কেউ চিনতে কখন এরে ।  
প্রথম সওদাগর ॥ এখানে পাবে না ছাড়া  
যেতে হবে শাহ'দিরবারে ।

দুই : শাহজাদা সেলিমের কক্ষ ।  
প্রথম সওদাগর ॥ শোন ফরিয়াদ বাদশাজাদা  
চ'লেছিল দূরে এই কাপেলা  
সাথে নিয়ে নারী অপরিচিতা ।  
কাফেলা-সালার ॥ নহে লুপ্তিতা, অবগুপ্তিতা নারী  
যে এসেছে তার তক্দির সন্ধানে ।  
সেলিম ॥ চিনেছি, চিনেছি আমি  
আমার আত্মার  
সকল রোশ'নি দিয়ে চিনেছি নারীকে,  
খুঁজিয়াছি যারে আমি  
এল সেই জোহরা সিতারা ।  
আনার ॥ মন যার আশ্রয় পিয়াসী  
চিনিয়াছো নেই অচেনারে  
দূর যাত্রা পথে কাফেলার ।  
সেলিম ॥ রহ নারী মন্জিলে আমার॥  
[তিন মোগল হেরেম]  
[কিছুদিন পর ]

আনার ॥ নিঃশেষে আমি দিয়েছি ছিল যা মোর  
এখনো তোমার তৃষ্ণা কি মেটে নাই?  
সেলিম ॥ পিপাসা আমার বেড়ে যায় অবিরত  
অন্তবিহীন মরু সাহারার মত,  
চেয়োনা জানিতে অকারণে পিছু ডেকে  
দাও আরও দাও রূপের সুরাহি থেকে ।

আনার ॥ সুগু মনের পল্লব দল খুলি  
যা ছিল আমার দিয়েছিতো সব তুলি

সেলিম ॥ মনে হয় তবু উন্না উদাসীনি  
কিছু দিলে আর কিছু বুঝি নাহি দিলে,  
পেয়েছি তোমাকে মোগল হেরেমে, তবু  
মন আছে তব আর কোন্ মন্জিলে।

আনার ॥ হয়তো বুঝেছ, হয়তো বা বোঝ নাই  
শান্ত জীবনে এবার জানতে চাই,  
ক্লান্ত আমি এ মোগল হেরেমে আজ  
ইরানী হাওয়ায় মুক্তি পরশ চাই।

সেলিম ॥ কাছে এলে তবু ওগো বিদ্যুৎ শিখা  
চির দিন তুমি র'য়ে গেলে প্রহেলিকা।  
(সেলিমের প্রস্থান)

আনার ॥ (পিঞ্জরের নিকটবর্তী হইয়া)  
খাঁচার বাঁধন দিলাম খুলে  
শোন হিরামন  
ইরানী সেই তুতীর কানে  
বোলো নিশুত রাতে  
সেহেলি তার বন্দিনী আজ  
মোগল হেরেমে ॥  
[খাঁচার দরজা খুলিয়া দেয়]  
[রত্নার প্রবেশ]

রত্না ॥ অপরূপ ইরানী তুতীরে  
বন্দী কে ক'রেছে এনে এ বালাখানায়,  
নারী আমি,  
তবু আজ মন ফিরে চায়  
পুরুষের রূপ ধরি জানাতে প্রার্থনা।

আনার ॥ কে তুমি ? কি চাও এখানে বল  
বুঝিতে না পারি কিছু তার।



রত্না ॥ আমি রত্না অচেনা তোমার ।  
কোন মায়াবিনী তুমি বিশ্বের সুষমা  
তনু দীপাধারে তব রাখিয়াছ জমা  
ঘন অন্ধ নিশীথের উজ্জ্বল তারকা?  
আনার ॥ অচেনা ? অচেনা নহ, সেহেলি আমার  
মুক্ত কর পথ মোর বাহিরে যাওয়ার,  
শ্বাস রোধ হ'য়ে আসে মোগল হেরেমে ।

রত্না ॥ কোস্নে ও কথা কোস্নে  
আত্মঘাতিনী হোসনে,  
ওরে বন্দিনী এখানে যে কেউ  
স্বপ্নে ও কথা বলে না ;  
ভুলেও ও পথে চলে না॥

আনার ॥ শুনব না আমি শুনব না,  
শাহী তখ্‌তের আড়ালে মনের  
রঙ্গিন স্বপ্ন বুনবো না,  
মোগল হেরেমে শুধু অপমান,  
মেলে না এখানে মানুষের প্রাণ,  
পাথরের মত ঘিরে আছে হায়  
জুলুমশাহী ॥

[গুপ্তচরের উঁকি দিয়া প্রস্তান]

রত্না ॥ হায় হায়হায়  
একি ভুল তুই করলি?  
গুপ্তচরের কানে গেছে কথা,  
সে তো বুঝবে না এই ব্যাকুলতা;  
নিজের দোষে যে মরলি ।

[ চার : বাদশা আকবরের রংমহল ]  
[ আকবর ও সেলিম ]

আকবর ॥

পথ-প্রান্তে নেমে  
কারে আনিয়াছ তুমি মোগল হেরেমে?  
সে তোমার যোগ্য নেহ, তুমি উর্ধ্বে তার ।

সেলিম ॥ নহি আমি যোগ্য তার

বাদশা নামদার,  
অনাদূতা যে গোলাব ছিল গুলশানে  
ফুটেছে সে এ জীবনে বিপুল সম্মানে ।

আকবর ॥ মায়াবিনী সে তোমাকে টেনেছে বিপথে  
গুপ্তচরী সেই নারী, তুমি তা' জানো না ।

সেলিম ॥ গুপ্তচরী নহে নারী,

বঞ্চিত বাসনা  
করিয়াছে ওরে অন্যমনা !  
ইরানের হরিণী ও  
শাহী মহলের কথা  
কিছু শেখে নাই ।

আকবর ॥ মানে না যে মর্যাদা রাজার

পাবে সাজা, পাবে দণ্ড তার  
মোগল হেরেমে তার  
স্থান নাই, কোন স্থান নাই ।

সেলিম ॥ বিচারের এই প্রহসন !

বলদর্পী বাদশার ।  
একি তিক্ত অবিচার  
মুছে দেয় নিষ্পাপ জীবন?

আকবর ॥ এ আদেশ মোগল বাদশার,

এ আদেশ হুকুমত যার ।

সেলিম ॥ মানি না, মানি না আমি এই অবিচার ।

আকবর । মূৰ্খ পুত্র । একি জানা নাই



আমি সেই শা'জাদা সেলিম,  
নিরাশার হিম-ছোঁয়া লেগে  
আশা যার হ'য়ে গেছে হিম ;  
খোল খোল জিন্দান দ্বারা ।

প্রথম প্রহরী ॥ যে নিষেধ ছিল বাদশার  
সে নিষেধ ভুলে যাব আজ,  
মাণ্ডকের দুয়ারে শুনেছি  
আশিকের পায়ের আওয়াজ ।

দ্বিতীয় প্রহরী ॥ চ'লে যাও শা'জাদা সেলিম  
ফিরে এসে প্রভাতের আগে,  
কাক পাখী যেন নাহি জাগে  
[দরজা খুলিয়া দিল]  
[দুই : কারাভ্যস্তর । স্তিমিত দীপ আনার কলির কক্ষ ]  
[ সেলিমের প্রবেশ ]

সেলিম ॥ শেষ দীপ্ত নিভিবার আগে  
এসেছি আনার শেষ রাতে ।

আনার ॥ এসেছ, এসেছ এই রাতে?  
নেভে নাই জোহরা সিতারা,  
ফোটে নাই গোলাব কুঁড়িরা  
মরণের হিম সজ্জাতে ।  
এস এস তুমি এই রাতে ।

সেলিম ॥ ক্ষমা নেই যে পাপের  
অপরাধী আমি সেই পাপে,  
তিক্ত মোর অক্ষমতা  
আনিয়াছে এ ব্যর্থতা ;  
ঝরে ফুল সেই অভিশাপে ।

আনার ॥ মুছে নাও মনের ম্লানতা,  
ব্যর্থ গ্লানি যাও ভুলে যাও,

শেষ নিমেষের পাত্র  
পূর্ণ করি আজ তুলে দাও ।

সেলিম ॥ দীপশিখা নিভে যায় যাস  
আমি সে ক্লান্ত শামাদান,  
গোলাবের দিন শেষে হয়,  
কন্টক-ক্ষত গুলশান  
সুখ স্মৃতি সুদূরে উধাও ।

[ জল্লাদের প্রবেশ ]

জল্লাদ ॥ শোন শোন বাদশার ফরমান  
মানেনি যে রাজাদেশ  
বিষ পাত্রে হবে শেষ  
বন্দিনী সে আনারের প্রাণ ।

সেলিম ॥ জল্লাদ খোল তলোয়ার ।  
[ তলোয়ার কোষমুক্ত করিলেন ]

জল্লাদ ॥ রাখো তলোয়ার,  
এ আদেশ বাদশার ।

সেলিম ॥ মানি না, মানি না আমি  
মানুষের কোন অবিচার,  
সে আদেশ হোক বাদশার ।

জল্লাদ ॥ বাদশার শোন ফরমান  
রাজরোষে যাবে যার প্রাণ  
পাবে না সে কোন সম্মান,  
বন্দী তুমি রাজার কুমার ।

[জল্লাদের ইশারায় কয়েকজন প্রহরী বিদ্যুদ্বিগ্নে সেলিমকে বন্দী করিল ]

জল্লাদ ॥ (আনারের প্রতি) লহ বিষ পাত্র  
ক্ষণিকের অবকাশ নাই ।

আনার ॥ মুক্তি চাই, আজ মুক্তি চাই,  
বিষ পাত্রে নাই শংকা নাই ।

চিনেছিল দৃষ্টিতে যে জন  
পারিল না কাটিতে বন্ধন;  
শেষ কথা তবুও জানাই ...

জল্পাদ ॥ লহ লহ বিষ পাত্র

ক্ষণিকের অবকাশ নাই।

আনার ॥ দাও তবে, দাও তবে তাই।

ছাড়িতে চাহেনা মন

যে মনের বন্ধন

রেখে যাই; তা'ও রেখে যাই।

জল্পাদ ॥ জীবন তোমার নিভে যাক এই

জহরের পেয়ালাতে

[বিষ পাত্র তুলিয়া দিল]

আনার ॥ দাও জহরের পেয়ালা আমার হাতে

[বিষ পাত্র গ্রহণ করিল]

হায় এই অবেলায়

নিঃশেষে আশা ঝ'রে যায়,

মুক্তি পিয়াসী প্রাণ পেল কি প্রতিদান

জহরের নীল পেয়ালায়।

[বিষ পান করিয়া]

[তিনঃ আনার কলির মাজার]

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম ॥ মৃত্যুর সমাধি অতলে

সে আজ ফেলিছে হিমশ্বাস,

শিয়রে কাঁদিছে তার

সীমাহীন রাতের আকাশ।

নিরাশা শ্রান্ত মন

জাগে যার মরণ আঁধারে

জীবনের চাওয়া তার

কেঁদে যায় প্রিয়ার মাজারে॥

যবনিকা

[প্রথম প্রকাশঃ পাকিস্তানী খবর, ৯ই এপ্রিল ১৯৬৬]

# নিবেদিত কবিতা





# আমার গর্ব

আবুল হাশেম

[ধর্মতলার স্ট্রীটে একদিন গুমোট সন্ধ্যাবেলা,  
তালপাখা নিয়ে শ্রীম্মের সাথে হচ্ছিল মোকাবেলা ।  
এমন সময় হাতে এসে গেল “সাত সাগরের মাঝি”  
তুলোট কাগজে নিখুঁত সাজানো যেন কবিতার সাজি ।  
হাতে নিয়ে দেখি, এ কি অদ্ভুত সাগরের গর্জন !  
চেউয়ে চেউয়ে ওঠে ক্ষুদ্র মনের কি এক আফালন ।

তুচ্ছ করে সে ঝঞ্ঝা-ঝাপট অশনির সংঘাত  
ক্ষিপ্ত সাগরে পাল তুলে ছোটো বাহরী সিন্দাবাদ ।

দশ বছরের স্মৃতির ফলক পলকেই গেল খুলে  
মন চলে গেল খুলনা শহরে রূপসা নদীর কূলে ।

জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনখানা সম্পাদনার তাড়া  
আমার মগজে গজগজ করে দিচ্ছিল বেশ নাড়া ।

এমন সময় কিশোর বালক চোখ দুটো টানাটানা,  
টেবিলের কোণে রেখে গেল তার ক্ষুদ্র কবিতাখানা ।

ক্ষুদ্র হলেও পড়ে দেখি, এ কি ! নতুন ছন্দদোলা  
দোলাইয়া গেল নিভৃত মনের অনুভূতি চঞ্চলা !  
ভাবলাম মনে কোথা হতে হবে হয়তো পাচার করা  
অনেকেই করে সে শুভ কাজের কয়জন পড়ে ধরা !

এই ভেবে অবশেষে

কবিতাটি তার পাঠিয়ে দিলাম প্রেসে !  
এতদিন পরে কানে এল সেই সিন্ধুর গর্জন  
বাহরী ছুটেছে লক্ষ্য যে তার হেরার রাজতোরণ ।

রক পাখি যেন উড়ে চলে যায় শোনে না সে কারও মানা,  
সাইয়ুম যেন মনসুন সাথে জড়িয়ে দিয়েছে ডানা ।  
দিজলা যেন রে পদ্মার সাথে এ দেশে নহর তোলে  
দিলরুবা আর সেতার বীণায় বাংলার নদী দোলে ।  
গর্বে আমার বুকখানা ওঠে ফুলে  
সেই পথিকের প্রলধ তোরণ আমিই দিয়েছি খুলে ।

# বাতিঘর

তালিম হোসেন

(কবি ফররুখ আহমদকে)

আবার জুল্মাত-ভরা ঝঞ্চাশ্চক্ক রাত্রি সমাগত,  
বা'র দরিয়ার মাঝে জাহাজের বিসস্ত বহর-  
বিভ্রান্ত নাবিক কাঁপে, চোখে তার সিঙ্কু দূরায়ত :  
তুফান-উত্তাল পথে গুমরাহা খোঁজে বাতি-ঘর।

আজকে দিনের এই নাবিকের খবর পেয়েছ তুমি-  
পরিক্রমণ করেছে কি তার উদ্বেল মনোভূমি ?  
তার জাহাজের মাল্লারা আজও কেউ-বা অসাড় ঘুমে,  
কেউ-বা খেলার মউজে মত্ত তাবাহীর মৌসুমে।  
মনজিল-রাহা জানে নাকো তারা, রাখে না তার খবর  
বরবাদী আর আবাদীর মাঝে কোথা সেই বাতিঘর !  
ঢেউয়ের তাজীতে আসোয়ার হয়ে তাদের জিন্দেগানী  
পথের উপরে আবার তুফান- তাবাহীর সন্ধানী।  
সিতারার গর্দিশের আরেক মনহুস লগ্নু আজ মনে পড়ে :  
বিভ্রান্ত নাবিক-তার পথ রোমে দরিয়ার আঁধি-অন্ধ রাত  
সে জুলমাৎ-তরঙ্গের গিরি -সঙ্কটের মাঝে, সে মৃত্যু-প্রহরে  
সিরাজুম মুনীয়ার নূরানী তাজ্জাম ব'য়ে এলো সুপ্রভাত।  
দরিয়ার সেই তাবাহীর বাঁকে জুললো যে বাতিঘর-  
তার সে-ইশারা সন্ধান দিল পানাহীর বন্দর।  
সেই সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে যেতে যেতে কবে  
মুক্তির দিশা হারালো যে ফের ধ্বংস-বাঁশীর রবে।  
আবেহায়াতের সন্ধান কবে ভুলল সে বেখেয়াল,  
আল-কিমিয়ার মোহ-জিন্দানে জমা হল জঞ্জাল।  
আজকে আবার সেই নাবিকের পথ যে লুপ্ত -রেখা  
ঘনাক্ষকার পেশানিতে তার পড়েছ কি কোন লেখা?

সিরাজুম মুনীয়ার নূরানী তাজ্জাম থেকে আবার সে স্নিগ্ধ আবহায়াত এশানে নামবে  
কবে? যা'র দরিয়ার বাঁকে কেটে যাবে মৃত্যুর প্রহর, মাল্লারা উঠবে জেগে, গুমরাহা  
এ নাবিক পাড়ি দেবে তাবাহীর রাত, মনজিলের পথে পথে নূরানী ইরশাদ ব'য়ে  
জাগবে আবার বাতিঘর।

## ফররুখ স্মরণে

সৈয়দ আলী আহসান

তোমার হাতে হাত মিলিয়ে  
একদাতো যাত্রা ছিল,  
বন্যাবেগে হৃদয় তখন  
শঙ্কাবিহীন সাগর ছিলো ।  
এখন যদি থাকতে তুমি  
তোমার হাতে দিতাম তুলে  
তরুণ প্রাণের ইচ্ছাগুলো  
যদিও দ্বিধার শঙ্কা ছিল ॥

•

## ফররুখ-স্মৃতি

মুফাখ্খারুল ইসলাম

এক.

ফণায় রোধিয়া রৌদ্র এ ছায়া কে করেছে বিস্তার  
ঘুমন্ত রাখাল মুখে ? বিষাক্ত দু'মুখা সাপ ঘুম  
নামায়েছে যে ছোবলে, তার চোখে কস্টীরাশ্রুফোঁটা ?  
- ধাঁধাতন্ত্রে আঁধা করি মানবাত্মা করেছে সংহার  
যেন বনু ছায়িদার ছাকীফায় ডাকাতি-মৌসুম :  
ধূর্তের (জনতা-নামে) নবোদ্ভাবী জন-পেষা ঘটা । |  
আলীজাদা হত গর্ভে, নবীজাদী প্রহত হস্তার,  
তাই কি বিস্মৃত চির-চেতনার সে গদির-খুম?

নৈরাজ্য মাতংগী ক্ষিপ্ত, তবু সেই শব-শিরে ভ্রমে  
বিমথি' পাশব সংঘ, সে বিভ্রান্ত জনতা জঞ্জালে  
দ'লে পি'ষে পড়ে গিয়ে আলীবর্দীকন্যা আমিনার  
কদমে জানাতে শেঠ-জাফর-মীরণ সমাচার :  
সিরাজজননী ছোটো জনপথ বিদারি' মাতমে,  
চুষনে চুষনে ভরে উন্মাদিনী বিস্কৃত দুলাল ।

দুই.

তোমার সিয়াম শেষে পেয়ে গেছ অতীট জান্নাত,  
সে তোমার ঈদ । আমরা পেলাম তাই মুহর্রম  
চাঁদের মাতম সাড়া, কারবালার খুনালুদা স্মৃতি,  
নবীর কলিজাতুল্য গাজী হোসেনের শাহাদাত,  
জীবনে জীবনে মুক্তি-তৌহিদের কীমত পরম  
নীরবে সঞ্চারমান, বালু তলে ফোরাত সংস্থিতি :

এতদিনে জাহির বাহিরে তার নদীকলনাদ  
মৃত্যুঞ্জয়ী । মরু-দীল পরাজয় লভেছে চরম ।  
নবীর ওফাত থেকে আজতক নবীবংশ অরি  
-এজীদেব সূত্রে যারা গাঁথা-তাদের বীভৎস রূপ  
দেখেছি । দেখেছি দস্যুবৃত্তি ছায়িদার ছাকীফায়,  
জুটেছে পিচাশ যত নবীজির লাশ পরিহরি'  
বে-কাফন । তাদের গুরসজাত অনুরূপ  
নবীঘাতী ফিরে চক্ৰী নির্লজ্জ চীৎকারে হামেশায় ॥

তিন.

নীরব নিখর সেই মুখর মুখের পেশী হাসি,  
চোখের সে-চাহনি চঞ্চল বিঘর্ণিত চারিদিকে,  
সব শুদ্ধ । তুমি আছ কাছে দেখি; আসলে সুদূরে  
তবু তুমি চলে গেছ ; যারা আগে বেদনা বিলাসী,  
-কাঁদে তারা, চোখ মোছে, তারা কত মুখর আজিকে ।  
এ তোমার জীবন সম্বল করি' যেন প্রাণ পু'রে  
তাদের ভরসা রশ্মি ফাঁক পেয়ে দেখা দিল আসি'  
দালাল বিবরে-নগ্ন মৃত্যু দিয়ে মুক্তিপত্র লিখে ।

হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, তবু লোভ মুমিন নামের,  
নয়নে আলোক নাই, চাহে অন্ধ আকাশের আলো,  
সে অদ্ভুত মুনাফিকী । জীবন বোঝে না কোন কালে,  
তারা লিখে নেয় মুমিন কিতাব উকী দিয়ে ভালে,  
দেখিলে ত ? সৎপথচারী নাম নেয় বেশ ভালো,  
অথচ আদর্শানুগ নয় কেহ সুন্না-কোরানের ॥

## ফররুখ আহমদ স্মরণে

আবদুল হাই মাশরেকী

হরিণ এখনও আনে বাঁকা শিঙে চাঁদ  
সে এক সুন্দর বনের হরিণ  
আইনগত হত্যা নিষিদ্ধ যদিও,  
তবুও করুণ শিকার শিকারীর।

হায় সেই সুন্দর বনের হরিণের শিঙে আনা  
মরু এক চাঁদ  
বিষণ্ণ স্মৃতির মত  
আমাদের আকাশের কিনারায়  
আজও ভাসে;

গ্রাম-গঞ্জ-বন্দরে  
অতন্দ্র রাত্রির উৎসবে  
সিয়ামের সাধনায়  
অজস্র তারার মত  
মানুষ জ্বলবে চিরকাল।

বাংলার মাটিতে এসে  
সুদূর হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন-  
শান্তি সাম্য মানবতার সে মহান তোরণ  
মানুষে ডাকছে চিরকাল,  
আরেক নতুন উত্তরণ হবে  
পবিত্র সে হেরা-পর্বতের চড়াই-উৎরাই শেষে।

আমারেদ সিন্দাবাদ।

বাংলার চট্টালায় এখনও ঘুমায়,  
ভাঙা তার মাস্তুলের আগায় এখনও

জ্বলছে উজ্জ্বল শিখা-  
পাড়ি দিতে হবে সাত সাগরের ঢেউ ।

এদিকে রাত্রির তপস্যার মত  
ডাহকের ডাকে

বেতস লতায় বাজে  
জীবনের এ কোন্ অতলস্পর্শী সুর?  
সে তো এই বাংলায় সোঁদাল মাটির গন্ধে  
নিজেকে হারিয়ে ঝোঁজা

অমর চৈতন্য এক-  
তিমির রাত্রির শেষে  
আসবে কখন সূর্যালোক?  
সন্টার গভীরে জেগে থাকে-  
বিদগ্ধ প্রাণের প্রশ্ন :

‘রাত পোহাবার কত দেৱী পাঞ্জেরী ?’



# কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুতে

আবদুর রশীদ খান

এমন প্রশান্তি আমি কোনদিন দেখি নি তোমার  
দু'চোখে, ঠোঁটের ফাঁকে কোনদিন এমন তৃপ্তির  
পরশ দেখি নি আর। মনে হয়, সাত সাগরের  
উদ্দাম পাড়ির শেষে পথশ্রান্ত সিন্দাবাদ তার  
দু'চোখে পেয়েছে আজ প্রশান্তির ঘুমভরা রাত।  
চোখ নয়- যেন তীব্র দ্যুতি, যেন তীক্ষ্ণ তলোয়ার।  
স্থির বিদ্যুতের প্রভা এই চোখ ছড়াবে না আর।  
জাগাবে না প্রত্যয়ের স্বর্ণদ্বীপ দু'চোখে আমার।  
দুস্তর পাড়ির শেষে এইমাত্র ক্রান্তির শরীর  
এলায়েছ শেষবার। সাত সাগরের নোনা জলে,  
হাজারো লবংগ দ্বীপে, মুহূর্তের অতুল বৈভবে,  
রূপ-কাহিনীর দেশে কী সহজে গেছো বারবার  
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিপুণ কথার জাদুকর  
সিরাজাম মুনীরায়ে উদ্ভাসিত এই চোখ আর  
হবে না আশ্বাসময়। দৈনন্দিন তুচ্ছ দীনতার  
অসম্মান পৃথিবীর মুখ ছুঁড়ে আত্মার ডালক  
দু'ডানায় অলৌকিক আলো মেখে এখন উধাও।

বেদনা কি অপমান, অযোগ্যের হীন আক্ষালন  
সাগরে রাখেনি ছাপ। চিরদিন সাত সাগরের  
সমস্ত বৈরিতা পেয়ে জীবনের পরম সত্যের  
ঝিনুকে নিমগ্ন ছিলে। অথচ কী নির্মম আঘাতে  
অন্যায়ের শৃঙ্খলের শোষণের কাপাঁয়েছ ভিত!

কথা যেন সৈনিকের উদ্ভাসিত নাক্সা তলোয়ার।  
মানুষের কাছে তুমি পাতো নাই করুণার হাত,

উর্ধ্বমুখি ইশারায় জানায়েছ : সব আকাঙ্ক্ষার  
কেবল একটি ঠাই, আর সব ভিখারীর পাতি ।

তুমি তো একক দ্বীপ । দূর থেকে আমরা তোমার  
ঐশ্বর্যে ঈর্ষিত প্রাণ । ঐতিহ্যের বিচিত্র সম্ভার ।  
মানি নি আপন ব'লে । কী আশ্চর্য ! আকণ্ঠ পিপাসা  
মিটায়ে সুপেয় জলে, মন ভরে নারান্ধী দোলায়  
আমরা দিয়েছি পাড়ি অন্য কোন দ্বীপের সন্ধানে ।

উপেক্ষা বাংলার ভাগ্য । প্রতিভাকে নটীর সম্পদ  
বানাতে হওনি রাজী, তাই আজ তোমার করুণ  
অকাল নিভৃত মৃত্যু । মুখপাত্র ছিলে জনতার ।  
জনতা কাতারবন্দী এ মুহূর্তে দুয়ারে তোমার ।

# একজন কবিঃ তার মৃত্যু

শামসুর রাহমান

সে নয় ঘরের কেউ তবু ঘরেই ঘুমন্ত । অতিশয় শীর্ণ  
অবয়ব, এলোমেলো দীর্ঘ চুল, গালে দু'দিনের  
না কামানো দাড়ি  
এবং শরীর তার নিঃস্পন্দন নিঃসাড়, যেন তারহীন বীণা,  
বাজবে না কোন দিন আর ।  
দেয়ালের গোয়েন্দা খানিক দেখে তাকে সুদর্শনা  
পতঙ্গের দিকে  
ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হয় । অকস্মাৎ জানালায় ছায়াচ্ছন্ন  
বকুলতলার এক সঙ্গীতপ্রবণ পাখি এসে বলে গেল-  
নেই, নেই, নেই ।  
পুড়ছে আগরবাতি, বিবাগী লোবান । ঘরে নড়ে নানা লোক,  
প্রবীণ, নবীন ছায়া পাঁশটে দেয়ালে ।  
অনুরগী কেউ আসে কেউ যায়, দ্যাখে তার সমস্ত শরীরে  
উচ্চারিত মৃত্যুর অব্যয় মাতৃভাষা ।  
আসেন সমালোচক, পেশাদার ; বন্ধু কেউ কেউ, জুটে যায়  
বেজায় ফেরেবাজ প্রকাশক । অনুরক্ত পাঠক নোয়ায় মাথা আর  
বারান্দায় ভিড়ে  
বলপয়েন্ট স্ক্রিপ্ট নিচ্ছে টুকে জীবনীর ভগ্নাংশ নিপুণ  
নৈর্ব্যক্তিক স্টাফ রিপোর্টার ।  
কোন সালে জন্ম তার, কী কী গ্রন্থের প্রণেতা, কজনই বা  
পুষি রইলো  
পড়ে ঘোর অবেলায়, নাকি সে অবিবাহিত ইত্যাদি সংবাদ  
দ্রুত প্যাডে জমা হয়, তবু  
জীবনের আড়ালে জীবন খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায় ।  
এইদিন তার নয়, এই রাত্রিও তো নয়, এখন সে শোকাশ্রয়

কেউ নয়, লোবানের নয়, বকুলতলার সেই মুখ্য  
সুরেলা পাখিরও কেউ নয়। স্বপ্নময় সোনালী রূপালী মাছ  
ফিরে যাবে না পেয়ে সংকেত ; এখনতো ভাঙাচোরা  
তৈজসপত্রের মত ইতস্তত রয়েছে ছড়ানো তার সাধ, বিফলতা।  
প্রজাপতি কোথায় কোথায় বলে বারবার-উড়ে যায় দূরে।  
ক'জন রমণী আসে উদ্বেলিত বুক আর কান্না নিয়ে চোখে,  
কেউ কেউ গোপন প্রেমিকা

হয়তো বা ; কারো হাতে ফুল তরতাজা, রাখবে কি দ্বিধাহনি  
নিরালা শিয়রে?

কারো বুকে শূন্যতার স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল হয়, কারো ভীক  
সত্ত্বাময় জেগে রয় একটি অব্যক্ত ধ্বনি : হে শিল্প, হে কাল  
পাইনি, পাইনি।

কেউ আসে কেউ যায়, যথারীতি দ্যাখে ঝুঁকে, কী যেন বিহবল  
ঝোঁজে তার চোখে-মুখে, নিথর আঙুলে, টেনে নেয় কী উদাস  
ধূপের সুগন্ধ বুক। শূন্যে ঝলসিত পাখসাট,  
কখন হঠাৎ এক ঝাঁক হাঁস নামে ঘরে, পুশিদা, সফেদ;  
মায়াকাননের শোভা প্রস্ফুটিত চারদিকে, যে আছে ঘুমিয়ে তাকে সমাগত স্নেহে  
করাচ্ছে কোমল স্নান সমুদ্রের নীল জল,  
পায়ের পাতার কাছে একটি প্রবাল দ্বীপ শালবন, দীর্ঘ  
তরুণ পথরেখা, ঝোপঝাড় সমেত খরগোশ জেগে ওঠে-  
কেউ দেখল না।

হাতে ফোটে পদ্মকলি, রাশি রাশি, বুকে ঝরে পাপড়ি গোলাপের ;  
চকিতে হরিণ আনে ডেকে দূর-স্মৃতি দিগন্তের ঠোকে খুর  
ঘরের মেঝেতে নাচে, ঝিরিঝিরি ঝরনা, তার কানে বন্দনামুখর-  
কেউ দেখল না।

পদাবলী উজাড় পথের মত ঠোটে একে একে দ্যায় ঐকে  
বিদায়ী চুম্বন।

দৃষ্টির প্রখর দীপ্তি, আনন্দ বিষাদ কিংবা উচ্ছল কৌতুক,  
ঈর্ষা, ক্রোধ অথবা বস্তুর জন্যে কাতরতা, কলহ, বিলাপ  
এবং দুর্মর ইচ্ছা আমৃত্যু কবিতা রচনার, রৌদ্র আর  
জ্যোৎস্নার ঈষৎ কম্পনের সঙ্গে কথোপকথনে মাঝে মাঝে

গভীর মেতে থাকার অভ্যাস, নিভৃত হৃৎস্পন্দন-সবইতো  
ছেড়ে গেছে একযোগে । শুধু আত্মা তার একটি অদৃশ্য  
মালা হয়ে দোলে সারা ঘরে অগোচরে ; বকুলতলার পাখি  
আবার বসলো এসে জানালায় একা, গানে গানে বলে গেল-  
নেই, নেই, নেই ।

ভিড় কৃশ হলে, থেমে গেলে পাঁচমিশেলী গুঞ্জন, সুনসান  
নীলিমার থেকে এল নারী কেমন আলাদা ।

অলক্ষ্যে সবার

খুব নিরিবিলা

দাঁড়ালো শয্যার পাশে কী সঙ্গীতময় অস্তিত্বের তেজে ঝঙ্কু,  
একাকিনী, অদৃশ্য সে মালা তার গলায় এখন । কিছুক্ষণ  
রাখে চোখ শেষ দৃশ্যে, অনন্তর নিল সে বিদায় ; শব্দহীন  
পদধ্বনি কোথায় মিলায় ।

একটি অনাবশ্যক, স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন, নিঃসঙ্গ শরীর  
পড়ে থাকে

অনেক চোখের নীচে । মনোভূমিপ্লাবী অলৌকিক

জ্যোত্স্না বলে, যাই ।

[ প্রায় দেড়মাস আগে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম । আমার স্বপ্নে ভেসে উঠেছিল  
একজন কবির মৃত্যুশয্যা । স্বপ্নে আমি সেই মৃত কবির চেহারা সনাক্ত করতে পারিনি ।  
পরদিন সকালে আমি সেই স্বপ্নকেন্দ্রিক কয়েকটি পংক্তি লিখে ফেললাম হঠাৎ ।  
তারপর আর এগোনো সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে । কবিতাটি অসমাপ্ত রয়ে গেল ।  
ইতিমধ্যে আমাদের সবাইকে গভীর বেদনায় বিদ্ধ করে লোকান্তরিত হলেন ফররুখ  
আহমদ । তাঁর মৃত্যুর ছায়ায় হয়ে উঠল এই কবিতা, যার প্রথম কয়েকটি পংক্তি  
দেড়মাস আগেই আমার মনে এসেছিল । এই কবিতায় যে কবির কথা বলা হয়েছে  
তার সঙ্গে ফররুখ আহমদের সাদৃশ্য থাক বা না থাক, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুই যে  
সেই আরদ্ধ কবিতাটিকে আজ এক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে তা এখানে উল্লেখ করা  
প্রয়োজন । ]

শা, রা.

১৩-১০-৭৪

# প্রহরের গান

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী  
(ফররুখ আহমদের জন্য)

তাহলে এ প্রহরের গান নেই ?  
শহরে বন্দরে গঞ্জে গ্রামে গ্রামে রাত্রি নামে ।  
কালপুরুষের অসি দ্বিখণ্ডিত করে  
এই ভবিতব্যহীন অঙ্ককার ।  
এই সূচিভেদ্য অঙ্ককারে, ক্ষুধার বিকারে  
চোরেরা বাহির হয় গুটিসুটি পায় ....

তারপর গুমট দুপুরে  
যখন শহরে, ঘরে ঘরে,  
জমে অনুরোধের আসর ;  
আপিসে লাঞ্ছের পর হাই তোলে বড় অফিসার ;  
বাসায় আলস্য-ক্লান্ত গিল্লিরা ঘুমের প্রচেষ্টায়  
নায়ক-নায়িকাদের চিত্রপূর্ণ পত্রিকা ওল্টায় ;  
চিলেরা খালের কাছে বাঁশের মাথায়  
বসে থাকে ধেমালী গোঁসাই-  
তখন কোথায় যাই, তখন কি গান গাই?  
এই প্রহরের কোন গান নেই?  
মেঘনা যমুনার মাঝির বৈঠায়  
নেই কি ভাটিয়ালী, নেই কি জারী?  
কোথায় বাউলের সাধের একতারা  
সে কোন অজানায় দিল সে পাড়ি?  
বেলা যে পড়ে এল, কে গাবে গান?  
গঙ্গা অববাহিকার তপ্তরোদে ক্লান্ত মহাকাল  
গুটায় চঞ্চল ডানা, মফস্বল শহরের বিবর্ণ বৈকাল

আসে দোকানীর ঘরে,  
উকীলের কেতাবী দপ্তরে,  
আসে ফুটবলের মাঠে,  
ব্যাপারীর ঘাটে,  
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কফিঘরে ...  
ডাঙীর পাণ্ডারা এসে ঢাকায় ঢাকার তর্ক করে ।  
আহা যত ঘাটের মাঠের লোক, ধানের পাটের লোক,  
সুখী হোক, ওরা সুখী হোক ...

### পুণ্যাশ্লোক

একদা ছিলেন এক দিকপাল, দেশের নায়ক-  
মেয়ে যার একবার ও পাড়ার ছোড়াটার সাথে  
গা ঢাকা দেবার জন্যে ঢাকা থেকে যায় চাটগাঁতে-  
দেশের সেবার পথ বন্ধ দেখে নিরুপায়  
গেলেন মক্কায় ।

ধনধান্য পুষ্পে ভরা বাংলাদেশে  
জিন্দেগী কাটবে বলে নেচে হেসে  
বালিগঞ্জ বে-নাগাল হ'ল তাই অগত্যা নিনেন  
ইস্কাটনে বাড়ী বানালেন॥

### ডক্টর চৌধুরী

নিউক্লিয়ার তত্ত্বে যাঁর এ-দেশেতে নেই কোন জুড়ী-  
নাতিপুষ্টি ভুঁড়ি তার, মাঝে মাঝে চা খেতে আসেন ।  
মিস রেহানার গানে তপস্যায় শান্তি আনে  
ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজীতে সাধুবাদ দেন ॥

অথচ সন্ধ্যার লগ্নে প্রণয়ের কম্পিত পলকে  
যখন নীলাভ আলো পড়ে তাঁর প্রিয়র অলকে  
তখন কি গান গাই, ছুটে যাই,  
সদরঘাটের বাসে ঠাই নাই, দাঁড়াব কোথায়-  
এখানে মশার ভীড়, ময়লা এ মশারীর কোণায় কোণায়-  
কলতলায় ব্যাং ডাকে, বাসের হর্ণের ডাক দূরে

শহরতলীর এঁদো নিস্তব্ধতা ভাঙে সে বেসুরে .....  
তাহলে এ প্রহরের গান নেই? নৌকার মাঝিরা  
পাল কেটে হাল তুলে বাতাসের জল্পনায় মাতে ...  
দুপুরে মাঠের গরু ঘরে আসে, চাষীর গোলায়  
ওঠে না শীতের সোনা। বেকার যুবক  
অকালে ধার্মিক বনে দরবেশের পায়ে পায়ে ঘোরে-  
স্তব্ধ হাড়ুড়ুর মাঠ, আহা সেই হাড়ুড়ুর মাঠ।  
কলকণ্ঠ কিশোরেরা খালি গায়ে ঢুকেছে ইক্ষুলে,  
মায়েরা আঁতুড় ঘরে।

আমাদের শহুরে জীবনে

সঙ্ক্যার আবেগ নামে প্রেক্ষাগরে ছ'টায় ন'টায়;  
ধ্যানের প্রশান্তি নামে দাবার টেবিলে। কাছারীর  
বটতলায় বিড়ি খায় বেঞ্চ বসে বুড়ো মাতব্বর।  
শ্যামল তমাল বনে যখন মেঘের ছায়া নামে,  
বৃষ্টি পড়ে, দিগম্বর ছেলেরা তখন  
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, উঠানে রাস্তায় ফাঁকা মাঠে  
কাদা ঘাঁটে ... রান্নাঘরে ব্যস্ত গৃহিণীরা  
ঘন ঘন চা পাঠায় বৈঠকখানায়- দিন যায় -  
শ্রাবণের দিন-

এই গুমটের দিন, দেশে দেশে

শীতল যুদ্ধের দিন, খৃস্ট ও বুদ্ধের দিন-  
(নিঃস্ব দেশে হাত পাতে, বিশ্বব্যাপক, দেয় মোটা ঋণ)  
অস্থির শান্তির দিন, নিষ্ঠুর ক্লান্তি দিন-  
এদিনের গান নেই ? নেই এই প্রহরের গান?



# ফররুখ ভাই

আবদুস্ সাত্তার

অফিস ফেরার পথে ইন্টারকনের কাছাকাছি  
সেদিন চমকে গেছি, অবিকল ফররুখ ভাই,  
মনে হল ছাতা হাতে চলছেন ইস্কাটনে। তার  
পিছনে তাকিয়ে দেখি আসকান টুপি ও পাজামা  
ইত্যাদি লেবাসে এক সটানে আলিফ। বারে বারে  
ডেকেও ফিরাতে তাঁকে পারি নি। কেবল আজানের  
সুমিষ্ট সুরের টানে যে নাকি আনত মসজিদে  
কে তাঁকে ফিরাতে পার ? ফররুখ ফিরে নি কখনও।

বেহায়া পোশাক পরে ফররুখ ভাই'র সম্মুখে  
দাঁড়াতে কেঁপেছে বুক ; যেমন কবিতা ছাপা হলে  
দাড়ি কমা ছন্দ যতি সব দেখে শাসাতেন খুব  
তেমনি তাঁর সে দৃষ্টি আপাদ-মস্তক ভেদ করে  
চলে যেত মর্মমূলে। তখন বুক না কেঁপে পারে?  
আজান শুনলে দেখি ফররুখ দ্রুত হাঁটছেন।

# ইশারা

মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহ

(ফররুখ আহমদকে )

আমি স্থির প্রাক্ত এক জীবনের অনন্ত গৌরবে  
যেখানে পথের পাশে পড়ে আছে মৃত-মানবতা-  
নিঃসাড়, নিস্পন্দ আজ মানুষের সে-নদী বহতা !  
মানবতা পরিত্যক্ত জীবনে প্রবল জনরবে-  
ইতিহাস মুখ গুঁজে জরাজীর্ণ দিনের বৈভবে  
যেমন উজ্জ্বল সূর্য মুখ ঢাকে আসন্ন রাত্রিতে ;  
সূর্য-তপস্যার ক্লাস্তি একাকী তবুও হবে নিতে  
সাফল্যের চিরানন্দ পাব আমি ভোরের উৎসবে ।

এ-নদী বহতা হবে, জীবনের স্পন্দনে অধীর  
সাত সাগরের পথে ছুটে যাবে দূরন্ত, উদ্দাম ;  
এ তীব্র আকাজক্ষায় উদ্দীপিত চেতনা আমার-  
সব সম্ভাবনা খোলে জীবনের অজানা দুয়ার;  
দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে তাই জেগে ওঠে মানবতা-নাম,  
ইশারা পেয়েছি আমি অন্ধকারে নতুন রশ্মির !

# ভিন্ন শিবির থেকে

আতাউর রহমান

(কবি ফররুখ আহমদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

দেখিয়াছি দূর থেকে-কাছে গিয়ে ধরবো যে হাত  
ভরসা পাইনি মনে-জেনেছি আমার থেকে দূরে  
বিপরীত মেরুদেশে-থাকো তুমি-নিঃসঙ্গ স্বরাট  
রাত্রিদিন ধ্যানরত-স্বপ্নের ঈগল নভ জুড়ে।  
দিনরাত নিদ্রাহীন-দুর্বিষহ বার দরিয়ায়  
সঙ্গী সাথী ধৈর্যহারা-কামনার দংশনে বিক্ষত;  
পরিশুদ্ধ প্রাণ নিয়ে জাগো একা, হে হাতেম তাঈ,  
পাঞ্জেরীর প্রতীক্ষায় অহংকারী নির্লোভ উদ্ধত।

গুনেছি আমার গৃহ অবাঞ্ছিত বিবেকে তোমার  
তবু মাঝে মাঝে যাই-দুঃসময়ে তোমার দুয়ারে  
ব্যবধান মাঝে করি অনুভব-সুর আত্মীয়তার  
মানুষের আদালতে যে আওলাদ পায়নি বিচার  
তোমার মতন আমি জানিয়াছি-স্বজাতি তাহার  
দৌহার সাজিনি কভু স্ফীতোদর ত্রুর সভ্যতার।

# অসীম সাহস

আল মায়ুদ

(ফররুখ আহমদ শ্রদ্ধাস্পদেষু)

তাকান, আকাশে অই অঙ্ককার নীলের দ্যুলোক  
এমন তারার কণা, যেন কোন স্থির বিশ্বাসীর  
তসবিহ্ ছেঁড়া স্ফটিকের দানা। শূন্য সৌরলোকে  
পরীর চাঁদের নাও দোল খায়। অলীক নদীর  
অস্থির পানির আভা স্পর্শ করে দূর বাতাসের  
অসীম সাহস; আর ছুঁয়ে যায় পৃথিবীর ঘুম  
অলক্ষ্য তড়িতে কাঁপে যে কঙ্কাল কালপুরুষের  
তারি মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে তোলা যাবে আকাশ কুসুম?

আবার মাটির কাছে যখন ফেরাবো চোখ আমি;  
অরণ্যে পর্বতে বৃক্ষে কাকে পাব, কবি না সুন্দর-  
নাকি চিত্রকর তিনি-বুঝি না তো; এত দ্রুতগামী  
তারি সে অশ্ব চলে পার হয়ে প্রশ্নের শহর  
গুনিয়া হেয়ার ক্লাস্তি, অই... অই ... বিরল বাদামি  
কার দেহ পিঠে নিয়ে ঢাকা দেয় শোকের কাপড় ?

# একটি চতুর্দশপদী

হেমায়েত হোসেন

সেই ভালো, চলো যাই সুবিশাল সমুদ্রের পানে  
দুর্বীর শ্রোতের মত; কী প্রমত্ত মউজের ডাক !  
সমস্ত হৃদয় জুড়ে' ওড়ে নীল সী-গলের ঝাঁক-  
স্বপ্নেরা মুখর হয় সিন্দবাদ নাবিকের ধ্যানে ।  
নির্ভীক মাঝারা সব, দেখ কোন্ সত্যের সন্ধানে  
উদ্দাম তুফান চিরে' ক্রমাগত মরণের ডাক  
হাতেম তা'য়ীর মত তুচ্ছ ক'রে এগেয় নির্বাক  
হেরার আলোয় স্নিগ্ধ স্বর্ণদ্বীপ বন্দরের পানে ।

সাত সাগরের মাঝি দুঃসাহসী অভিজ্ঞ নাবিক  
কঠিন বলিষ্ঠ হাতে ধ'রে আছে কিশ্তীর হাল  
দীর্ঘ ক'রে নিশীথের অন্ধকার-নিকষ আকীক,  
সুদৃঢ় মাস্তলে ওড়ে সমুজ্জ্বল তৌহিদের পাল ।  
দিগন্তে কিসের আভা? মদিনার উজ্জ্বল সকাল !  
মঞ্জিলের চিহ্ন ওই, ওখানেই কল্যাণ সার্বিক॥

# কবি ফররুখ আহমদকে মনে করে

দিলওয়ার

মানুষের জন্ম আছে বলে  
মানুষের মৃত্যু আছে বলে  
রৌদ্র ও আধারে তার  
চিরায়ত যোগ আছে বলে  
তার মাঝে কবি জন্ম নেয়,

আলোতে বাতাসে সেই কবি  
নশ্বরতা আলোড়িত করে  
আয়ু-কে রোপণ করে যায়  
সময়ের শস্য ক্ষেত্রে  
প্রবাহিত জীবনের স্রোতে,

একমাত্র কবিরাই পারে  
মহাকাব্যে কবিতায় এবং সংগীতে  
জরা-কে যৌবন করে দিতে-  
সে-যৌবন অঙ্গ শোভা করে  
বেঁচে থাকে অনন্ত প্রকৃতি,  
একমাত্র কবিরাই জানে  
কবিতার কোষে কোষে  
জীবনের রক্ত কণা থাকে,  
কবিতাই কালের সুষমা  
কবিতাই প্রেমের উপমা,

আজন্ম শিশুর মত  
একজন কবির স্মরণে  
কথাগুলি ধরা দিল মনে ।

## ফররুখ আহমদ

আফজাল চৌধুরী

তোমাকে দেখেছি এক ফেনোচ্ছল বারদরিয়ার  
অশান্ত সমুদ্রস্রোতে দূরচারী মান্নাদের সাজে  
নিপুণ নাবিক কিংবা বাতি-জ্বলা কতুবদিয়ার  
রৌশনি তালাশ-করা মুসাফির সাম্পানের মাঝে  
প্রশান্ত পাঞ্জেরী রূপে, সহসা সন্দীপ হাতিয়ার  
কূলে কূলে দুলে দুলে নিশীথ-রাত্রির ভাঁজে ভাঁজে  
তোমার সিনায় ছিল যে আলোক হে শাহরিয়ার  
তারই উদ্ভাসনে তুমি জনপদে শিল্পে সমাজে  
তুলেছ কল্লোল-ধ্বনি বিপ্লবের মস্ত্রে হুঁশিয়ার-

কে তোমাকে ঠেসে দেয় শিল্পময় খচিত দেরাজে  
তাহলে তোমার চোখে পঞ্চাশের ভূখ-পিয়াসার  
উলঙ্গ আদম-রূপ ঠাঠা-হাসি হেসেছে কি কাজে?  
তোমার কথা ও কর্ম শাহাদতে যুগ-জিজ্ঞাসার  
যে তর্জনি নাচে তাতে হাজার রাতের ভুল মাঝে  
শাহেরজাদীরা ডাকে-শাহরিয়ার হে শাহরিয়ার !

## ফররুখ আহমদ

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ইস্কাটন গার্ডেনে এসে একদিন ভেঙ্গে পড়েছিল সমুদ্রের ঢেউ,  
সারারাত বয়েছিল সমুদ্রের বাতাস উদাম,  
ঝাউগাছে দীর্ঘশ্বাস স্থসিত হয়েছে অবিশ্রাম-  
শুধু একজন জেনেছিল, জানেনি তো আর কেউ।

জমিনের হৃদয় অবধি ভিজিয়ে সে নিয়েছে বিদায়,  
বাতাসে উড়েছে তার সী-মোরোগ,  
বিশ্বাসে জ্বলন্ত দুটি চোখ,  
আজ তার প্রতিধ্বনি শুধু পড়ে আছে কবিতায়-কবিতায়।

ধ্বনি থেমে গেছে, ঢেউ নেমে গেছে, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে তাকে,  
যে নাবিক দীপ্তি দিয়েছিল আমাদের গহন সত্ত্বাকে।

মাটির বাস্তব বন্দী সমুদ্রের ঢেউয়ের সন্তয়ার,  
পূর্ণিমা পূর্ণিমা এসে-এসে ফিরে গেছে সমুদ্র-জোয়ার।

সী-মোরোগ ভেসে গেছে দারুচিনি দ্বীপের সকাশে  
ফররুখ- নক্ষত্র তাকে আঁধারে চিনিয়ে দেয় পথ  
হেমন্তের রাত্রির আকাশে॥



# বন্য স্বপ্নের কবিকে

সিকদার আমিনুল হক

যে-বন্য স্বপ্নেরা ডাকে, নৈঃশব্দেও ডেকে নিয়ে যায় ;  
তার নাম যদি মৃত্যু হয়, সেই দুঃসহ মৃত্যুকে  
দেবনা ওড়াতে পাল। বলব, তোমার নাবিকের  
রয়ে গেছে ভবিতব্য, জলপাই গ্রহর ডাঙ্গায়।  
অন্তিমে ডাকবে জানি কর্মপল আর মহাকাল  
মাপ্তাদের উচ্চস্বরে-জোয়ারের রয়েছে প্রতিভা;  
তাই তো কফিনে গেল নিশীথ সমেত মোমবাতি  
আর তাঁর উষ্ণীষের স্বাধীনতা নীল নীলিমায়।

অথচ ডাহুক ডাকে। শুধু তার পিছু টানে নেই।  
বিশ্বাসের বর্শা হাতে নেই মর্দে-মোমেনের স্বপ্ন-  
কেবল নদীর উজানে জেগে ওঠে সুবিধার চর !

মেধাবী দূরত্বে ছিল ; সত্যসন্ধ তোমার গ্রহর ...  
সমুদ্র পাখির মত একরোখা আর সাবলীল ;  
শতাব্দীর দিকে মুখ, গৌরবেও তুমি ছিলে একা।

# প্রসন্ন চেতনা

নূরুল আলম রহিস

উদার প্রাণের স্রোতে গতিবান  
হে ঐশ্বর্য হে সৃষ্টি সুন্দর  
হেরার তোরণখানি  
ঐ ঐশীবাণী নবীর সান্নিধ্যে সমুজ্জ্বল  
তুমি তার প্রেমিক দর্শক ।

সসাগরা পৃথিবীর বক্ষলগ্ন আদম সন্তান  
প্রার্থনাকাতর কণ্ঠ মুক্তি চেয়ে চেয়ে  
প্রতীক্ষায় ছিল যুগ যুগ  
আবদ্ধ নদীর পানি যেমন উন্মুখ  
দিগন্ত রেখায়  
সাগরের অবশেষা বিধুর  
থাকে নাকো অন্ধকার চিরদিন  
এ সৃষ্টি স্বভাবে স্বরূপে খুঁজে ফেরে  
মানুষের সম্ভাবনা অব্যাহত  
হোক এ জমীনে  
সংগোপন নৈশাকাশে দীপাশ্রিত  
জ্যোতির্ময় জিব্রিল আমীন  
অবতীর্ণ হেরার গুহায় অমলিন

গুভ্রতা মনের পথে, প্রেম তার মানব ঐশ্বর্যে  
মোস্তফার জীবনে উজ্জ্বল অনিকেত  
ঘৃণা নয় কভু কারো প্রতি  
কল্যাণের ভাণ্ডখানা  
উচ্চকণ্ঠ : এসো এই তৌহিদী আসরে

এসো পৃণ্যবান সত্ত্বা, এসো পাপী  
তাপদন্ধ

হেরায় নেমেছে চল প্রেমের প্রপাত  
আর নয় নৈরাশ্য দীঘল কালোরাত  
দীর্ঘশ্বাস বঞ্চিত জনের ।

সজল মেঘের ডাকে সাড়া দেয় যেমন জমীন  
তেমনি কাতারে এসে খাড়া হল মানুষ মুমীন  
উত্তরাধিকার পেয়ে সে গৌরব ঐতিহ্য ধারার

হে নন্দিত আত্মা-কবিবর  
সাত সাগরের মাঝি তুলেছিলে জাহাজ নোঙর

ভূলের মাণ্ডল পেলে পরাধনি ম্লান মানবতা  
মৌসুমী বায়ুর সুরে তুমি শুনেছিলে  
আগামীর প্রাণবন্ত কথকতা  
ডাঙ্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছিল যে কথা গোপনে

তুমি তার দৃষ্ট বার্তাবহ  
বিষণ্ণ বিকালে স্বপ্ন অসামান্য  
আগামী ভোরের  
তুমি দেখেছিলে দিব্যদৃষ্ট আলোর মানুষ  
তোমার স্বাপ্নিক মন কিংবদন্তী হবে না এখানে  
এ মাটিতে তুমি তৌহিদী ঝাণ্ডার এক  
বলিষ্ঠ বিবেক এক  
প্রসন্ন চেতনা ।

তোমার কাজিক্ষিত দেশ, বনি আদমেরা  
মুখর মনের টানে প্রেমের ফসলী মাঠে  
খুঁজে পাক প্রেরণা চলার ।

## অনন্তর ফররুখ আহমদ

মুহম্মদ নূরুল হুদা

অনন্তর ক্ষয়ে গেল স্বজ্ঞাধর সনাতন কায়া  
সিয়াম-সাধনা শেষে যে রকম ক্ষয়ে যায় রমজান-চাঁদ :  
মানুষের মহত্বের সর্ববিধ সীমা  
জীবনের যৌবনের মহর্ষি মহিমা  
অনন্ত আলোক ফুঁয়ে যায় নিভে যায়;  
অন্তহীন নীল দরিয়ায়  
তোমার আমার আর কবি-অকবির  
দেহ-পোত, সেও দেখ, মুহূর্তে মিলায় ।

বৃক্ষ

আল মুজাহিদী

(ফররুখ আহমদ শিল্প পুরস্কেষু)

আমি বৃক্ষ ভালোবাসি বৃক্ষ উর্ধ্বগামী  
একটি বৃক্ষের জন্মে আমার উত্থান  
আমি বৃক্ষ ভালোবাসি বৃক্ষ মর্ত্যগামী  
এখানে মৃত্তিকা, জন্ম এবং ধ্বংসের পুরাণ  
মূল, কাণ্ড  
মেরুদণ্ড রক্তময়

ক্ষয়

অবক্ষয়

অভ্যুদয়

হে মানব মানবীরা  
পৃথিবীর শিরা-উপশিরা  
বেঁচে থাকে বৃক্ষের মতন  
প্রত্নক্ষেপে পা রেখে দাঁড়ায় মানুষ কখন  
পত্র-পল্লবের মত মগ্ন  
অন্তহীন আলোর রশ্মির মঞ্চে ভীষণ আচ্ছন্ন  
আমি ভালোবাসি আমার অরণ্য  
আমি বৃক্ষ ভালোবাসি বৃক্ষ উর্ধ্বগামী  
আমার আত্মার প্রগাঢ় সবুজ শেকড়-বাকড়  
বনমর্মর  
আমি ভালোবাসি বৃক্ষ ভালোবাসি  
বৃক্ষ উর্ধ্বগামী বৃক্ষ ভালোবাসি বৃক্ষ ভালোবাসি  
বৃক্ষ মর্ত্যগামী ।

# চাষীর পুত্রের বিশ্বাস

শাহাদাত বুলবুল

সত্য ভাষণে যিনি চিরকাল উজ্জ্বল  
অসুরও তাঁকে ফেরাতে পারে না,  
আমরাও জানি আমাদের জন্য তাঁর  
সমগ্র জীবন দিতে সেও রাজি;  
তবু সত্য ক্ষুণ্ণ হতে দিতে সে নারাজ।

এ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে সে প্রদীপ্ত  
এবং সে বলীয়ান, চিরকাল সাহসী নাবিক...  
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা যিনি  
সুন্দর বলেছে তাঁর মৃত্যু নেই,  
শাস্ত্রতকালের বাসিন্দাও তো তিনিই,  
চির ভাস্বর তো তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে ;  
তিনিই জীবন্ত ইহকাল পরকালে।

চাষীর পুত্র ও সত্যটাই মানি  
এবং জানি শাস্ত্রত, জানি সত্য চিরদিন সত্য ...

## ফররুখ আহমদ

কাজী সালাহ উদ্দীন

অবিস্মরণীয় সেই সব পংক্তি শুধু মনে আসে  
হতাশা বিধৃত নয়, জীবনের প্রিয় স্বপ্নগুলি  
উচ্চকিত হয়ে ওঠা অনায়াস কখন-ভঙ্গিতে  
অনিন্দ্য সুন্দর বোধে আনন্দ-উদ্বেল স্বরে গাঁথা  
একনিষ্ঠ নিরলস মানবিক চেতনায় ব্রতী  
উচ্চাশার উরোলে ভিন্নতর প্রতীকী, ব্যঞ্জনা ;  
শব্দে ছন্দে উপমায়, চিত্রকল্পে, পরিমিত বোধে  
যে অনন্য কারুকার্যে এক একটি কবিতা নির্মিত  
তা দেখে বিস্মিত আজ ।

এই সব স্বার্থ-ক্লিষ্ট দিনে  
বিষণ্ণ পাখির মত ভেসে চলা বিপন্ন ডানায়  
জনারণ্যে মিশে যাই, অন্তহীন বেদনার ভাষা  
হৃদয়ের অন্তঃপুরেঃ আত্মস্বর নিঃস্ব করে তোলে  
মনে হয় নিঃশেষিত জীবনের মানেই জীবন  
সুখ সে তো স্বপ্নস্তুতি, আনন্দ সে দুর্লভ বিষয়

তুমিই পাঞ্জেরী ছিলে, কবিতায় অনন্ত বিস্ময়  
সবুজ পাতার স্বপ্নে কোন স্বপ্ন সচকিত ভোরে  
আমাদের স্বপ্নলোকে এনে দিতে স্বতন্ত্র মহিমা ।

## দুর্ভিক্ষ-১৯৭৪

ফজল মাহমুদ

(কবি ফররুখ আহমদ শ্রদ্ধাস্পদেষু)

এখানে শুধু রাত্রি নয়, রাত্রির গর্ভ হতে  
জন্ম নেয় পাতকী সকাল। রক্তের ভেতরে নেই  
হিরুময় ভালোবাসা শোভন প্লাবন, ফুলের  
মহিমা ভুলে প্রিয় আজ সাপের খেলা।  
এখন শব্দ শুধু নয়, শব্দে এখন  
যাবতীয় নষ্টামী আঁকা। চরাচরে মাতাল মৃত্যু  
হাঁটে কসাই স্বভাব। বুক পকেটে  
সেঁটে থাকে প্রতীতিহীন ঘাতক শাবক।

এখন সময় শুধু সময় নয়, সময় হল  
স্বস্তি থেকে সবটুকু মাংস কেটে ফেলা,  
নষ্ট ফুসফুস নিয়ে বিব্রত জীবনযাপন।  
এখন বাগানে আর ফুটফুটে জোৎস্না আসেনা  
গ্লানির স্পর্শ ডাকে পায়ে পায়ে ভয়,  
এইসব দিন রাত্রি শুধু দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞানময় !



## পায়ের ছাপ দেখে

মাহবুব বারী

(ফররুখ আহমদ স্মরণে)

কেউ না কেউ রোজ আসে-নিঃশব্দে,  
টের পাই।

প্রতিদিন ভোরবেলা দরজা খুলে পায়ের ছাপ দেখি  
চোর নাকি ডাকাত  
কোন গুণঘাতক নাকি অন্ধপ্রেমিক কোন।

ভালো করে দেখি খুটে খুটে  
বুড়ো আগুল থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত  
দীর্ঘ না হুস, মোটা না সরু  
ভালো করে দেখি গোড়ালি ও গড়ন  
আর বয়স কত হতে পারে

কেউ না কেউ রোজ আসে  
আমার অজ্ঞাতসারে আমার ঘরের দরজায়  
না, কোন ডাক নেই, টোকাও দেয় না।

শুধু পায়ের ছাপ দেখে টের পাই।

## উত্তরণ

নিজাম উদ্দীন সালেহ  
(ফররুখ আহমদ স্মরণে)

প্রথম তোরণ পার হয়ে এসে দ্বিতীয় দরজা  
পেয়ে গেছি মঞ্জিলের, পথশ্রান্তি ভুলে হাতেমের  
উদ্দীপ্ত হৃদয়ে তবু চলেছি সুদীর্ঘ সফরের  
আঁকাবাঁকা ক্লিন্ণপথ পার হয়ে- কখন বা সোজা,  
কখনো করেছে ভারী নানা ভীতি পথিকের বোঝা,  
দুর্বীর চলেছে ছুটে কাঁটা দুটো দ্রুত সময়ের  
কেটে গেছে বহুকাল; বহুযুগ পাইনি তা টের ;  
জানি শেষ হয় নাই তবু পথ গন্তব্যের খোঁজা ।

পেছনে এসেছি ফেলে সংসারের উষর প্রান্তর  
সমুখে প্রশান্ত ধারা কাউসারের দেয় হাতছানি,  
জীবনের মোহ তবু নিতে চায় বুকে তার টানি’  
মুগ্ধ করে পথিকের তনু মন; মোহিনী, নশ্বর

যে পারে করতে ছিন্ন এই মরিচীকার বন্ধন  
জানি সে সহজে করে মঞ্জিলের দ্বারে উত্তরণ॥

## একজন কবি

ইকবাল আজিজ

(ফররুখ আহমদকে নিবেদিত)

একজন কবি সাত সাগরের মাঝি হয়ে  
আমাদের নিম্নবিস্তৃত লোভ আর স্বার্থপরতার  
মাঝে গেয়ে ওঠেন সত্যের গান ।

রাত কেটে যায়-ভোর হয়  
সাগরের লোনাজল লবণের রেখা পিছে ফেলে  
ফিরে যায় সাগরে ;  
বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে একজন কবি  
চেয়ে দেখেন অদূরে মধ্যবিস্তৃত মানুষের  
পাজরে জমেছে লবণের রেখা-  
ঘন মেঘরাশি;  
বঞ্চনা ও শোষণের ওপাশে নারঙ্গীবনে  
কাঁপছে সবুজ পাতা ।  
কবি দাঁড়িয়ে থাকেন কালের বেলাভূমিতে-  
কবির দুচোখে সূর্যাস্তের রেখা;  
এ জনসমুদ্রে সাত সাগরের মাঝি হয়ে  
ভেসে ভেসে বেলা বয়ে যায়  
ডাহকের ডাক শুনে রাত কেটে যায় ।  
তবু কবি সত্য ও সুন্দরের গান  
গেয়ে যান অবিরত !

## হবে কি কখনও ফেরা সিন্দাবাদের রেজাউদ্দিন স্টালিন

আবার এসেছে ফিরে বন্দরের হারানো ছেলেরা  
হাবেদা মরুর থেকে অনির্বাণ খেজুর এনেছে  
তারা, আরব সমুদ্র থেকে স্বপ্নের বন্য বিবর  
আদিম অরণ্য থেকে আঙুরের স্বাস্থ্য এনেছে।

দৃষ্টির ধারালো দাড়ে স্রোতের বিরোধ কেটে কেটে  
আবার এসেছে তারা সেতারা হেলাল সীমাহীন,  
দোয়েলের শীষ মিটে গেলে তারা দেখবে স্বদেশ  
দাঁড়ালে সুদীর্ঘ এসে উঠোনে ঘরের দরজায়।

তাদের ডাকতে হবে আজ এই অবিরল পথে,  
যেখানে হাতের সাথে গাইতির বজ্রমুখী গান  
বেজে ওঠে দোতারায়, হৃদয়ের হারানো সরোদে।  
যেখানে তাদের চোখ দেয়াল বিদীর্ণ জ্বলে ওঠে-  
লোকালয় জনপদে, প্রতিঘরে, প্রান্তরের গোষ্ঠে।

কে আজ ডাকবে সেই বন্দরের তীব্র ছেলেদের,  
কোথা সে নাবিক আজ সিন্দাবাদ, ঠিকানা কোথায়?

নতুন পানিতে তার যাত্রা হয়েছে শুরু ফের,  
হবে কি কখন ফেরা এই পথে সিন্দাবাদের ?

## অস্পষ্ট বন্দর

মুকুল চৌধুরী

(কবি ফররুখ আহমদ শ্রদ্ধাস্পদেষু)

জাহাজের পাটাতনে রৌদ্রজ্বালা তাতানো কড়াই

যখন আমার হাত ব্যতিব্যস্ত জবর-দখলে

আতঙ্কে বিমুঢ় আমি

ঝড়ের কবলে পড়া দিনান্তের দিশেহারা মাঝি

ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া মেঘে যাব নিজেকে লুকোতে

মাতাল সাগরে দেখি অতিকায় হাঙরের মুখ

দিগন্ত-ঢালুতে দিয়ে শরীরের ভর

পাড়ি দেব সাগরের নীল সুতো লকলকে জিব

আকাশ গড়ান দিল আনোয়ারার দিকে

বন্দর ফাঁড়ির দিকে

স্বর্ণ ঈগল আজ বড়ই নিসঙ্গ

কর্ণফুলী কার ফুল, কুমারী মনের ভূলে

হারিয়েছে যুবকের পরিয়ে দেওয়া স্বর্ণলতা দুল

এই শোকে চরাচরে নিঃশঙ্ক ডানার ভরে ঈগলের আকাশে উড়াল?

প্রসারিত পতেঙ্গা ফেরাব ফেরাব চোখ

নিজের অস্তিত্বে আমি ফিরে এসে দেখি সেই জাহাজের ডেক।

মাস্তুলে আনাড়ি হাত,

পতপত শব্দ শুনে শিহরণে ওপরে তাকাই

ঝর্ণার পানির স্রোতে নুড়িতে নুড়ির ঘায়ে স্বপ্নময় যেমন গোঙানী

হাতের মুঠোয় দেখি মিছিলে রণিত এক

সবুজ পতাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমিও নাবিক!

যেতে হবে দূর এক অস্পষ্ট বন্দরে।

হাতে ধরা সফরের ব্যবহার্য দ্বিবিধ তালিকা :

তীরের বালুতে মাখা তালিকার একদিকে পূর্বসূরী

কতিপয় স্মরণীয় নাম

অপর পৃষ্ঠায় আছে করুণ কষ্টের কথা-

ঝড়ের দুঃস্বপ্ন গাঁথা তিমির ফোঁপানী

শোষক মেঘের পিঠে বর্বর মৌসুমী

তৃষ্ণার তাড়নাও আছে, বিবমিষা সামুদ্রিক ব্যাধি

খোদিত ফলকে যার অন্য নাম মরণপয়োধি।

পানি নেই-পুষ্প নেই, নেই জায়া-প্রিয়তমা সবুজ পৃথিবী

পাল ছিঁড়ে গেলে-দাড় ভেঙে গেলে-

কার কাছে কার শেষ নামাজের দাবী।

জাহাজের সিটি বেজে গেছে।

যন্ত্রের দানব কনসার্টে

রুদ্ররোষ পৌছে গেছে দ্বিধান্বিত হাতে ধরা মাস্তুলের কাছে।

কেমন নিলামে আমি চড়া দামে নিজেকে হেঁকেছি !

সাগর শান্ত থাকে, স্থিরজল প্রতিবিম্বে দেখে তার আভা

সাগর ফুঁসেও ওঠে, নাবিকের কম্প্রহাতে ছুঁড়ে দেয় লাভ।

আমার ক্ষমতা আছে ভাস্ছি যে সাগরের দ্বিচারিণী রূপে ?

## পরিশিষ্ট জীবনপঞ্জী

**জন্ম :** ১০ জুন, ১৯১৮; মাঝাইল, যশোর। আব্বা : খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী; আম্মা : বেগম রওশন আখতার। পুরোনামঃ সৈয়দ ফররুখ আহমদ। তবে তিনি নাম লিখতে ‘সৈয়দ’ শব্দ ব্যবহার করতেন না। পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র।

**শিক্ষা :** শৈশবে গ্রামের প্রাইমারী স্কুল, কৈশোরে কলকাতার তালতলা মডেল স্কুল, বালিগঞ্জ হাই স্কুল ও পরে খুলনা জেলা স্কুল। খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ ও সিটি কলেজেও পড়াশোনা করেছেন। বালিগঞ্জ হাই স্কুলে কবি গোলাম মোস্তফা এবং খুলনা জেলা স্কুলে অধ্যাপক আবুল ফজল ও কবি আবুল হাশেম তাঁর শিক্ষক ছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই তাঁর কবিতা লেখা শুরু হয়। আই.এ. পাশ করার পর তিনি প্রথমে দর্শন ও পরে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি.এ.-তে ভর্তি হন।

**বিবাহঃ** ১৯৪২ সালে তাঁর আপন খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের সংগে তাঁর বিয়ে হয়।

**কর্ম :** আই.জি. প্রিজন্স অফিস (১৯৪৩), সিভিল সাপ্লাই (১৯৪৪) তে স্বল্পকাল চাকরি করেন; মাসিক মোহাম্মদী’র স্বল্পকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন (১৯৪৫); জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে সামান্য কিছুদিন চাকরি; ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে প্রথমে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিত নিজস্ব শিল্পী রেডিও পাকিস্তান ঢাকা এবং ১৯৭১ এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পী। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই চাকরিতে বহাল ছিলেন। উল্লেখ্য রেডিও পাকিস্তান ঢাকা’র প্রথমে ‘কিশোর মজলিস’ পরবর্তীতে ‘স্কুল ব্রডকাস্টিং’ প্রোগ্রামটি তিনি দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত পরিচালনা করেন।

**পুরস্কার :** ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাইড অব পারফরমেন্স; ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার; ১৯৬৬ সালে ‘হাতেম তায়ী, গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার; ১৯৬৬ সালে ‘পাখীর বাসা’ গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। মরণোত্তর কালে তাঁকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক ১৯৭৭ ও স্বাধীনতা

ফররুখ আহমদ ২১৫

পুরস্কার ১৯৮০ প্রদান করা হয়। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে ১৪০০ হিজরীর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সাহিত্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, তাঁকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬৬ সালে ‘সিতারা-এ ইমতিয়াজ’ খেতাবে ভূষিত করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সংবর্ধনা : ১৯৬১ সালে ঢাকা হলে সর্বস্তরের সংস্কৃতিসেবীদের দ্বারা তিনি সম্বর্ধিত হন।

মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪ ; ৭/৫ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

= 0 =





বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন : ৬০৭৫২০।

ঢাকা অফিস : ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৯২০১।